বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রুশতী সেন

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

প্রথম প্রকাশ :
সেপ্টেম্বর ১৯৯৫

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
১ / ১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলকাতা ৭০০ ০২০

মুদ্রক .
লেজার ইম্প্রেশন্‌স্‌
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

প্রচ্ছদ :
তপন দেবনাথ

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
রেডিয়েন্‌ট প্রসেস
কলকাতা ৭০০ ০১৩

নিবেদন

কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)-এর জন্মশতবর্ষে তাঁর একটি জীবনী প্রকাশের উদ্যোগ আকাদেমি থেকে নেওয়া হয়। সেই কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল অধ্যাপিকা রুশতী সেনকে। তিনি দীর্ঘ অনলস গবেষণায় যে পাণ্ডুলিপিখানি দাঁড় করালেন তা আমাদের জীবনীগ্রন্থমালার স্বাভাবিক আকার ও প্রকারের থেকে একটু ভিন্নতর হয়ে গেল। ওই গ্রন্থমালায় অনুসৃত রীতির চেয়ে কিছুটা অন্যরকম হলেও এই বই-এ গ্রন্থপঞ্জি, রচনাপঞ্জি ও অন্যান্য তথ্য বেশ বিস্তৃতভাবেই সন্নিবেশিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন পর্যায়ে এটি পড়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে লেখিকাকে সাহায্য করেছেন ড. অলোক রায় এবং শ্রীশঙ্খ ঘোষ। এঁরা সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। বইখানির সুচারু মুদ্রণের ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য শ্রীপ্রসূন দত্ত ধন্যবাদার্হ।

বিভূতিভূষণের শতবর্ষ পূর্তিতে এই জীবনী গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আকাদেমি কৃতার্থ বোধ করছে।

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
সচিব
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫

মুখবন্ধ

১৯৯৩ সালের অগাস্ট মাসে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী লেখার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছিলেন। দু'বছরের চেষ্টায় যে-লেখাটি সম্পূর্ণ করতে পারলাম, তাকে জীবনী বলা যায় কি না, সে বিচারের ভার পাঠকের। আমার বলবার কথা একটাই। কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনীর দাবি আমার নেই। আসলে আমি ঠিক বুঝেই উঠতে পারি না, পূর্ণাঙ্গ জীবনী কাকে বলে! যে কোনো জীবনীরই তো ভবিষ্যতে, এমনকী লেখা হওয়ার সমসময়ে পূর্ণতর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে! তেমন সম্ভাবনায় জীবনীকারের পরিশ্রম অথবা তথ্যনিষ্ঠা মিথ্যে হয়ে যায় না। যে কোনো শিল্পীর সৃষ্টির মতো, তাঁর জীবনেরও তো একাধিক পাঠ বানানো সম্ভব। আমি আমার লেখাটিকে বিভূতি-জীবনের বহু বিকল্প পাঠের একটি ভাবতেই স্বস্তি বোধ করছি।

তথ্যসংগ্রহের সূত্রে তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর পরিবারের কাছে যে সাহায্য পেয়েছি, তাকে ধন্যবাদ কি কৃতজ্ঞতার মতো কোনো বহু ব্যবহৃত শব্দে ধরানো যায় না। অপ্রকাশিত চিঠিপত্র, নথি যা দেখতে এবং ব্যবহার করতে পারলাম, তার বিশদ বিবরণ লেখার মধ্যেই আছে। নুটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা অনেকগুলি চিঠি আমি অপ্রকাশিত অবস্থায় দেখবার এবং ব্যবহার করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তার মধ্যে যে চিঠিগুলি 'বিভূতিরচনাবলী জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি আমার লেখায় 'অপ্রকাশিত' হিসেবেই নির্দিষ্ট রইল। আমার বইটির ছাপার কাজ এবং 'জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ বিভূতিরচনাবলী'-র দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ একেবারে সমসাময়িক হওয়ার ফলে আমার সূত্রনির্দেশে এই অসম্পূর্ণতাটুকু থেকে গেল। অপ্রকাশিত নথিপত্রের ব্যাপারে অযাচিত সহযোগিতা ছাড়াও, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের এমন দু-একটি বই সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন, যেগুলি তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে নেই। এই প্রসঙ্গে 'কো-এডুকেশন' এবং 'পঞ্চদশী'র মতো বারোয়ারি উপন্যাসদুটি উল্লেখযোগ্য।

যেসব পত্রিকায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা প্রকাশিত হয়েছিল, তার অনেকগুলিই এখনও পর্যন্ত আমার না-দেখা থেকে গেল। যেমন 'অভ্যুদয়',

'অলকা', 'কল্যাণশ্রী', 'তরুণের স্বপ্ন', 'দিগন্ত', 'দৈনিক কৃষক', 'পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা', 'প্রত্যহ', 'প্রভাতী', 'বসুধারা', 'বাঙলা', 'মাতৃভূমি', 'মৌচাক', 'রূপরেখা', 'সোনার বাংলা'। এর মধ্যে 'মাতৃভূমি' পত্রিকাটির প্রাসঙ্গিক সংখ্যাগুলি দেখতে পারিনি বলে আমার অস্বস্তি খুব বেশি। বিভূতিভূষণের তিন-তিনটি উপন্যাস এই পত্রিকায় বেরিয়েছিল। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় 'মাতৃভূমি' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে সাহিত্যিক গোপাল ভৌমিককে চিহ্নিত করেছেন (বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত দিনলিপি, পৃ ৩৩১)। সম্প্রতি আফিফ্ ফুয়াদ সম্পাদিত 'দিবারাত্রির কাব্য' পত্রিকার বিভূতিভূষণ সংখ্যায় দেখলাম, যতীন্দ্রমোহন রায় লিখেছেন, 'মাতৃভূমি'র সম্পাদক ছিলেন গোপাল চন্দ্র নিয়োগী (পৃ ২১)।

যে রচনাপঞ্জি এই বইতে থাকল, তার পূর্ণতর চেহারা নিশ্চয় ভবিষ্যতে তৈরি হবে। বিভূতিভূষণের যেসব গল্পসংকলনে তৎপূর্বে অগ্রন্থিত কোনো গল্প গ্রন্থিত হয়নি, সেগুলির ক্ষেত্রে পঞ্জিতে খানিকটা সংক্ষেপে পরিচয় দিয়েছি। এই রচনাপঞ্জি তৈরির কাজে বিশেষ সাহায্য পেয়েছি সুমন ভট্টাচার্যর কাছে। পুরনো পত্রিকা, প্রায় হারিয়ে যাওয়া বই এবং বিভিন্ন তথ্যসূত্রের হদিস পেতে সাহায্য করেছেন অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় (আনন্দবাজার পত্রিকা), অরবিন্দ ভট্টাচার্য (সুরেন্দ্রনাথ কলেজ), অরুণা চট্টোপাধ্যায় (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ), চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ), বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (যুগান্তর), শঙ্খ ঘোষ এবং হিমানীশ গোস্বামী।

সুপ্রভা চৌধুরীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ করে দিয়েছিলেন ভিক্টোরিয়া ইন্স্টিটিউশন কলেজের স্নিগ্ধা সেন। শ্রীযুক্তা চৌধুরীর যেটুকু আস্থা আমি অর্জন করতে পেরেছিলাম, তার অনেকখানি কৃতিত্বই স্নিগ্ধা সেনের। সুপ্রভা চৌধুরী এবং তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু অমূল্য পত্রের অংশবিশেষ ব্যবহারের যে লিখিত অনুমতি আমাকে দিয়েছেন, গবেষক হিসেবে সেই আনুকূল্যকে সম্মান জানাতেই চেয়েছি।

এই বইতে বিভূতিভূষণের লেখার উদ্ধৃতির জন্য মূলত মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত গজেন্দ্রকুমার মিত্র, চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় ও তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত বারো খণ্ডে সমাপ্ত 'বিভূতি রচনাবলী' ব্যবহার করেছি। যোগেন্দ্রনাথ সিন্হার 'পথের পাঁচালীকে বিভূতিবাবু' বইটির যে বঙ্গানুবাদ আমি ব্যবহার করলাম, তা এখনও 'আলেখ্য' পত্রিকাতেই রয়েছে, গ্রন্থিত হয়নি। যোগেন্দ্রনাথ সিন্হার ভূমিকা সম্বলিত ড. তারাপদ ভৌমিকের যে অনুবাদ ১৯৭৯-র জানুয়ারিতে রাঁচির ইউনিয়ন ক্লাব ও লাইব্রেরির সম্পাদক সুধাংশুকুমার সেন গ্রন্থাকারে প্রকাশ

করেছেন, তার সঙ্গে বর্তমান বইতে ব্যবহৃত সতীশচন্দ্র ঘোষাল কৃত অনুবাদটি মিলিয়ে দেখেছি। দুটি অনুবাদে ভাষার যেটুকু পার্থক্য স্বাভাবিক, তার বাইরে খুব বড় কোনো ফারাক আমার চোখে পড়েনি।

এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পড়ে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন অধ্যাপক অলোক রায়। শঙ্খ ঘোষ তাঁর বহু কাজের মধ্যেও, খুব কম সময়ের অবসরে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি পড়ে দিয়েছেন। তাঁদের মতো শিক্ষকের প্রশ্রয়ে অভ্যস্ত হতে পারলে, বড় আশ্বস্ত লাগে। দেবেশ রায় এবং স্বপন মজুমদারের সঙ্গে বিভিন্ন আলোচনাও আমার এই কাজে বিশেষ সহায় হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সৌজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। আকাদেমির পক্ষে অমিতাভ মুখোপাধ্যায় অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন। এই বইয়ের প্রুফ দেখতে আমাকে সাহায্য করেছেন প্রসূন দত্ত এবং শিলাদিত্য সেন। আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা আর ছাপাখানার আগাগোড়া সহযোগিতা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণপ্রমাদ থেকে যাবেই। যেমন ৪৩ পৃষ্ঠায় একাদশ লাইনে 'সুরেন মজুমদার' নামটি নিশ্চয় 'বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত রচনা' বইটির মুদ্রণপ্রমাদ—আদতে ওটি 'সুরেশ মজুমদার' হওয়ার কথা। 'সুরেন'-এর পরে '(শ ?)' আমার পাণ্ডুলিপিতে ছিল, ছাপায় বাদ পড়েছে। এরকম খামতি মনোযোগী পাঠক নিশ্চয় আরও খুঁজে পাবেন।

আমার যে কোনো লেখার মতো এই পাণ্ডুলিপিটিরও প্রথম পাঠক অশোক সেন। তাঁর সমালোচনার কঠোরতা আগের তুলনায় বিন্দুমাত্র কমেনি দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছি। আর এই কাজটি যে আমি করে উঠতে পারলাম, তার জন্য আমার সাংসারিক, সামাজিক দায়িত্বের ভার যাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই লাঘব করে দিয়েছেন, তাঁদের কথা তো মুখবন্ধে অব্যক্তই থাকে, থাকাটাই বোধহয় সমীচীন।

১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

রুশতী সেন

পয়লা নভেম্বর, ১৯৫০

'খগোলে শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোকসভা' এ-রকম একটি শিরোনাম ছিল ১৯৫০ সালের ১৮ নভেম্বর তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায়। শিরোনামের তলায় সংক্ষিপ্ত সংবাদটুকু হল 'খগোল (পাটনা) স্থানীয় রেলকর্মীদের উদ্যোগে শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে বাঙ্গলার প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জগদ্বিখ্যাত মহামনীষী জর্জ বার্নার্ড শয়ের মৃত্যুতে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়···একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ ও এক মিনিট নীরবতা পালনের পর সভা ভঙ্গ হয়।' যেদিন বিভূতিভূষণের মৃত্যু-সংবাদ প্রথম কলকাতার পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সেই ৩ নভেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় মূল শিরোনামে দেখি 'পরলোকে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার সমালোচক ও চিন্তানায়ক জর্জ বার্নার্ড শ'। কিন্তু খগোলের রেলকর্মীদের উদ্যোগে কি জর্জ বার্নার্ড শ জায়গা পেতেন, যদি তাঁর মৃত্যু না হত বাংলা-সাহিত্যের বিভূতিভূষণের অকালমৃত্যুর ঠিক একদিন পরে—২ নভেম্বর, ১৯৫০, ভোর ৪টা ৫৯ মিনিট গ্রিনউইচ সময়ে?

সেই নভেম্বর মাসে বিভূতিভূষণের মৃত্যু দৈনিক পত্রিকার পাতায় ফিরে ফিরে এসেছে। ১৮ নভেম্বরের আনন্দবাজার পত্রিকায় ছিল 'শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ/ঘাটশীলায় শোকসভা'। ১৩ নভেম্বরের কাগজে আছে চাইবাসায় শোকসভা আর পুরুলিয়ায় শোকসভার খবর। প্রথমটি অনুষ্ঠিত হয় ৩ নভেম্বর, দ্বিতীয়টি ৬ নভেম্বর। ইতিমধ্যে নভেম্বরের ৭ তারিখে কলকাতার ওয়াই. এম. সি. এ হলে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সভাপতিত্বে সাহিত্যিকসমাজ শোক প্রকাশ করেছেন। বক্তা ছিলেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র, মনোজ বসু, পরেশ ভট্টাচার্য, সুমথনাথ ঘোষ, সমীর ঘোষ, সতীশচন্দ্র নন্দী। ২৪ নভেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকার সভা-সমিতির বিজ্ঞপ্তি কলামে বেরিয়েছে 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় শোকসভা স্থান সেনেট হল তারিখ ২৬শে নভেম্বর সময় অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা···বিভূতিভূষণের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য এক বিরাট জনসভা হইবে। সর্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। বক্তাগণ: শ্রী মোহিতলাল

মজুমদার, ডক্টর সুশীল দে, অতুল গুপ্ত, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কবিশেখর কালিদাস রায়, ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, অমল হোম, উপেন গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বসু, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, মন্মথনাথ ঘোষ, জগদীশ ভট্টাচার্য, বাণী রায় প্রভৃতি। শ্রী সজনীকান্ত দাস আহ্বায়ক।' ২৭ নভেম্বরের আনন্দবাজারে দেখি সেই অনুষ্ঠানের রিপোর্ট, যার শিরোনাম ছিল, 'পরলোকগত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় / কলিকাতার সিনেট হলে মহতী জনসভায় শ্রদ্ধাঞ্জলি'।

এই সভার প্রসঙ্গেই গোপাল হালদার লিখেছিলেন, '···সুস্থ ভাবুক সানন্দ-চিত্ত বিভূতিভূষণকে আমরা দেখেছি কখনও পরীক্ষার খাতা ফেরত দিতে গিয়ে একবার হেড-এক্জামিনার নামীয় এক ভাগ্যবানের গৃহে—যিনি অত্যন্ত রূঢ়-ভাবেই সচেতন যে তিনি হেড-এক্জামিনার, আর তেমনই স্থূলভাবেই অচেতন—রাত জেগে যে লোক বনগাঁ থেকে খাতা ফেরত দিতে এসেছেন ক্লান্ত দেহ, চিন্তাভারাক্রান্ত মন, আর যাঁকে তিনি রূঢ়ভাবেই বসে থাকতে হুকুম করেছেন, সেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কে। সিনেট হলে বিভূতিভূষণের স্মৃতিসভা যখন হয়, তখন মনে পড়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই বাংলার হেড-এক্জামিনারের কথা।' (গোপাল হালদার, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ ব : ২১০)। এমন এক জনসভা, যেখানে ভাড়া করা হাজারটি চেয়ারকে যৎসামান্য প্রমাণ করে ভিড় উপচে পড়েছিল রাস্তায়, যেখানে সভাপতি অতুল গুপ্ত 'ইছামতী' উপন্যাসের রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্তির সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছিলেন, সে সভা ছোটখাটো ঘাত-প্রতিঘাত, গ্লানি, মলিনতা থেকে একেবারে মুক্ত থাকে কেমন করে? তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে মোহিতলাল মজুমদারের তখন যথেষ্ট অস্বস্তিকর সম্পর্ক। সে অস্বস্তির রেশ এসে পড়েছিল বিভূতিভূষণের স্মৃতিসভায় কোনো কোনো উপস্থিতি-অনুপস্থিতিতে, কোনো এক নিবন্ধের পাঠে অংশবিশেষের বর্জনে (যদিও নিবন্ধকার চেয়েছিলেন, নিবন্ধটি যেন একটি শব্দও বাদ না দিয়ে পড়া হয়)। (গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, ১৯৮৯ : ১০৮-৯)।

যাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে সেদিনের সভা, তিনি এসব মালিন্য গ্লানির আশেপাশে থেকেও, মানবিক প্রসাদেরই উপকরণ খুঁজতেন। ক্ষোভ তাঁর দিনলিপিকে ছুঁয়ে গেছে মাঝেমধ্যেই। ১৯৩৩ সালের ২৬ জুন ডায়েরিতে লিখেছেন, '···ভাল লাগচে না। বঙ্গশ্রীর আড্ডা পুরনো হয়ে গেছে।' (অ. দি. : ১০৭)। সেই

বছরই ১৩ জুলাই বিভূতিভূষণের মনে হয়েছিল, 'আজ কাল জীবনের অনেক কথা বুঝতে পারচি। সাহিত্যক্ষেত্রে পরস্পর যে হিংসা, দ্বেষ, সংকীর্ণতা দেখতে পাই আজকাল, ওতে আমার মন আর সায় দিচ্চে না। এক্ষেত্রে ক্রমেই কলকাতাতেই অতি বিষময় শস্যের বীজ উপ্ত হচ্চে—আমি ভাবচি দেশে চলে যাবো। দেশ থেকে আমি দেশের যা সেবা করতে পারবো এমন আর কোথাও নয়। পরিশ্রম, সেবা সব দিক থেকে। এখানকার এ সৌখীন জীবন যাপন করে পরস্পরকে হিংসা দ্বেষ করে কি হবে?' (অ. দি. : ১১৫-১১৬)। তিনটি সপ্তাহও পুরো কাটেনি তারপর, ১ অগস্টের দিনলিপিতে দেখছি, 'আজকাল কলকাতায় অনেক আড্ডা জুটে গিয়েচে—স্কুল, বঙ্গশ্রী আপিস, পশুপতিবাবুদের বাড়ী, টরুদের ওখানে, Imperial Library, কিরণ মাসীমার বাড়ী, নীরদবাবুদের flat, নীরদ চৌধুরীর বাসা, Mognaschi-র flat, মণীন্দ্র বসুর বাড়ী—নানাধরণের atmosphere—কোথায় কখন যাই! কিন্তু সবখানে গেলেই আনন্দ পাই এই শরতের রোদের মাঝে।' (অ. দি : ১২৫)। এই তো বিভূতিভূষণ, যাঁর অস্থিরতা বুঝি তাঁর মানবিকতারই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মরণোত্তর রবীন্দ্রপুরস্কার অথবা আড়াই দশকব্যাপী নিরলস সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপ্তি শুধু নয়, খুবই সম্ভব তার বেশি কিছু থাকে খগোলের রেলকর্মীদের সশ্রদ্ধ আয়োজনের মূলে। যার হদিস দিতে গিয়ে ৫ নভেম্বর ১৯৫০ তারিখের আনন্দ-বাজার পত্রিকায় শ্রীকমলাকান্ত শর্মা-বেশী প্রমথনাথ বিশী লিখেছিলেন, 'অনেকের হৃদয়ে সদর দরজা, খিড়কি দরজা দুটি দ্বার থাকে। বিভূতিভূষণের হৃদয়ে সদর খিড়কির ভেদ ছিল না। সকলের জন্যই একটি দ্বার উন্মুক্ত ছিল। তাই তাঁহার বন্ধুর সংখ্যাও যেমন ছিল অনেক, বৈচিত্র্যও ছিল অদ্ভুত। বিভূতিভূষণের হৃদয় ছিল বন্ধুত্বের আমদরবার, সেখানে উচ্চ-নীচ ভেদে আসন ছিল না, সকলের জন্যই এক প্রশস্ত ফরাস পাতা ছিল, তিনি নিজেও সেই ফরাসের একান্তে উপবিষ্ট থাকিতেন। তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করা যেমন সহজ ছিল বাহির হইয়া আসা ছিল তেমনি কঠিন। বিভূতিভূষণের সহিত বন্ধুত্ব ছিন্ন হইয়াছে, এমন একটিও দৃষ্টান্ত মিলিবে না।' কমলাকান্ত শর্মার এই বক্তব্যে যেন ধুয়ো গেয়ে যায় চাইবাসা থেকে, পুরুলিয়া, মানভূম থেকে, ঘাটশিলা থেকে, খগোল থেকে বিভিন্ন শোকসভার সংবাদ।

তবু কত কিছু না-জানা থাকে। আসলে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের এমনি বিন্যাস যে, এ জীবনের অনুষঙ্গে যত তথ্যই গবেষকের সঞ্চয়ে

জমা পড়ুক, তত যেন অজানার ভারও বাড়তে থাকে। তাঁর জীবিতকালে প্রকাশিত এতগুলি দিনলিপি, মৃত্যুর পরে প্রকাশিত আরো দুটি, গবেষকের অতৃপ্তিই কেবল বাড়িয়ে চলে। কারণ বিভূতিভূষণ তো এমনি দিনলিপিকার, যাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতিকথায় অনিবার্য এসে পড়ে সেই বৃদ্ধা ; যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল পাটশিমলে থেকে ফিরবার পথে, গোবরাপুরের মোড় বেঁকে কুঁদীপুরের বাঁওড়ের ওপারে রাণীনগর চাষা-গাঁয়ে। পথ শুধোতে, যে বুড়ি বিভূতিভূষণের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'তোমার নাম বিভূতি? সাতবেড়েতে একবার গিয়েছিলে না?' (উর্মিমুখর, বি র ৩ : ৪৯১)। নতুন অরণ্য দেখবার রোমাঞ্চে বিভূতিভূষণ মিলিয়ে নিতে পারতেন বরমকোচায় দেখা সাঁওতালি মেয়ের ভাঙা-ভাঙা বাংলা, 'ভাল ভাল জায়গা দেখে তুমি বেড়াচ্চ বুঝি?' সেই প্রায়-অজানা মেয়েটির কথা তাঁর শ্রবণস্মৃতিতে ফিরে আসে, যখন তিনি বসে আছেন গহন বনে লিপুকোচা তাঁবুতে, অন্ধকারে যখন হাতির ভয়ে আগুন জ্বালানো হয়েছে তাঁবুর সামনে। (অ. র. : ৩৪)। হেঁদেকুলীর গভীর অরণ্যে দাঁড়িয়ে ভ্রমণসঙ্গী যোগেন্দ্রনাথ সিন্‌হাকে এই বিভূতিভূষণই বলতে পারেন, 'হাতী আমাকে আর আপনাকে মেরে ফেলুক। বাঘ আর হাতী মিলে সারা দুনিয়াকে জনশূন্য করুক। যতক্ষণ এ সংসারে একজনও "দুখী হো" বেঁচে থাকবে মনুষ্য জাতি অমর।' (সতীশচন্দ্র ঘোষাল, পৌষ ১৩৭৮ ব : ৩৫৮-৫৯)। আজীবন ভ্রমণপাগল মানুষটির স্মৃতিতে অমলিন থাকে মংডু ব্রহ্মদেশের মৌংপে পরিবারটির কথা (অভিযাত্রিক, বি র ২ : ৩৬৮)। নিবিড় অরণ্যময় আরাকান ইয়োমার উন্নতকায় শাখাপ্রশাখার অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্যের মহিমাকে তিনি উপভোগ করতে পারেন না, সিংজুর বাসিন্দা সেই সামান্য ইংরেজি জানা, রুক্ষ কর্কশ চেহারার ডাকপেয়াদা কাচিনের প্রেমকাহিনী ছাড়া ; সিংজুতে চুরুটের কারখানায় দু'টাকা-হপ্তায় কাজ করা সেই প্রেমিকা কাচিনের, যার কাহিনী শুনতে শুনতে তবেই নাকি আরাকান ইয়োমার অবারিত মুক্তিকে আরো আপন করে পাওয়া যায়। (অভিযাত্রিক, বি র ২ : ৩৭৩)। আশ্চর্য কী যে, এই বিভূতিভূষণ বহু ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে নিয়ে, আরো ভ্রমণের পিপাসা অন্তরে নিয়ে দিনলিপিতে লিখবেন, 'দেশ বেড়িয়ে যদি মানুষ না দেখলুম, তবে কি দেখতে বেরিয়েচি?' (অভিযাত্রিক, বি র ২ : ৪০০)।

জীবনভর যেসব মানুষের সঙ্গে বিনিময়কে বিভূতিভূষণ এক পথের পাঁচালী থেকে নানান্ পথের নানান্ ছোটোবড়ো আখ্যানে পাথেয় মেনেছেন, তাঁদের

অনেকেই বাংলার বিশিষ্ট কথাশিল্পীর মৃত্যুর পরবর্তী শোকসভা, শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্যোগ-আয়োজন পর্যন্ত পৌঁছতে পাবেন না। অথচ সংস্কৃতির পীঠস্থান থেকে তেমন সুদূর এক বিন্দুতেই তো একদিন পথের পাঁচালীকারের পথ-চলা শুরু হয়েছিল। তাঁব দিনলিপি জুড়ে, তাঁর খ্যাতির সংলগ্ন বিভিন্ন আখ্যান স্মৃতিকথা ব্যেপে বিভূতিজীবনের অনেকখানি আজ পাঠকের আয়ত্তে এসে গেছে, এরকম হয়তো ভাবাই চলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, ভোলা যায় না যে, এই বিরাট সাহিত্যিকের মৃত্যুব পরে কোনো মৃত্যুসংবাদে, কোনো স্মৃতিকথায় মানুষটার জন্মের সঠিক সন-তারিখ ছাপা যায়নি। বিভিন্ন ভ্রম-সংশোধনের ভিতব দিয়ে 'শনিবারের চিঠি' যখন সঠিক তাবিখটি প্রকাশ করল, তখন ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস পড়ে গেছে (সজনীকান্ত দাস, ফাল্গুন ১৩৫৭ ব : ৫১৮-১৯)। এটা কি ভাবা যায় যে মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই খাতা, যেখানে 'জন্ম পত্রিকা' শিরোনামে মহানন্দেব জ্যেষ্ঠ পুত্র বিভূতিভূষণের জন্মতারিখ স্পষ্টই ১৩০১ বঙ্গাব্দের ২৮ ভাদ্র, অর্থাৎ ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দেব ১২ সেপ্টেম্বর নথিভুক্ত আছে, তা কখনোই বিভূতিভূষণ দেখেননি ?

গোপাল হালদারের কথায়, '···বঙ্গ কৌতুকের বিষয়ের অভাব ছিল না। যেমন বিভূতিভূষণেব বয়স। এ যেন কোন দিনই তিনিও ঠিক বলবেন না, আমবাও তাঁকে ঠিক বলতে দেব না।' (গোপাল হালদার, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ ব : ২১০)। পরিমল গোস্বামীব লেখায় আছে '···বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের··· চিঠিব তারিখ ৩বা আশ্বিন ১৩৪৭ (১৯৪০)। লিখছেন "ধূমকেতু দেখার সুযোগ ঘটেনি ! ছেলেবেলায় হ্যালির ধূমকেতু উঠেছিল শুনেছি, সে আজ ত্রিশ বছব আগের কথা। তখন খুব ছেলেমানুষ, পাড়াগাঁয়ে থাকি, কেউ দেখায় নি।"··· ১৯১০-এ ওঠা হ্যালির ধূমকেতু এমন বিরাট এবং এমন স্মরণীয় ঘটনা এবং এমন দীর্ঘদিনব্যাপী "ইভেণ্ট" যে তা পনেরো ষোল বছরের বালকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার কথা নয়। তবু তিনি এরকম লিখলেন কেন, এটি আমার কাছে একটি রহস্য রয়ে গেল। তাঁর জীবিতকালে হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে কখনো তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছি মনে পড়ে না। সে সময় এ কথা জানলে এর একটা মীমাংসা তখনই হয়ে যেত, আজ তো আর কোনো উপায়ই নেই।' (পরিমল গোস্বামী, ১৪০০ ব : ৩৩)। আসলে হয়তো এ রহস্যের সমাধান হওয়ার নয় ; কারণ বিভূতিভূষণের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ সুহৃদ্ পরিমল গোস্বামী পনেরো-ষোল বছরের বাল্য-কৈশোর বলতে যা ভাবতে পারেন, খুবই সম্ভব বিভূতি-জীবনের পঞ্চদশ কি

ষোড়শ বছরটি তার থেকে অনেকখানি আলাদা ছিল। বাল্য থেকেই যে বিভূতি একান্ত স্বপ্নদর্শী, জ্ঞানপিপাসু, তার ষোল বছরের কৈশোর হ্যালির ধূমকেতুর নাগাল হয়তো বহু চেষ্টাতেও পেত না। এমনকী, এরকম কোনো চেষ্টার যে প্রয়োজন আছে, সে কথাও হয়তো বিভূতিভূষণের কৈশোরে এসে পৌঁছয়নি।

কে বলতে পারে, এই যে মিথ্যারসিক বিভূতিভূষণ নিজের বয়স নিয়ে নানান্ গল্প বানিয়ে যেতেন নানান্ আসরে, তা কোনো সংকোচকে আড়াল করতেই নয়? বারাকপুর গ্রামের দরিদ্র কথকব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ সন্তানকে জীবনের কুড়িটা বছর তো কাটিয়ে দিতে হয়েছিল ম্যাট্রিক পরীক্ষা পেরনোর জন্য! নিজের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে, নিজের পিপাসাকে তৃপ্তি দিতে, লড়তে হয়েছিল কঠিন আর্থ-সামাজিক লড়াই। জীবনে বারবার বিভূতিভূষণ নিজের সাংস্কৃতিক, আর্থিক অর্জন নিয়ে বিস্মিত হয়েছেন। এমন-কি জীবনের একেবারে শেষ পর্বে, ১৯৫০ সালের ৪ জুলাই মণীন্দ্রলাল বসু বিভূতিভূষণের পুত্রকে বই উপহার দিলে, বাবলুর বাবার মনে হয়, 'যখন জাঙ্গিপাড়ায় মণীন্দ্রলাল বসুর গল্প প্রথম পড়ি, তখন কি জানি আমার ছেলেকে সে বই দেবে?' (অ. র. ৩ : ২৮৮)। আজও জানা যায় না কলকাতার ছাত্রজীবনে কী ছিল বিভূতিভূষণের প্রাত্যহিক লড়াইয়ের স্বরূপ। কোন্ কোন্ বিষয় নিয়ে ইনটারমিডিয়েট পড়েছিলেন তিনি? ইম্‌পিরিয়াল লাইব্রেরিতে কীভাবে, কবে শুরু হয়েছিল তাঁর যাতায়াত? প্রথম কোন্ বইটি তিনি পড়েছিলেন সেই গ্রন্থাগারে? এমনকী পরিমল গোস্বামীকে যে তিনি নিজমুখে বলেছিলেন যে রিপন কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন কলেজের এক বিতর্কসভায় 'নূতনের আহ্বান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ বিভূতিভূষণ নাকি পাঠ করেছিলেন, (যুগান্তর, ১২ নভেম্বর, ১৯৫০) কে জানে এই বলার মধ্যেও বিভূতিভূষণ-সুলভ মিথ্যারসিকতা অনেকখানি মিশে আছে কি না! 'অপরাজিত' উপন্যাসে অপূর্বকুমার কলেজে এরকম একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিল আর সেই সূত্রে পেয়েছিল অনিলের মতো বন্ধু। কিন্তু বিভূতিভূষণের লেখা 'নূতনের আহ্বান' কি কোনো গবেষক স্বচক্ষে দেখেছেন? তাছাড়া অপুর ভিতরে নিজেকে আর নিজের মধ্যে অপুকে মিলিয়ে মিশিয়ে বিভূতিভূষণের খেলা তো অন্তহীন! সে ক্রীড়ার কৌশল কি নিকটজনেরাও সর্বদা নির্ভুল ধরতে পারতেন?

সময় যত এগিয়েছে, বিভূতিভূষণ যতই লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক হয়েছেন, ততই হয়তো কমেছে বিভূতিজীবন বিষয়ে তথ্যের অপ্রতুলতা। কিন্তু আত্মতুষ্টির কোনো

অবকাশ আজও গবেষকের নেই। তাই তো মাত্র ছাপ্পান্ন বছরের ভ্রমণপাগল জীবনকে, এক পেশা থেকে অন্য পেশায়, এক চাকরি থেকে অন্য চাকরিতে ফেরা জীবনকে, অপু-অপূর্বকুমারের নির্মাণ থেকে ভবানীচরণের সৃষ্টি পর্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত এক শিল্পীর জীবনকে কখনোই বড়ো একটা নিশ্চিন্ত নাগালে পাওয়া যায় না। আর বিস্মিত হয়ে দেখি, বিভূতিজীবনের শেষ কয়েকটি দিন, শেষ অসুস্থতা নিয়ে প্রচলিত কাহিনীতেও আজ দ্বিমত দেখা দিয়েছে। আজ যদি ফিরে দেখতে হয় বিভূতিজীবনকে, সব থেকে সংগত কি তবে ১৯৫০-এর ১ নভেম্বর দিয়েই সে দেখা শুরু করা? যেদিন সন্ধ্যা ৮টা ১৫ মিনিটে ঘটেছিল সেই মৃত্যু, যার প্রসঙ্গে চার-দিন পরে ৫ নভেম্বরের আনন্দবাজার পত্রিকায় শ্রীকমলাকান্ত শর্মা লিখেছিলেন 'আকস্মিকতা কদাচিৎ এমন অকস্মাৎ বেশে দেখা দিয়া থাকে'?

তখন বিভূতিভূষণ থাকেন বারাকপুর গ্রামে সেই বাড়িতে, যে বাড়ি ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে সইমার কাছ থেকে কিনেছিলেন। সুপ্রভা দত্তকে লেখা ১২ অক্টোবর ১৯৩৮-এর চিঠিতে আছে, 'আমি সইমার সেই বাড়ীটা কিনেচি, কাল প্রথম সেই বাড়ীতে রাত্রি কাটালুম মালিক হিসেবে। খুব বড একটা শিউলি গাছ আছে উঠোনে...' (অপ্রকাশিত)। ওই ১৯৫০-এর ৬ সেপ্টেম্বর চিঠি পেয়েছেন যে বনগাঁ কলেজ বিভূতিভূষণকে বাংলা বিভাগে শিক্ষক নিযুক্ত করেছে, পুজোর ছুটির পরে ১৬ নভেম্বর সে কাজে যোগদান করার কথা। বাসে চেপে গিয়েছেন কলেজের অধ্যক্ষের কাছে, কথাবার্তা হয়ে গেছে। (অ. র. : ২৯৯-৩০০)। সেবারের পুজোর ছুটিটা বিভূতিভূষণ কাটাচ্ছিলেন ঘাটশিলায়। ঘাটশিলার 'গৌরীকুঞ্জে'র স্থায়ী বাসিন্দা তখন বিভূতিভূষণের সর্বকনিষ্ঠ এবং একমাত্র জীবিত সহোদর ডাক্তার নুটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর স্ত্রী যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমা স্ত্রীর নামে যে বাড়ির নাম বিভূতিভূষণ রেখেছিলেন 'গৌরীকুঞ্জ', সেই বাড়িটি সম্ভবত কেনা হয়েছিল ১৯৩৯ সালে। সুপ্রভা দত্তকে লেখা ১৯৩৯-এর ১৪ অক্টোবরের চিঠিতে আছে, 'ঘাটশীলায় একখানা বাড়ি কিনেচি —আমার ছোটভাই সেখানে যাচ্ছে সস্ত্রীক পুজোর আগেই'।

ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণের বাড়ি কেনা নিয়ে 'শনিবারের চিঠি'র ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "সংবাদ সাহিত্য" বিভাগে লেখা হল '..."পথের পাঁচালী"র গায়ক, চিরভ্রাম্যমাণ এবং বিপত্নীক বিভূতিভূষণ ঘাটশিলায় সম্প্রতি একটি বাড়ি খরিদ করিয়াছেন, সুতরাং আমরা আরও কিছু সংবাদ অচিরাৎ

প্রত্যাশা করিতে পারি ··।' (৩২০-২১)। মাঘ সংখ্যার "সংবাদ-সাহিত্যে" 'শনিবারের চিঠি' লিখেছিল, 'পূর্ব্বে আমরা সংবাদ দিয়াছিলাম যে, প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বহু ঘাট ফিরিয়া অবশেষে ঘাটশিলায় একটি বাড়ি কিনিয়াছেন···এবারকার সংবাদ, বিভূতিবাবু গৃহপ্রবেশ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার চাদরের খুঁট খোলাই ছিল। তবে ঘরে প্রবেশ করিলেও বাহির হইতে হয়, কারণ বিভূতিবাবুর মন বহির্মুখী, সুতরাং পুনরায় ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন আবার গৃহপ্রবেশ করিবেন, তখন চাদরের খুঁট কেমন থাকিবে কে জানে!' (৬২০) ঘাটশিলায় এই বাড়িটি কিনবার পিছনে গল্প একটা আছে।

মুকুল চক্রবর্তীর ঝুলি থেকে সে কাহিনী বিস্তারিত পাওয়া যায়—'বাড়িটা আগে ছিল শ্রীঅশোক গুপ্তের। গুপ্ত সাহেব ছিলেন একজন অতি উচ্চ শিক্ষিত আদর্শবাদী শিক্ষাবিদ্। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বিলেতে থাকতেন। অবসরপ্রাপ্ত জীবনে বিকলাঙ্গ ও মানসিক অপরিণত শিশুদের শিক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার এক পরিকল্পনা খাড়া করলেন। ইংরাজ সরকার কর্ণপাত করলেন না। অশোক গুপ্তের স্ত্রীও ছিলেন তাঁর উপযুক্ত সহধর্মিণী। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী মিলে স্থির করলেন ক্ষুদ্রতর পরিবেশে ঐ বিষয় নিয়েই গবেষণা করে যাবেন। দু-দশটি বিকলাঙ্গ ও অপরিণতবুদ্ধি শিশুকে নিয়ে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন। এইজন্য চাই গ্রাম্য নির্জন পরিবেশে একটা আস্তানা। অনেক স্থান ঘুরে শেষ পর্য্যন্ত ঘাটশিলার ঐ জনহীন স্থানটিই পছন্দ হল দুজনের। বাড়িটি তাঁরাই তৈরী করেন। সীমিত ক্ষমতার ভিতর যতটুকু সম্ভব পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল। ঐ সময়েই বিভূতিভূষণের সঙ্গে অশোক গুপ্তের পরিচয় হয়। ওঁর সাধনার কথা শুনে বিভূতিভূষণ তাঁকে খুব উৎসাহ দিয়েছিলেন। তাঁর আর্থিক দুরবস্থার কথা শুনে বিভূতিভূষণ গুপ্ত সাহেবকে তখন পাঁচশত টাকা কর্জ দেন। তারপর ক্রমে ক্রমে গুপ্ত সাহেব নানাভাবে জড়িয়ে পড়েন। তিল তিল করে ওঁর প্রতিষ্ঠান নিঃশেষ হয়ে গেল। গুপ্ত সাহেবের স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পড়ল। বিভূতিবাবু ইচ্ছাসত্ত্বেও গুপ্ত সাহেবের খোঁজ খবর নিতে পারতেন না, পাছে গুপ্ত সাহেব ভাবেন টাকাটা ফেরত পাওয়ার জন্যই বিভূতিবাবু খোঁজ করছেন।

'একদিন কলেজ ষ্ট্রীটে বইয়ের দোকান থেকে বের হয়েই বিভূতিবাবু দেখতে পেলেন বিপরীত ফুটপাত দিয়ে অশোক গুপ্ত এই দিকেই আসছেন। বিভূতিভূষণ তৎক্ষণাৎ হাতের ছাতাটি খুলে মুখটা আড়াল করে পাশ কাটাতে

চাইলেন, কিন্তু তার পূর্বেই গুপ্ত সাহেব তাঁকে দেখে ফেলেছেন।

"বিভূতি না?"

'অপ্রস্তুত বিভূতিভূষণের তখন "ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা"। গুপ্ত সাহেব এগিয়ে এসে বিভূতিভূষণের হাতটি ধরে বললেন "আমার একটা উপকার করতে হবে বিভূতি, না বললে শুনব না।"

'বিভূতিবাবু তো কৃত কৃতার্থ। অশোক গুপ্তকে তিনি দাদা ডাকতেন। ঐ আদর্শবাদী সর্বত্যাগী শিক্ষাবিদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল তাঁর। বললেন—"নিশ্চয় রাখব। বলুন দাদা।"

"আমাকে ঋণমুক্ত করতে হবে। আমার ছেলেখেলা শেষ হয়েছে ভাই। দুনিয়াদারীর হাটে যা কিছু ঋণ ছিল সব একে একে মিটিয়ে দিয়েছি। বেশ বুঝতে পারছি ডাক এসেছে। তোমার ঐ পাঁচশ টাকা—।"

'বিভূতিভূষণ আমতা আমতা করে বললেন, "—তা সুযোগ সুবিধা মত এক সময় দিয়ে দিলেই চলবে।"

"না না বিভূতি। তুমি যখন আমায় দাদা বলেছ তখন আমাকে ঋণমুক্ত করে দেবার দায় তো তোমার। ঋণ নিয়ে মরেও আমি শান্তি পাব না। শোন, ঘাটশিলায় যে আমার বাড়ীটা তৈরী করেছি, ওটাই তোমার নামে লিখে দেবো। ঐ টাকার পরিবর্তে তুমি বাড়ীখানা নিয়ে আমায় ঋণমুক্ত কর।"

'বিভূতিভূষণ প্রচণ্ড আপত্তি জানালেন, "তা কেমন করে হবে। একখানা বাড়ীর দাম ৫০০৲ টাকার অনেক বেশী। তা হলে আর কত টাকা আপনাকে দিতে হবে বলুন।"

"না, আর কিছুই তোমাকে দিতে হবে না।" গুপ্ত সাহেব রেজিষ্ট্রি করে বাড়ীটা ওঁকে দিয়ে গেলেন।...চমৎকার বাড়ী। খোলার চাল সিমেন্টের মেঝে, তিনখানা ঘর, সামনে বারান্দা, রান্নার জায়গা, ভাঁড়ার ঘর এবং সামনে একটি প্রশস্ত উঠান। গুপ্ত সাহেব যতই আদর্শবাদী হন, তিনি বিলাত-ফেরৎ মানুষ। বাড়ীটি তাই ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করেছেন। মাল মশলাও ভাল ছিল। ভাল এবং মজবুৎ। শক্ত বাঁধুনি।...সামনের বারান্দায় দাঁড়ালে সুবর্ণরেখা এবং তার ওপারে অনতিদূরে পাহাড়ের দৃশ্যে অভিভূত হতে হয়। বিভূতিভূষণ বাড়ীর নাম দিলেন "গৌরীকুঞ্জ"।' (মুকুল চক্রবর্তী, ১৩৭৯ ব: ১০২-৫)। এই হল ঘাটশিলার গৌরীকুঞ্জের ইতিহাস। যে বাড়িতে ১৯৫০-এর পুজোর ছুটি কাটাচ্ছিলেন বিভূতিভূষণ। যে বাড়িতে ১৯৫০-এর ১ নভেম্বর সন্ধ্যায় আকস্মিকতা

সেই অকস্মাৎ বেশে এসেছিল।

গোপালনগরে হরিপদ ইনস্টিটিউশনের চাকরি, কলকাতার সংস্কৃতি জগতের নানান ব্যস্ততা, এসবের অবকাশে যখনি পারতেন, ঘাটশিলায় আসতেন বিভূতিভূষণ—বড়ো প্রিয় জায়গা তাঁর, ফুলডুংরি, সুবর্ণরেখা নদী, আরো দূরে ধারাগিরি। যখন বিভূতিভূষণ ঘাটশিলায় আসতে পারেন না, তখন চিঠি যায় এখানকার নিকটজনদের কারো কাছ থেকে, 'আপনি না থাকলে ঘাটশিলা is a desert…শীগগির আসুন।' (অ. র. : ১১০)। সেই ১৯৫০-এর পুজোর ছুটিতেও বিভূতিভূষণের কাজের অন্ত নেই। সেবছর সেপ্টেম্বর মাসে বিভূতিভূষণের জন্মদিন অনুষ্ঠান হয়েছিল কলকাতায়, সুইনহো স্ট্রিটে, বিভূতিভূষণের দ্বিতীয়া স্ত্রী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামার বাসাবাড়িতে। এই অনুষ্ঠানে গজেন্দ্রকুমার মিত্র এবং সুমথনাথ ঘোষ বিভূতিভূষণকে একটি কালো কভারে ঢাকা বাঁধানো খাতা উপহার দেন, যার উপরে ইংরেজিতে, সোনালি অক্ষরে লেখা 'কাজল'। (রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৭৭ ব : কাজল ৫)। 'কাজল' লিখতে হবে, লিখতে হবে 'ইছামতী'র দ্বিতীয় খণ্ড, যার প্রস্তুতি চলেছে ছোটো ডায়েরিতে, 'পিতৃভক্তি দেখাও ইছামতী II-এ। পিতৃভক্তি বড় জিনিস। পিতাদের অনাদরের মধ্যে টাটানগরের সেই বৃদ্ধটির কথা দিতে পারো।' (অপ্রকাশিত)। জন্মদিনের ওই অনুষ্ঠানের পরে দিনলিপিতে লিখেছেন, 'বাবার দশ টাকা দেওয়া মনে পড়লো। কতদিনের কথা—সেই খড়ের ঘরে জল পড়চে।' (অ. র. : ৩০১)। তাছাড়া 'অথৈ জল' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড লেখারও ইচ্ছে আছে।

সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় সুইনহো স্ট্রিটে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যেমন উপস্থিত ছিলেন, সজনীকান্ত দাস, কালিদাস রায়, বাণী রায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নলিনাক্ষ সান্যাল, বেগম জাহানারা এবং তাঁর স্বামী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, ঘাটশিলাবাসী লরি বাংলোর ভক্তবাবু সস্ত্রীক, তারক গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, ২৫ অক্টোবর ঘাটশিলায় স্থানীয় ডাক্তার সুবোধ বসুর বাড়িতে বিভূতি-সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও জনসমাগম কম হয়নি। ঘাটশিলার স্কুলের প্রধান শিক্ষক গোকুল পাইন, শিক্ষক যতীশবাবু আর শিবসত্য চক্রবর্তী, লরি বাংলোর ভক্তবাবু, বিভূতিভূষণের মামাশ্বশুর নিরঞ্জন চক্রবর্তী (যাঁর সুইনহো স্ট্রিটের বাড়িতে জন্মদিন অনুষ্ঠান হয়েছিল), ধলভূমগড় রাজ এস্টেটের ম্যানেজার বঙ্কিম চক্রবর্তী তো ছিলেনই, কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন প্রবোধ সান্যাল, সুমথনাথ ঘোষ, প্রমথনাথ বিশী, কুলেশ কর, প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত,

আরো অনেকে। সেদিন ছিল কোজাগরী পূর্ণিমা। প্রবোধ সান্যাল কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। সংবর্ধনার উত্তরে বিভূতিভূষণ বলেছিলেন, 'এতো যে সংবর্ধনার আয়োজন, আমার যা দেবার সব কি শেষ হয়ে গেল নাকি। ভবিষ্যতে কি আর কিছু করব না ?' (প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত, ১৯৯২ : ১৮০)।

তখনো রোজ লিখতে বসেন বিভূতিভূষণ। লেখা হচ্ছে 'অনশ্বর' উপন্যাস, শেষ হয়েছে সেই কাহিনী, যা "শেষ লেখা" নামে পরে 'কুশল পাহাড়ী' সংকলনে বেরিয়েছিল। নামকরণের অবশ্য বিভূতিভূষণ অবকাশ পাননি। লেখা হয়ে গেছে "কাশী কবিরাজের গল্প", "আমার ডাক্তারি" কিংবা "ছোটনাগপুরের জঙ্গলে"র মতো গল্প, যা প্রকাশিত হয়েছিল বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পরে। প্রথম দুটি যথাক্রমে 'অভিষেক' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৫৮ সংখ্যায় এবং ওই বছরেব শারদীয় 'কথাসাহিত্যে'। তৃতীয়টি বেরিয়েছিল 'বসুধারা' পত্রিকার ১৩৬০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় (বি. ব. ৪ : ৪৯৩)। "কবিরাজের বিপদ" বেরিয়েছিল ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের 'উদয়ন' পূজাবার্ষিকীতে। কিন্তু যেদিন সন্ধ্যায় ধলভূমগড়ের রাজ এস্টেট থেকে অসুস্থ শরীরে ফিরেছিলেন, সেই ২৯ অক্টোবরও ভোরে সূর্যের আলো ফুটবার আগে স্ত্রীকে ডেকে তুলেছেন ঘুম থেকে, 'ওঠো ওঠো। গেট খুলে দাও।··· "কাজলের" ছক তৈরী করব না আজ ? মনে নেই ?···উপাসনা সেরে নেব না আমার সেই শিলাসনে। তারপরে লেখা।' (রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৭৭ ব : কাজল ৬)। ফুলডুংরির পিছনে বনের মধ্যে এক বিরাট পাথরের উপরে বিভূতিভূষণের লেখা আর উপাসনার জায়গা। বাড়ি ফিরতে সেদিন হয়ে গেল সাড়ে দশটা-এগারোটা। যেটুকু খাবার তাঁর জন্য তৈরি ছিল, তাতে খিদে মিটল না। আরো কিছু খেতে চাইলেন। নারকেল-চিঁড়ে অতি প্রিয় আবার বিভূতিভূষণের, কল্যাণী তাই খানিক এনে দিলেন।

খেতে খেতে অস্বস্তি, বুকে যেন চিঁড়ে আটকে গেছে! সাতাশ বছরের কল্যাণী বলেছিলেন, 'শুকনো চিঁড়ে খেলে এমনিই হয়। ভিজিয়ে খেতে চাও না আম কলা না থাকলে। কত ঘুরে এসেছ, গলা শুকিয়ে আছে না ?' সারাজীবনে খুব কমই ওষুধ খেয়েছেন যে মানুষ, তিনি কোরামিন চাইলেন। বিচলিত হলেন কল্যাণী, যমুনা। কিন্তু দশ ফোঁটা কোরামিন খেয়ে বিভূতিভূষণ সামলে নিলেন। তবে পুকুরে স্নান করতে গেলেন সেদিন একা, রোজকার মতো তিনবছরের বাবলুকে সঙ্গে নিলেন না। উদ্বিগ্ন কল্যাণী বারবার বলেছিলেন, ঘরেই স্নান করতে, অভয় দিয়ে গেলেন, 'কিছু হবে না। যাব আর আসব।' দুপুরে

খেতে বসেছেন, ধলভূমগড় রাজ এস্টেট থেকে বঙ্কিম চক্রবর্তীর চায়ের নিমন্ত্রণ নিয়ে এল এক পত্রবাহক। (রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৭৭ ব : কাজল ৭৮)। আর এইখান থেকেই শুরু হল জীবনীকারের বিপদ।

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় আছে, 'ঘাটশিলায় উপস্থিত···সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক দলটিকে ধলভূমের রাজা ২৯শে অক্টোবর এক বৈকালিক চায়ের সভায় নিমন্ত্রণ করেন।' (সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৭০ : ১৯৩)। কিশলয় ঠাকুর লিখেছেন, 'প্রমথনাথ বিশী, সুমথ ঘোষ, অধ্যক্ষ ডঃ অরুণ সেন, বিশ্বপতি চৌধুরী প্রমুখ অনেক লোক উপস্থিত বঙ্কিমবাবুর ওখানে। বঙ্কিমবাবু অভ্যাগতদের তাঁর নতুন তৈরি কারখানাটা ঘুরিয়ে দেখালেন। বিভূতিভূষণ উঠলেন না। শরীরটা আবার খারাপ লাগছে। না এলেই বুঝি ভালো হোত। বসলেন বটে সবার সঙ্গে, খেতে পারলেন না কিছু।···একটা জিনিস খেয়েছিলেন, যা না খেলেই ভাল হত। সেটা শিঙাড়া। সুমথবাবুর কথা—"শিঙাড়াটা একদম সবুজ হয়ে গিয়েছিল। আমরা আর কেউ ছুঁইনি পর্যন্ত"।' কিশলয় ঠাকুর আরো জানিয়েছেন, ফিরবার পথে গাড়িতে যখন বিভূতিভূষণ দুবার বমি করেন, তখন গাড়িতে ছিলেন প্রমথনাথ বিশী এবং সুমথনাথ ঘোষ। পথে প্রমথ বিশী নেমে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে, বিভূতিভূষণকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নাকি ছিল সুমথ ঘোষের। (কিশলয় ঠাকুর, ১৯৭৮ : ২৮৪-৮৫)। ১৯৯২ সালে রসায়নের বিশিষ্ট অধ্যাপক প্রতুলচন্দ্র রক্ষিতের 'পেরিয়ে এলাম' শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। এ বইয়ের "ঘাটশিলা" অধ্যায়ে আছে, 'সেই সন্ধ্যায় প্রমথবাবু এবং আমি ছাড়া বঙ্কিমবাবুর ওখানে বিভূতিবাবুর সঙ্গে আর কেউ যান নি।' (প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত, ১৯৯২ : ১৮১)। বিভূতিভূষণের ভ্রাতৃবধূ যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণে অবশ্য দেখি, সেই ২৯ অক্টোবর রাত্রি আটটা নাগাদ বিভূতিভূষণ গৌরীকুঞ্জের সামনে অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় গাড়ি থেকে নেমেছিলেন সুমথনাথ ঘোষের কাঁধে ভর দিয়ে। সুমথনাথ ঘোষ নাকি বলেছিলেন, 'বড়দা ওখানে কবিতা আবৃত্তি করেছেন, ঘুরে ঘুরে কি যেন দেখেছেন, তারপর বললেন, আমার শরীর খারাপ লাগছে। তখুনি গাড়ি করে বাড়ি ফিরেছি, গাড়িতেই একবার বমি করেছেন।' (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ১০০)।

প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত লিখেছেন, 'বঙ্কিমবাবু আমাদের তিনজনকে সাদর অভ্যর্থনা করে নিয়ে তাঁর প্রকাণ্ড ড্রইংরুমে বসালেন। তাঁর গৃহিণী এবং দুই কন্যার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বিভূতিবাবুকে নিজেদের বাড়িতে পেয়ে ওঁরা সবাই

আনন্দে উচ্ছ্বসিত। বঙ্কিমবাবুর মেয়েরা দু'তিনটি রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনাল, বড় মেয়েটি সেতার বাজিয়েও শোনাল।...বঙ্কিম-গৃহিণী আমাদের জন্য প্রচুর খাবার এনে উপস্থিত করলেন। বিভূতিবাবু খেতে ভালবাসতেন, সবাই জানে। কিন্তু সেদিন তিনি প্রায় কিছুই খেলেন না। বললেন, "শরীরটা ভাল লাগছে না।" ...একটিমাত্র মিষ্টি তুলে নিলেন। আর বললেন; "বাকীটা ছাঁদা বেঁধে দাও, বাবলুর জন্য নিয়ে যাব।"...গ্রন্থকার বিভূতিবাবুর জীবন-আলেখ্য লিখতে গিয়ে বলেছেন যে তিনি সেখানে সিঙাড়া খেয়েছিলেন এবং সেটা খারাপ ছিল সেজন্য তাঁর অসুখ করে। এটা অলীক কল্পনামাত্র। আমি সেখানে ছিলাম, তিনি একটি মিষ্টি ছাড়া আর কিছুই খান নি।...গ্রন্থকার বলেছেন, ওখানে গিয়ে বিভূতিবাবু বঙ্কিমবাবুর কারখানা ঘুরে ঘুরে দেখেছিলেন...বিভূতিবাবুব সঙ্গে প্রমথবাবু বিশ্বপতিবাবু প্রভৃতি সবাই গিয়ে নতুন কারখানা দেখেছিলেন।...আদৌ সত্য নয়। আমি...সর্বক্ষণ তাঁর সঙ্গে ছিলাম, তিনি মোটেই ফ্যাক্টরীতে ঢোকেন নি। ...সেই সন্ধ্যায় প্রমথবাবু এবং আমি ছাড়া বঙ্কিমবাবুর ওখানে বিভূতিবাবুর সঙ্গে আর কেউ যান নি।' ' প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত, ১৯৯২ : ১৮১)।

তবে কি যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিব বিভ্রমে প্রমথনাথ বিশী হয়ে গেছেন সুমথনাথ ঘোষ? নাকি বিভূতিভূষণকে অতখানি অসুস্থ দেখে প্রমথ বিশী, প্রতুল-চন্দ্র রক্ষিত গাড়ি থেকে নেমে যাওয়ার পরে, সুমথ ঘোষকে ডেকেছিলেন? ২৫ অক্টোবরের সংবর্ধনা উপলক্ষে সুমথনাথ ঘোষ ঘাটশিলায় এসেছিলেন, এ তো সত্যি। হয়তো তিনি তখনো ছিলেন ঘাটশিলায়। প্রতুলচন্দ্র রক্ষিতের লেখায় আছে, ধলভূমগড় রাজবাড়ি থেকে ফিরবার পথে মাইলখানেক এসে পদ্মপুকুরের হাটের কাছে বিভূতিভূষণ গাড়ি থামাতে বলেন, সেই স্টেশন ওয়াগন, যা নাকি প্রমথনাথ বিশী, প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত আর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিকেলবেলায় নিয়ে গিয়েছিল রাজবাড়িতে। গাড়ি থামিয়ে, গাড়ি থেকে নেমে, সামান্য একটু বমি করলেন বিভূতিভূষণ, বললেন, 'বড় অস্বস্তি হচ্ছে'। সেদিন বিকেলে বৃষ্টি হয়েছিল, তখনো রাতের আকাশে ছিল ঘন কালো মেঘ, পথ ছিল জনমানবশূন্য। পোশাক-পরিচ্ছদে চিরকাল উদাসীন, কখনো বা বিসদৃশ যে বিভূতিভূষণ, তাঁর সাজগোজ সেদিন ছিল রাজবাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষার উপযুক্ত – কল্যাণীর একান্ত ইচ্ছায় সাজতে হয়েছিল। প্রতুলবাবুর বাড়ি পড়ে সবার আগে। তিনি অনুরোধ করেছিলেন, বিভূতিভূষণ যদি নেমে, মুখ ধুয়ে, একটু বিশ্রাম নিয়ে যান। কিন্তু বিভূতিভূষণ তাড়াতাড়ি গৌরীকুঞ্জে পৌঁছতে চাইছিলেন, প্রমথনাথ বিশী তাঁকে

পৌঁছতে গিয়েছিলেন। (প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত, ১৯৯২ : ১৮০, ১৮২)।

তারপর তিন দিনও কাটেনি। নুটুবিহারীর মতো ডাক্তার তো ঘরেই আছেন, এসেছেন ঘাটশিলার স্থানীয় ডাক্তার সুবোধ বসু। টাটানগর থেকে প্রখ্যাত চিকিৎসক ব্রহ্মপদ মুখোপাধ্যায়কে আনানোর ব্যবস্থাও হয়েছিল। কিন্তু তখন বিভূতিভূষণের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেছে, অক্সিজেন চলছে। টাটানগর থেকে এই সময় ব্রহ্মপদ মুখোপাধ্যায় এলেও, তাঁর আসা যে নিরর্থক হবে, তা বোঝা যাচ্ছিল। তাই ট্রাঙ্ককলেই তাঁকে আসতে বারণ করা হয়। (সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৭০ : ১৯৪)। এই তিনদিনের যা কিছু বিন্যাস আজ পর্যন্ত পাঠকের কাছে পৌঁছেছে, তার থেকে মনে হয়, বিভূতিভূষণ যেন নিজের অবসানকে প্রত্যক্ষ করতে পারছিলেন। হয়তো তাই, দুই দশকের অনিকেত জীবনের শেষে পাওয়া তাঁর গৃহকোণকে মাত্র দশবছরের নাবালক অবস্থায় ফেলে যেতে, সাতাশ বছরের তরুণী পত্নীকে, তিন বছরের শিশুপুত্রকে ছেড়ে যেতে, বারবার সরবে-নীরবে ভাবতে চাইছিলেন যে, 'দেবযান' সত্যি।

জীবনের শেষের দিকে বিভূতিভূষণের পছন্দসই পড়ার ভিতরে ছিল, স্বামী অভেদানন্দের 'লাইফ বিয়ন্ড ডেথ'-এর মতো বই (অ. র. : ২৯৯), কর্নিলরের 'দ্য সারভাইভাল অভ্ সোল অ্যান্ড ইট্স্ এভোলিউশন আফ্টর ডেথ' (অ. র. : ৩০৪), কিংবা 'উদ্বোধন' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামীজি অখণ্ডানন্দের বাণীসমূহ (অপ্রকাশিত)। অকালে পিতৃহীন বিভূতিভূষণ কৈশোর থেকে যে দায়দায়িত্বে আকীর্ণ জীবন বহন করেছিলেন, তার রেশ জীবনের শেষ মুহূর্তেও তাঁকে ছেড়ে যায়নি। ওভারসিয়ার বাবুকে, বঙ্কিম চক্রবর্তীকে, সুবোধ বসুকে বারবার বলেছেন, নুটুকে যেন তারা দেখে। যমুনার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছেন, বউমা যেন সুখী হয়। (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ১০১-২)। কল্যাণীর সব আকুলতা অগ্রাহ্য করে দিয়েছেন কিছু শেষ নির্দেশ। আর ১ নভেম্বর, ১৯৫০, রাত্রি ৮টা ১৫ মিনিটে অবসানের ঠিক আগের মুহূর্তে বিভূতি-ভূষণ বললেন, 'বাবলু কই'? শেষ মুহূর্তটিতে তাঁর চোখ ছিল বাবলুর মুখের দিকে, মুখে ছিল হাসি। (সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৭০ : ১৯৪-৯৫)।

এখানে মিলিয়ে নেওয়া যায় বিভূতিভূষণের 'দেবযান', বিভূতিভূষণের পরলোকচিন্তা, ঈশ্বরচিন্তা, আর জীবনের শেষ তিনটি বছরে বারে বারে সেই ঈশ্বরচিন্তায় বাবলুর ভাবনা মিশে যাওয়াকে। ১৯৫০-এর ৮ ফেব্রুয়ারি দিনলিপিতে তিনি লিখেছিলেন, 'বাবলুর সঙ্গ অতি নিষ্পাপ ও মনোরম।'

(অ.র. : ২৬৬)। ১৭ সেপ্টেম্বরের দিনলিপিতে আছে 'প্রথমে মনে হোত (১, যা কিছু নিজের সুবিধের জন্যে—পরলোক ইত্যাদি। ২. এখন মনে হয় বাবলুর জন্য। (৩) ভগবানের জন্যে আমার নিজের কোনো দরকার নেই।' (অ. র. : ৩০২)। আর এখানেই মিলে যেতে পারে বিভূতি-স্মরণে লেখা কালিদাস রায়ের কবিতার সেই জিজ্ঞাসার উত্তর :

মাটির মাধুরী আর ঐশ্বর্যের শ্রীভাণ্ডার
দেখিবার সাধ,
মাটির পাত্রের সুধা পিইবার তৃষা ক্ষুধা
ছিল যে অগাধ।
সে সাধ তো পূরে নাই সে ক্ষুধা তো মিটে নাই,
এ মাটির টান
ভুলিতে পারিবে বন্ধু ? জানি না লিখেছ কেন
তুমি 'দেবযান'।

(কালিদাস রায়, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ ব : ১২১)

এই সাধ, এই সুধা, এই টান, এই পিয়াস যে মানুষের জীবনের আর সাহিত্যের মূলমন্ত্র, তাঁকেই তো ভাবতে হয় যে, তিনি দেবযানের আরোহী ; তেমন আরোহণের সুবাদে মরণের পরেও তিনি বারবার দেখে যেতে পারবেন, তাঁর বাবলুকে, তাঁর কল্যাণীকে, তাঁর সংসারকে, তাঁর পৃথিবীকে !

রোগ আর তার চিকিৎসাকে আজ আমরা সাধারণ বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতায় নির্ভর করে যেটুকু বুঝি, তাতে মনে হয়, ওই অসুস্থতা আর আকস্মিক মৃত্যু খুবই সম্ভব হৃদ্‌রোগের অপ্রতিরোধ্য আক্রমণ আর তার পরিণাম। ওই যে বুকের কাছে চাপ লাগা, অস্বস্তি, বমি, এসবই তার ইঙ্গিত দেয়। মৃত্যুর কিছুদিন আগে নাকি বিভূতিভূষণ একটি শবদেহকে নিজের শবদেহ বলে চিনতে পেরেছিলেন, ঘাটশিলায় সাঁওতালদের অন্ত্যেষ্টির জন্য নির্দিষ্ট এঁদেলবেড়ার জঙ্গলে (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ৯৭-৮), রহস্য তো আরো আছে। বিভূতিভূষণের মৃত্যুর কয়েকদিনের মধ্যে অচেনা অজানা এক বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি এসেছিল পাকুড় থেকে ঘাটশিলার গৌরীকুঞ্জে—আরো বিপদ আসছে, অবিলম্বে স্থানত্যাগ করুন। বিভূতিভূষণের মৃত্যুর ঠিক সাতদিনের ব্যবধানে ৮ নভেম্বর ১৯৫০ নুটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় চলে গেলেন ; আর সে মৃত্যুকে খুব স্বাভাবিক

মৃত্যু বলা চলে না। নুটুবিহারীর মৃত্যুর পরে যখন সেই একই বৈদ্যনাথ একই পাকুড় থেকে আবারও লিখলেন, এখনো সরে পড়ুন, আরও বিপদ আসছে, যমুনা আর কল্যাণী তখন শিশু বাবলুকে নিয়ে ঘাটশিলা ছাড়লেন। যমুনা গেলেন তাঁর বাপের বাড়ি ভাটপাড়ায়, আর কল্যাণী এলেন নৈহাটি ব্যারাকপুরে—সেখানেই তখন কল্যাণীর পিতা ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কর্মস্থান এবং নিবাস। এরকম চিঠি যে সত্যিই এসেছিল, আর ষোড়শীকান্ত সে চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন, একথা তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাবালক হয়ে শুনেছেন। অবশ্যই সে চিঠি তিনি কখনও চোখে দেখেননি। তবে বহুদিন পর্যন্ত, তারাদাসের ঘাটশিলায় যাওয়ার ব্যাপারে রমা বন্দ্যোপাধ্যায় অস্থির উদ্বেগে আকুল হতেন, ছেলেকে কিছুতেই একা ঘাটশিলায় যেতে দিতেন না, একথা তারাদাসই বলেছেন। রমা বন্দ্যোপাধ্যায় সুস্থ থাকলে, এ প্রসঙ্গে আরও কোনো খোঁজ হয়তো পাওয়া যেত। তবে এটুকু মানতেই হয়, বিভূতি-জীবন নিয়ে, এমনকী মরণ নিয়েও রহস্যের বুঝি শেষ নেই।

সবুজ রঙের পচা সিঙাড়ার গল্প কি ওই ভোজনরসিক, মিথ্যারসিক, রহস্যপ্রিয় বিভূতিভূষণে বড়ো বেশি খাপ খেয়ে যায়? হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'বিভূতিভূষণ ভোজনবিলাসী ছিলেন, কিন্তু কলিকাতা শহরে দুই-একবার একসঙ্গে নিমন্ত্রণে গিয়া দেখিয়াছি, তিনি বচনে যেরূপ আড়ম্বরের সৃষ্টি করিতেন, উদর তাঁহার ততখানি সমর্থন করিত না।' (হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ ব: ১২৮)। গজেন্দ্রকুমার মিত্রের অভিজ্ঞতায় আছে, 'বিভূতিবাবু বড় খেতে ভালবাসতেন - একথা সবাই জানে। ··সেই তথাকথিত পেটুকটির সবচেয়ে লজ্জা ছিল খাওয়াতেই।' সারাদিন না খেয়ে বলা, গলা পর্যন্ত নিমন্ত্রণ খেয়েছেন, ধরা পড়ে বলা, 'ইন ফ্যাক্ট, খাওয়া হয়নি' (গজেন্দ্রকুমার মিত্র, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ ব: ১৩২-৩৩), এই সবই তো কোনো না কোনো রসিকতারই স্মৃতি বয়ে চলে।

হয়তো হৃদরোগ চিকিৎসার সেই একান্তই অনুন্নত পরিস্থিতিতে, নিকট-জনদেরও কোনো একটা কার্যকারণ প্রয়োজন ছিল বিভূতিভূষণের আকস্মিক মৃত্যুকে মেনে নেওয়ার প্রস্তুতিতে। নাকি, বিভূতিভূষণের একান্ত দীনহীন গ্রাম্য শৈশব থেকে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বঙ্গসাহিত্যিকের যাত্রাপথকে, রাজবাড়িতে সাদর নিমন্ত্রণের সাফল্য আর সৌভাগ্যকে একটা বাঁধাধরা ছকে গাঁথতে গেলে, এরকম একটা ধারণা বেশ জুতসই ঠেকে, যে, খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে সে মানুষটা ছিলেন নিতান্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন, অবিবেচক? সত্যি-মিথ্যের ভেদরেখাকে বিভূতিভূষণ এতই

স্বতঃস্ফূর্ত ভেঙে দিতে চাইতেন যে, তাঁর জীবনে সত্যি ঘটনা থেকে মিথ্যে গল্পকে আলাদা করে নেওয়া বড়ো সহজ নয়। এমন স্বতঃস্ফূর্তিও হয়তো বিভূতি-ভূষণের অনুরূপ কোনো যাত্রাপথই কেবল বানাতে পারে।

মৃত্যু যখন ঘটেই যায়, তখন তো আর সে মৃত্যুর কোনো পরোক্ষ এমনকী প্রত্যক্ষ হেতুও সেই মৃত্যুর থেকে বড়ো হয়ে ওঠে না। বিশেষত এমন এক শিল্পীর মৃত্যু, যিনি জীবনের শেষদিন সকালে আচ্ছন্নতার মধ্যে বলেন, 'আজ আর লেখা হলো না' (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ১০১)। যে মৃত্যুতে সমসময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে এসে পড়ে সেই অমোঘ পঙক্তি, 'বাংলা সাহিত্যের নাটমণ্ডপে পথের পাঁচালীর আসর ভাঙ্গিয়া গেল।' (যুগান্তর ৩ নভেম্বর, ১৯৫০)। যিনি অসুস্থ শরীরে অস্বস্তি সত্ত্বেও "কর্ণ-কুন্তী সংবাদ" আবৃত্তি করে শ্রোতাদের মুগ্ধতা নিয়ে (প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত, ১৯৯২ : ১৮২) শেষবারের মতো গৌরীকুঞ্জে ফিরে এসেছিলেন সেই ২৯ অক্টোবর, ১৯৫০-এর রাত্রে, তাঁর জীবন তো সাধারণ আর অসাধারণের টানাপোড়েনে, কোনো সহজ সিদ্ধান্তের স্বস্তি থেকে আমাদের বঞ্চিত করে বারবার।

অসম্পূর্ণ পড়ে থাকে 'অনশ্বর' উপন্যাস, 'কাজল' অথবা 'ইছামতী'র দ্বিতীয় খণ্ডের পরিকল্পনা তো সম্পূর্ণই না-লেখা রইল। দেওয়া হল না শেষ সম্পূর্ণ গল্পটির নাম। আর এত অসম্পূর্ণ কিন্তু সতেরোটি উপন্যাস, সাত-সাতটি দিনলিপি-ভ্রমণকাহিনী, দুশোর কিছু বেশি ছোটোগল্প সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরে। এই সাহিত্যকীর্তির জন্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়েছিলেন তিন দশকেরও কিছু কম সময়। দেবযানের এই আরোহীটির কাছে যদি পৌঁছত, বাড়ির বাইরে তাঁর জীবনের শেষ বিনিময়ের সন্ধ্যাটি নিয়ে এই মতভেদ বা স্মৃতিভেদের বিন্যাস, সম্ভবত তিনি পেতেন আরো সাহিত্যের রসদ, অসম্পূর্ণের তালিকাটি দীর্ঘতর হত। রহস্য করে বলতেও পারতেন, ইন ফ্যাক্ট দুটোই মিথ্যে। অথবা হয়তো তিনি উড়িয়ে দিতেন, চ্যান করুক গে যাক···বাদ দাও দিকি···

১৯৪১-৫০

—

বিশ্বযুদ্ধে মন্বন্তরে সমাজে সংসারে

বিভূতিভূষণের একটি খাতায় লেখা আছে,

Eternal Ascetic of the skies
Counting your rosary of stars
Between your fingers take this earth
Reshape this man, this beast of wars
And with your touch recall the breath
Of the world's wasted manhood, charm
A greater love, a stranger life
From out this world of hate and harm
Beneath the mantle of the sky
Rear up on earth the heaven alone
And change eternal only this life
Into my beaming dream of love.

কবিতাটির নাম "A Prayer", লেখক M. C. Gabriel, এ কবিতা বেরিয়েছিল Illustrated Weekly-র ১ অক্টোবর, ১৯৫০ সংখ্যায়। এসব খবরই মেলে বিভূতিভূষণের ওই খাতায়, যাতে অনেক উদ্ধৃতি লেখা আছে, আছে বিভূতিভূষণের লেখাপড়ার অনেক খবর (অপ্রকাশিত)। এ কবিতা যে বিভূতিভূষণকে স্পর্শ করেছিল, তার মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই। জীবনের শেষ দশকে বিভূতিভূষণ দেশে-বিদেশে আতঙ্ক আর যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বহন করেছেন, দেখেছেন মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে যখন গোপালনগরে হরিপদ ইনস্টিটিউশনে বিজয়োৎসবের ছুটি হয়েছিল, বিভূতিভূষণ ১০ মে ১৯৪৫-এর দিনলিপিতে লিখেছিলেন, 'সকালে স্কুল, গিয়েই ছুটি। ···বিজয়-দিনের ছুটি। কাদের বিজয় দিবস? তিনটি যুদ্ধমান [যুধ্যমান] পাশ্চাত্যশক্তি যুদ্ধে জয়লাভ করেছে—তাতে আমাদের কি? এ যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ নয়। ভারতবাসী যারা এ যুদ্ধে লড়েছিল—ক্রীতদাস যেমন প্রভুর হয়ে লড়ে, তেমনি লড়েছিল পেটের

দায়ে। এ যুদ্ধ আমাদের নয়।' (অ. র. : ২১২)।

আরও আগে তিনের দশকে বিভূতিভূষণ স্পেনের বিদ্রোহ প্রসঙ্গে দিনলিপিতে লিখেছিলেন, 'এদের ideal যে কি তা বুঝি নে। স্পেনে socialist ও communist-রা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গণতন্ত্র স্থাপন করলে, খুব ভাল কথা। ···আবার এল Fascists-এর দল, এরা বিদ্রোহ করচে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে socialist-দের শাসনের বিরুদ্ধে, কিন্তু কি ভীষণ রক্তারক্তি আর নিষ্ঠুরতার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্চে, ভাবলে বর্তমান সভ্যতার ওপরে মানুষের আস্থা থাকে না। দলে দলে যুদ্ধেব বন্দীদের পুড়িয়ে মারচে, বিষাক্ত গ্যাস পর্যন্ত ব্যবহার করচে।' (ঊর্মিমুখর, বি র ৩ : ৫৪৯)। ১৯৫০-এ মৃত্যুর একমাস আগে প্রকাশিত 'A Prayer' কবিতাটিতে পৌঁছতে পৌঁছতে বিভূতিভূষণ দেখেন, যুদ্ধের বিভীষিকা, হিংসার স্বরূপ স্পেনদেশের সঙ্গে তাঁর নিরাপদ দূরত্বের ব্যবধান পেরিয়ে বোমার কলকাতায়, নিষ্প্রদীপের কলকাতায়, দাঙ্গা-দেশভাগের বাংলায় বিভূতিভূষণের দৈনন্দিনের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ায় বারবার।

১৯৪১ সালেব ১ ডিসেম্বব বিভূতিভূষণ সম্ভবত কলকাতার খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশনের চাকরিতে পদত্যাগপত্র দিয়েছিলেন। দিনলিপিতে আছে, 'এখনও চাকরিতে আছি, কিন্তু ১লা জানুয়াবী ১৯৪২ থেকে চাকরি ছেড়ে দেব। সেটা কাগজে কলমে অবিশ্যি, আসলে ছেড়েই দিয়েচি'। (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৪৮৩)। ১৯৪১-এর ১ ডিসেম্বর রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠিতে লিখেছেন বিভূতিভূষণ, 'আজ স্কুলে পদত্যাগপত্র দিয়েছি। তোমাকে বোধ হয় বলেছি, বনগ্রামে মেয়ে-স্কুলে হেডমাস্টারের পদ নেবার জন্য হরিদা বলেছেন আমায়। এদিকে পদ্মপুকুর স্কুলের হেডমাস্টার সুশীল মজুমদার সজনীকে বলে রেখেচেন জানুয়ারী মাস থেকে আমি যেন তাঁদের স্কুলে চাকরি নিই। ···আমাদের হেড-মাস্টার খুব দুঃখিত হয়েচেন আজ আমি নোটিশ দিতে।' (বি. র. ১২ : ৩৭৭-৭৮)। 'অনুবর্ত্তন'-এর গ্রন্থপরিচয়ে আছে, 'বিভূতিভূষণ সম্ভবত ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত একাদিক্রমে খেলাতচন্দ্র ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতার কার্য্য করেন। জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করিবার পর সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুন বিপন্ন হইলে বিভূতিভূষণ কলিকাতা ছাড়িয়া বনগ্রামে চলিয়া আসেন এবং ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত সেখানে শ্বশুরালয়ে অতিবাহিত করেন। তারপর সিঙ্গাপুর পতনের পর কলিকাতা বিপদের সম্মুখীন হইলে তিনি কলিকাতার মেসের বাসা ছাড়িয়া ঘাটশিলায় চলিয়া যান।

খেলাতচন্দ্র স্কুল এবং কলিকাতা-ছাড়িয়া যাইবেন পূর্ব্বেই মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন।' (বি. র. ৭ : ৪৯৮–৯৯)।

এই মনস্থিরের আভাস ১৯৪১ সালের ১৬ অগাস্ট রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে মিলে যায়: 'ভালো করে বিবেচনা করে দেখলাম চাকরি ছাড়া আমার পক্ষে সঙ্গত।...বারাকপুর সস্তার জায়গা এবং কলকাতার নিকটে। ওখানে বসে লিখলে এবং কলকাতায় বইয়ের দোকানে দিলে আমার যা আয় হবে তা বর্তমান আয় অপেক্ষা কম নয়।...রোজ যদি ৩ পাতা লিখি তবে ৩৬০ দিনে (এক বছর) আমি লিখবো ৩×৩৬০=১০৮০ পাতা। ৪ খানা বড় উপন্যাস। সেই জায়গায় বাদ দিয়েও লিখব তিন খানা উপন্যাস—ধরো যদি সব দিন তিন পাতা লিখতে নাও পারি। তাতে ২০০০৲ টাকা থেকে ২৫০০৲ টাকা বইয়ে আয় দাঁড়ায়। তার ওপর যদি আমি কিছু ধানের জমি করি, তবে ঘরের ভাত ঘর থেকেই হোল।...২০০০৲ টাকাও যদি বছবে আয় হয়, তবে বারাকপুবের মাসিক খরচা মাসে মাত্র ২৫৲ টাকা কি ৩০৲ টাকা হিসাবে ৩৬০৲ টাকা বছরে। নুটুকে ৪০৲ টাকা ধবে ৪৮০৲ টাকা। মোট ব্যয় ৩৬০+৪৮০=৮৪০৲ টাকা। অতএব খরচ বাদে বছরে হাতে জমবে ২০০০—৮৪০=১১৬০৲ টাকা। বছরে ১১৬০৲ টাকা বা ধরো ১০০০৲ টাকা জমা সোজা কথা নয়। দশ বছরে দশ হাজার টাকা হাতে জমে যাবে।...আমার বর্তমান আয় বছরে ২৫০০৲ টাকার বেশি নয়। স্বাধীন-ভাবে যদি ওই টাকাই পাই তাতে কলকাতার খরচ লাগবে না অথচ ভালো খাবো ও থাকবো। স্বাধীনভাবে থাকলে লেখার দিকও ভালো হবে।...কি বোকামিই করেচি বছর দুই আগে চাকুরী ছেড়ে না দিয়ে। হাতে আরও অনেক টাকা জমতো। শুধু বারাকপুর কেন, আমরা যে কোন ভালো জায়গায় থাকতে পারি—কলকাতা সহর বাদে; এখানে থাকার বাধা প্রথম তো খরচ বেশি হয়, বড় ভিড় লোকের। সর্বদা আসবে আমাকে বিরক্ত করতে। তাতে ৩ পাতা লিখবার সময় পাবো না। সময় নষ্ট হবে বড়। "টাইম ইজ মানি উইথ মি নাউ" —তাছাড়া নির্জন নিরিবিলি স্থান ভিন্ন একমনে সাহিত্যসৃষ্টি করবার অবকাশ ও সুযোগই বা কোথায়?...আমরা এতে করে বারাকপুর কেন, যে কোন ভালো জায়গায় থাকতে পারি—ঘাটশিলা, মধুপুর, শিমুলতলা, ভাগলপুর এমন কি দারজিলিঙ। তবে কলকাতার কাছে থাকাই সঙ্গত। কারণ এ ব্যবস্থা চলবে না কলকাতার কাছে না থাকলে।...বারাকপুরের ...মাত্র ১।০ আনা যাতায়াত ভাড়া। সকলের চেয়ে এই জন্যে সুবিধে বারাকপুর। তাছাড়া ধানের

জমি বা বাগান অন্য কোথাও থাকলে পাবো না। ···গজেন বলচে—আপনি যেখানে যান, মাসে ৫০, টাকা আপনাকে খরচের জন্য দোকান থেকে দেবো—আপনি বই লিখে তা শোধ করবেন। ও টাকা দেওয়া বাদে যা বেশি পাওনা হবে আপনার, তা বছরের শেষে দেবো।' (কিশলয় ঠাকুর, ১৯৭৮ : ২০২-৩)।

অর্থাৎ জীবনের শেষ দশকের প্রথম বছরে বিভূতিভূষণ প্রথম ভাবতে পারছেন যে, শুধুমাত্র সাহিত্য থেকেই জীবন আর জীবিকার সুরাহা করবেন। আর এই ১৯৪১-এর ১৬ অগাস্ট যখন স্ত্রীকে এই চিঠি লিখেছেন বিভূতিভূষণ, তার ন'দিন আগে বঙ্গসাহিত্যের দুনিয়ায় ঘটে গেছে সেই পরিসমাপ্তি—রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু। সিনেট হলের সামনে থেকে সেদিন বিভূতিভূষণ শেষবারের মতো রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলেন। বিশ্বকবির ওই বিশাল শবযাত্রা কি সাহিত্যিক বিভূতিভূষণকে কোনো আস্থা দিয়েছিল? মনে পড়ে, ১৯৩২ সালে 'পথের পাঁচালী'-'অপরাজিত'-র লেখক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী সুপ্রভা দত্তকে চিঠিতে লিখেছিলেন, '···আমি এমন কি লোক যে তুমি আমার কাছে পত্র লিখ্‌তে অত দ্বিধা বোধ করেচ পাছে আমি বিরক্ত হই? ···আমি কোনো অবস্থাতেই ভুল্‌তে পারিনে যে আমি একজন সামান্য স্কুলমাস্টার। আমাদের দেশে সাহিত্যিক খ্যাতির মূল্য কি? সেদিন কোথায় যেন দেখ্‌লাম বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণের কার্ডের বিজ্ঞাপনে লেখা আছে, "রবীন্দ্রনাথ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী প্রভৃতি দেশপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের দ্বারা পরিকল্পিত"—এর সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। আমাদের দেশে মুড়ি মিছরীর এক দর—International Standard of Values এখানে খাটে না, সাহিত্যিক খ্যাতির মূল্য এখানে কানা-কড়িও না।' (অপ্রকাশিত)।

১৯৪১-এর মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়েছে বিভূতিভূষণের সচিত্র ভ্রমণ দিনলিপি 'অভিযাত্রিক', এপ্রিলে বেরিয়েছে গল্পসংকলন 'বেনীগীর ফুলবাড়ী'। দিনলিপি 'স্মৃতির রেখা', যা বিভূতিভূষণ উৎসর্গ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, তারও প্রথম প্রকাশ ওই ১৯৪১-এর শ্রাবণ মাসে। ১৯৩৮-৩৯ সালে সজনীকান্ত দাস এবং পরিমল গোস্বামী সম্পাদিত 'অলকা' পত্রিকায় বিভূতিভূষণের যে উপন্যাসটি ধারাবাহিক বেরিয়েছিল, সেই 'বিপিনের সংসার'ও ১৯৪১-এই গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেল। আর সেপ্টেম্বর মাসে মহালয়ায় বেরিয়েছে নতুন উপন্যাস 'দুই বাড়ী'। ১৯৪১-এর অগাস্টে কল্যাণীকে যখন স্বাধীন জীবনের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে লিখছেন বিভূতিভূষণ, তখনও তিনি জানতেন না যে, সেই বছরেরই ডিসেম্বর

মাসে কলকাতা থেকে ঘাটশিলায় যেতে হলে, জাপানি বোমার ভয়ে পলায়নরত জনতার ভিড়ের মধ্যে অতিকষ্টে ইন্‌টারক্লাসে একটু জায়গা করে নিতে হবে। ট্রেনের অবস্থা দেখে প্রথমে মনে হবে, ইন্‌টারক্লাসে বুঝি জায়গাই হবে না, সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিটই কাটতে হবে, (উৎকর্ণ, বি. র. ৪ : ৪৮৩)। তখনও জানতেন না বিভূতিভূষণ যে, তাঁরই উপন্যাসে ১৯৪১ সালের নিষ্প্রদীপ কলকাতায় সন্ধ্যায় নিশ্ছিদ্র আঁধার পথে দাঁড়িয়ে শহরের নগণ্য স্কুলের অসহায় শিক্ষককে শুনতে হবে, ব্ল্যাক আউটের কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া নাকি চার টাকা থেকেও আরো বাড়তে পারে; ভাবতে হবে '…হাত পা যেন অবশ হইয়া আসিতেছে…স্ত্রী পুত্র লইয়া এই ব্ল্যাক আউটের ঘুটঘুট অন্ধকারাচ্ছন্ন কলিকাতা শহরে তিনি বোতলের ছিপি আঁটা অবস্থায় বুঝি মারা পড়িলেন! ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া দিনে দিনে যদি অসম্ভব অঙ্কের দিকে ছোটে তবে তাঁর মতো গরীব স্কুল-মাস্টার তো নিরুপায়'। (অনুবর্ত্তন, বি র. ৭ : ১৫৫)।

না, গরিব স্কুলমাস্টার ক্ষেত্রবাবুর ওই ভয়ার্ত নীরব হাহাকার বিভূতিভূষণের নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বোমার আতঙ্কে সন্ত্রস্ত নিষ্প্রদীপ কলকাতা, সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়া কলকাতা বিভূতিভূষণের কলকাতা ছাড়ার প্রত্যক্ষ হেতু নয়। এসব ঘটনা তাঁর শহর আর শহরের জীবিকা ছাড়াকে ত্বরান্বিত করেছিল মাত্র। কিন্তু জীবন-জীবিকার রদবদলের প্রস্তুতি তো ১৯৪১-এর অগাস্ট, কি তার আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছে। 'অনুবর্ত্তন' উপন্যাসের বেশির ভাগ অংশই বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে, স্বগ্রাম বারাকপুরে অথবা তার পাশের গ্রাম চাল্‌কীতে বসে। ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে যে বাড়িটি সইমার কাছ থেকে কিনেছিলেন, এতদিনে বারাকপুর গ্রামের সেই বাড়িতে স্থায়ী সাংসারিক বসবাসের অবকাশ মিলেছে। তার জন্যই বাড়িটির কিছু সংস্কার প্রয়োজন। সেই সংস্কারের সময় বাড়ির মালিক পার্শ্ববর্তী চাল্‌কী গ্রামে বোন জাহ্নবীর বাড়িতে বসে লিখছিলেন 'অনুবর্ত্তন'। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ তারিখে ছোটভাই নুটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিভূতিভূষণ চিঠি লিখছেন, 'বারাকপুরের বাড়ী প্রায় নতুন করেই মেরামত হচ্ছে।…কলকাতায় কাল চিয়াং এসেচেন। জহরলাল নেহরুর বক্তৃতা হবে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। যাবো ভাবচি। কলকাতায় বিশেষ কোনো panic নেই। সাধারণভাবে চলচে। মেয়ে কলেজে শতকরা ৮০ জন মেয়ে নিয়মিত আসচে—একজন অধ্যাপক বললেন। তবে সিঙ্গাপুর পতনের পরে ভারতের অবস্থা ভাল নয়'। (অপ্রকাশিত)।

বাড়ি মেরামতের কাজ শেষ হলে বারাকপুরে ফিরে বিভূতিভূষণ 'অনুবর্ত্তন' শেষ করেন। ১৯৪২ এর ২২ জুলাই গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যর নতুন প্রকাশনা সংস্থা মিত্রালয় থেকে বেরলো 'অনুবর্ত্তন'। এ উপন্যাসের নাম বিভূতিভূষণ দিতে চেয়েছিলেন, 'ক্লার্কওয়েল সাহেবের ইস্কুল'। কিন্তু এবকম নামে নাকি বইয়ের কাটতি না-জমবার আশঙ্কা। বইয়ের ব্যবসা বিভূতিভূষণ বোঝেন না। তাই গজেন্দ্রকুমার মিত্র এবং কৃষ্ণদয়াল বসুর নির্ধারিত নাম 'অনুবর্ত্তন' মেনে নিলেন (গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, ১৯৮৯ : ১৩)। অবশ্য 'অনুবর্ত্তন' পেকাশের সঠিক তারিখ নিয়ে দ্বিমত থাকতেই পারে। কাবণ ১৯৪২-এব ২৯ জুলাই নুটুবিহারীকে বিভূতিভূষণ চিঠিতে লিখছেন, 'আমাব একখানা বই অনুবর্ত্তন নামে ছাপা হইতেছে।' (অপ্রকাশিত)। সেই ২৯ জুলাই বিভূতিভূষণের যাওয়ার কথা যশোহব সাহিত্য সঙ্ঘে সভাপতিত্ব করতে, মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতিদিবসের অনুষ্ঠানে, বরিশাল এক্সপ্রেসে রওনা হবেন। ১৯৪২-এ শাবদীয় লেখালেখিব সূত্রে হদিস মেলে দুটি গল্পেব। সে বছর শারদীয় 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় বেরিযেছিল "মূলো ব্যাডিশ-হর্স র‍্যাডিশ" আব ২৭ অক্টোববের 'দেশ' পত্রিকায় "কবি কুণ্ডু মশায"।

তবে স্বাধীন সাহিত্যিকেব জীবন বুঝি বিভূতিভূষণেব ধাতে নেই। তিনি যেমন ভুলতে পারেন না, তেমনি হয়তো ভুলতে চানও না যে, তিনি একজন স্কুল শিক্ষক। ১৯৪২-এর মার্চ মাসেই মাসিক ৪০ টাকা বেতনে যোগ দিয়েছেন গোপালনগরের হরিপদ ইনস্টিটিউশন স্কুলে (বিশ্বনাথ পাল, ১৯৯৩ : ১৬)। যাঁর নামে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সেই হরিপদ প্রামাণিক মানুষটি ছিলেন বিভূতিভূষণের একান্ত শ্রদ্ধার পাত্র। এ স্কুলের বনিয়াদ তাঁর প্রচেষ্টাতেই তৈরি। স্কুলের প্রধান শিক্ষক তখন নরেন ঘোষ, এম.এ., বি.টি। সহকারী প্রধান শিক্ষক সুধীর মজুমদার। বিভূতিভূষণ সাধারণ গ্র্যাজুয়েট মাত্র, কিন্তু ম্যাট্রিকের প্রশ্নকর্তা, পরীক্ষক, এ-ডি-পি-আই জ্যোতির্ময় লাহিড়ী তাঁর বিশেষ বন্ধু। বনগ্রামের এস-ডি-ও পদাধিকার বলে হরিপদ ইনস্টিটিউশনের সভাপতি। তিনি বিভূতিভূষণের একান্ত ভক্ত। এহেন বিভূতিভূষণকে শিক্ষক হিসেবে পেলে ছাড়ে কে? গজেন্দ্রকুমার মিত্রের কথায়, 'এখানে ছেড়ে দেবার পর আমরা বলেছিলুম "আর ইস্কুলে কাজ নেবেন না, কী দরকার। যথেষ্ট আয় আছে আপনার, এমনি তো খরচ করেন না।" "না না, আরে! পাগল!" বলে গিয়েই গোপালনগরে চাকরি নিলেন। বললেন "কি জানেন, ওঁরা ধরলেন, বসেই বা কী করব। আর —ছেলেগুলোর মধ্যে বেশ কাটে, আমার ভাল লাগে।"' (রুশতী সেন,

১৯৯৩ : ১৮৫)।

স্বাধীন সাহিত্যিক জীবনে বছরে তিনটি করে বড় উপন্যাস লিখবার পরিকল্পনা যে সফল হল না, তার মূলে নিশ্চয় স্কুলের চাকরি নয়। এই সময়, অর্থাৎ ১৯৪২ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল 'মিসমীদের কবচ' (১৯৪২), 'অনুবর্ত্তন' (১৯৪২), 'দেবযান' (১৯৪৪), 'কেদার রাজা' (১৯৪৫), 'হীরামাণিক জ্বলে' (১৯৪৬), 'অথৈ জল' (১৯৪৭) আর 'ইছামতী' (১৯৫০)। লেখা শেষ হয়নি 'অশনি সংকেত', যা ১৯৪৪-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৪৬-এর জানুয়ারি পর্যন্ত 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় বেরিয়েছিল। তারপর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৩-এ লেখা হয়েছিল 'দম্পতি' উপন্যাস। 'অভিযাত্রিক' আর 'স্মৃতির রেখা' ছাড়া বিভূতিভূষণের সবকটি দিনলিপিই এই সময়ে প্রকাশিত। আর লেখা হয়েছিল অজস্র ছোটগল্প, প্রকাশিত হয়েছিল ছোটগল্পের বহু সংকলন, 'নবাগত' (১৯৪৪), 'তালনবমী' (১৯৪৪), 'উপলখণ্ড' (১৯৪৫), 'বিধু-মাস্টার' (১৯৪৫), 'ক্ষণভঙ্গুর' (১৯৪৫), 'অসাধারণ' (১৯৪৬), 'বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৪৭), 'মুখোশ ও মুখশ্রী' (১৯৪৭), 'আচার্য কৃপালনী কলোনি' (১৯৪৮), 'জ্যোতিরিঙ্গণ' (১৯৪৯)। তাছাড়া ছোটদের জন্য মূল 'আরণ্যক' কাটাকুটি করছেন, এমন উল্লেখ ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসের দিনলিপিতে মেলে। 'ছেলেদের আরণ্যক' গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে ১৯৪৬-এ। আর ১৯৪৩ এ প্রকাশিত হয়েছে বিভূতিভূষণের অনুবাদ জান বারোস থেকে,—'টমাস বাটার আত্মজীবনী'। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে শুয়েই যে সংকলনটির জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে অগ্রন্থিত কাহিনীগুলি গুছিয়ে ফেলার নির্দেশ বিভূতিভূষণ কল্যাণীকে দিয়েছিলেন, সেই 'কুশল পাহাড়ী' বিভূতিভূষণের প্রথম মরণোত্তর গল্পসংকলন (ডিসেম্বর ১৯৫০)।

বিভূতিভূষণের জীবনের শেষ দশকে বিভূতিসাহিত্যের মান-পরিমাণে কী পরিবর্তন হল, বা আদৌ কোনো বদল হল কিনা, তার বিশদ বিশ্লেষণের জায়গা নিশ্চয় বিভূতিজীবনী নয়। কিন্তু না মেনে উপায় নেই যে বিভূতি-জীবনের এই শেষ দশক বড় বেশি বিশিষ্ট, বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত প্রাত্যহিকের অনুষঙ্গে, আবার বিভূতিভূষণের সমকালীন ইতিহাসের প্রেক্ষিতেও। দুই দশকেরও বেশি গৃহহীন কাটানোর শেষে যে মানুষ ঘর পেয়েছিলেন ১৯৪০-এর শেষে, সেই ঘরে স্থিতি স্থাপন করতে তিনি সময় নিয়েছিলেন ১৯৪১-এর শেষ কি ১৯৪২-এর সূচনা পর্যন্ত। যেসময়ে বিভূতিভূষণের প্রত্যাবর্তন স্বগ্রাম বারাকপুরে। তাঁর ব্যক্তিজীবনের অনুষঙ্গে এ বুঝি এমনি এক সময়, যখন বিভূতি-

ভূষণ নিজেকে ভাবতে পারেন, বহু লড়াই পেরনো এক সফল সৈনিক। আবার ঠিক সেই সময়েই বিভূতিভূষণের দেশ একের পর এক বিপর্যয়ে দীর্ণ হতে থাকে। হয়তো তাই 'দুই বাড়ী'র ভীরু প্রেমকাহিনীতে যে দশক শুরু হয়েছিল, তাকে বইতে হল 'অনুবর্ত্তন', 'অশনি-সংকেত', একভাবে 'দেবযান'-এরও ভার। ১৯৩৭ থেকে একজন সাহিত্যিক একখানা 'দেবযান' লিখবার কথা ভাবছেন, মাঝেমধ্যে ইতস্তত লিখছেনও। কিন্তু এই উপন্যাস সম্পূর্ণ করবার অবকাশ তিনি পেলেন ১৯৪২-৪৩ জুড়ে; 'অনুবর্ত্তন' লিখবার ঠিক পরে। যে 'অনুবর্ত্তন' বিভূতিভূষণের উপন্যাসগুলির মধ্যে সবথেকে মর্মভেদী দর্শনে অন্ধকারকে প্রত্যক্ষ করেছে।

১৯৪৩ সালের ১ অক্টোবর বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে প্রথম আসছে মন্বন্তরের প্রসঙ্গ, 'কত রাত পর্য্যন্ত ভিখারীর ভিড় – সারারাত বলচে – ফেন দাও! চাল দাও!' (অ. র.: ১৩২)। ১৬ অক্টোবর বিভূতিভূষণ লিখছেন, 'মিঃ লাহিড়ী বাংলার দুর্ভিক্ষের ভীষণ চিত্র আঁকলেন আমার মানস চক্ষুর সামনে ওঁর কলকাতার রাস্তায় ভিক্ষুকদের বর্ণনার মধ্যে। মন খাবাপ হয়ে গেল বড্ড। সব যেন বিস্বাদ লাগচে।' সেইদিনই সকালে বিভূতিভূষণ লিখেছেন 'দেবযান'-এব সেই অধ্যায় – 'যতীনের মার কাছে ম্যালেরিয়া অবস্থায় জ্বর ফিরে আসা পুষ্পকে নিয়ে' (অ. র.: ১৪৮)। ১৮ অক্টোবর বিভূতিভূষণ 'উদ্বোধন' পত্রিকা পড়ছেন, দিনলিপিতে লিখছেন, 'আমাদের বর্তমান মানসিকতা ও শারীরিক প্রকৃতির মধ্যে আমাদের যে সীমাবদ্ধতা সেটা অন্ধকারের ভ্রান্তি মাত্র। এই উপলব্ধিই নিম্নতর প্রকৃতির ধর্ম্ম হইতে আত্মার পরম পদে লইয়া যায়।' (অ. র.: ১৫০)। ২৫ অক্টোবরের ডায়েরিতে আছে, 'হরিপদ দার সঙ্গে গ্রামে ধান হওয়া সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা অনেক হোল। বারিকের সঙ্গে ভাগে যে জমি, তাতে ধান ভাল হয়েচে।' (অ. র.: ১৫২)। কয়েকমাস আগে বিভূতিভূষণকে দেখা গেছে ফণিকাকার বাড়িতে বসে রোয়া ধানের জমি কেনার আলোচনায়। সেটা ১৯৪৩-এর ৩০ জুন। 'মৌচাক' পত্রিকার জন্য "বনে পাহাড়ে" ভ্রমণ-দিনলিপি তখন লেখা হচ্ছে। ১৪ জুলাই বারিক মণ্ডলের সঙ্গে বনগ্রামে গেছেন জমি রেজিস্ট্রি করতে। (অ. র.: ১০৫, ১১৩)। জমির মালিকানার সুবাদে এই বারিক বিভূতিভূষণের প্রজা। বিভূতিসাহিত্যের পাঠকের কাছে তার মূল পরিচিতি "বারিক অপেরা পার্টি" ('মুখোশ ও মুখশ্রী', ১৯৪৭) গল্পটির সূত্রে। ২৭ অক্টোবর ডায়েরিতে বিভূতিভূষণ লেখেন, 'ওয়াভেল সাহেব কাল কলিকাতায়

ছদ্মবেশে বেড়িয়ে ক্ষুধার্ত্ত নরনারীদের দেখেচেন শুনলুম। ওদের করুণ আর্ত্তনাদ কলকাতার বাতাসকে বিষাক্ত করে তুলেচে। কিছু ভাল লাগে না। বাংলার অবস্থা কি করুণ, কি ভীষণ, চোখে না দেখলে তা বোঝানো যাবে না। ঘাটশিলা আসবার সময়ে প্রত্যেক স্টেশনে উলঙ্গ, কঙ্কালসার নরনারীর ভিক্ষার জন্য কাতর প্রার্থনা—এ দৃশ্য আর কতকাল সহ্য করতে হবে? হাহাকারে চারি ধার যে পূর্ণ হয়ে উঠলো। মানুষ মরে পাহাড় হয়ে যাচ্চে।' (অ. র. : ১৫২-৫৩)। অথচ বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে ১৯৪৩-এর এই দুর্বৎসরটি শেষ হয় তখনি, যখন ৩১ ডিসেম্বর তিনি লেখেন, 'এ বৎসর ভ্রমণে কাটলো ভালো। সারাণ্ডা, বামিয়াবুরু, মাঠাবুরু, ভালকি, পুরী—অনেক বেড়ালুম। ভগবানের কৃপায় তাঁকে চিনবার সুযোগ পেলুম তাঁর সৃষ্টির সৌন্দর্য্যের মধ্যে দিয়ে। তাঁর জয় হোক। অর্থ তো লাগেনি বেশি ভ্রমণে। তাঁর দয়ায় যা হয়েচে অর্থব্যয়ে তা হয় না।' (অ. র. : ১৮৬)।

মন্বন্তরের কলকাতাকে কতটুকু দেখেছিলেন বিভূতিভূষণ? সেবছর ভ্রমণ-পাগল মানুষটির যাত্রা শুরু হয়েছিল ২ জানুয়ারি। কল্যাণীকে নিয়ে মোটরে চাইবাসা, রাখা মাইন্‌স পার হয়ে কাপড়গাদি ঘাট, পোট্‌কা, তিরিন্‌, খড়কাই নদীর ধারে কল্যাণীর সঙ্গে বেড়ানো। পরদিন চাইবাসা থেকে লবংটুড়ু। একই দিনে চাইবাসার টাউন হলে সাহিত্য সভায় সভাপতিত্ব। বামিঁয়াবুরু, সৈদ্‌পা চিটিমিটি, জয়ন্তগড়, সেরাইকেলা, চক্রধরপুর, ঝাড়গ্রাম বেড়াতে বেড়াতে কেটে যায় একটি সপ্তাহ, মনে হয়, 'কোথায় ৪১, মির্জাপুর স্ট্রীট্। কোথায় বারাকপুর। আর কোথায় এই পাহাড়ে ঘেরা সিংভূম!' (অ র. : ১৩)। ফেব্রুয়ারিতে আবার বেড়ানো—বহরাগড়া, লোদাশানি, লিপুকোচা। লিপুকোচায় গহন বনের মধ্যে তাঁবুতে বসে ডায়েরি লেখা, বরমকোচার পথে সাঁওতালদের সঙ্গে বিনিময় মনে পড়ে। তরলরিপু গ্রামে ভাঙা চাঁদ ওঠে বন-পাহাড়ের মাথায়, আকাশে রাশি রাশি সন্ধ্যাতারা। ধলভূম অরণ্য, বাঘমুণ্ডী পাহাড়, ডাল্‌মা-মাঠাবুরু, মাঠাবুরুর সবথেকে উঁচু চূড়ো কুকুবুরু, গুর্গাবুরু দেখতে দেখতে বলরামপুর ডাকবাংলোয় পৌঁছনো গেল ১৪ মার্চ। সেখান থেকে পুরুলিয়া, পথে কাঁড়দাবুরুকে ভালো করে দেখবার আকাঙ্ক্ষায় গাড়ি ছেড়ে মহুয়াতলায় গিয়ে বসা। তারপর বেলুংগা, দুবরাজপুর, পলাশকলার মতো বিচিত্র নামের সব গ্রামের আশপাশ দিয়ে আসেন কুদাদা অরণ্যে।

ইতিমধ্যে ১৭ মার্চ রঘুনাথপুরে হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে সভায় যোগ

দিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ, অটোগ্রাফ নিয়েছিল সেখানে প্রচুর গুণগ্রাহী। পরদিন কুদাদা অরণ্যে, কুদাদা পাহাড়ে মুক্তির আনন্দ। তবে প্রকৃতির অবারিত জনবিরল মুক্তিকে বুঝি মুক্তি বলে চেনা যায় না, যদি না মাঝেমধ্যে ডাক দেয় সভাসমিতির জনবহুল বন্ধন। ২০ মার্চ বিভূতিভূষণ ঘাটশিলায় বসে হাতে পেয়েছেন মিত্রালয় থেকে সদ্য প্রকাশিত 'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপি। ২৮ এপ্রিল বারাকপুর থেকে নুটুবিহারীকে চিঠি লিখছেন ধলভূমগড়ে 'অনেকদিন পরে এসে বারাকপুরের শ্যামলতা খুব ভালো লাগচে। ইছামতীর টলটলে জল সত্যিই সুন্দর। রোজ কালবৈশাখীর ঝড় বৃষ্টি চলচে। গরম খুব কম ঘাটশিলার থেকে কম। চারিদিকে কোকিলের ডাক। জিনিসপত্রের মধ্যে চাল—২২৲ টাকা মণ। দুধ ভাল খাঁটি জেলেবাড়ী থেকে দিচ্চে /৬॥০ সের টাকায় অতি সুমিষ্ট দুধ। পটল ৵১০ আনা সের। আলু ৴০।, মাছ ॥৵০ আনা। এক চাউল বাদে অন্যান্য জিনিস খুব আক্রা তা নয়। বকুলফুলের আঘ্রাণ দুপুরের বাতাসে রোজ পাই।' (অপ্রকাশিত)। ১ মে ইউনিভার্সিটি থেকে খাতা নিতে কলকাতায় এলেন বিভূতিভূষণ। দিনলিপিতে লিখছেন, 'ইউনিভার্সিটীতে বল্লে এক ছোকরা ক্লার্ক —আপনার নাম কাটা গিয়েচে। ওপরে দেবীবাবুর কাছ থেকে এক চিঠি আনালুম তার নামে। খুব খাতির করে আব সবাইকে বসিয়ে রেখে আমার কাগজ দিলে'। (অ. র. : ৬৯-৭০)। সেই খাতা দেখা শেষ হতে হতে ৬ জুন, আবার মন দিতে পারলেন তখন 'দেবযান'-এ (অ. র. : ৯০-৯১)। ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রজন্মোৎসবের নিমন্ত্রণ ছিল উত্তরপাড়ায়, একই দিনে হাওড়া সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বের আমন্ত্রণ—প্রথম সভাটি সকালে, পরেরটি বিকালে (নুটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা ২৮. ৪. ৪৩-এর চিঠি, অপ্রকাশিত)। আর ২৯ জুন ঘোর বর্ষার মধ্যে বনগ্রামে মধুসূদন দত্তের স্মৃতিসভায় সভাপতির আমন্ত্রণ রাখতে গেলেন বিভূতিভূষণ (অ. র. : ১০৪)।

জুন মাসের মাঝামাঝি বিভূতিভূষণ স্ত্রী কল্যাণী আর ভাগ্নী উমাকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন পুরীতে। গজেন্দ্রকুমার মিত্র এবং সুমথনাথ ঘোষও ছিলেন সঙ্গে। বিভূতিভূষণের পুরী আসবার সংবাদ পেয়ে স্থানীয় ভদ্রলোকেরা সভার আয়োজন করলেন। ১২ জুন সন্ধ্যায় পুরীর ক্লার্ক হলে সভা হল; সভাপতি ডা. অমিয় চক্রবর্তী সভার প্রধান অতিথি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে বললেন যে তিনি নাকি পুরনো আর নতুনের ভিতরে সেতু রচনা করেছেন। (অ. র. : ৯৩-৯৪)। ১৪ জুন নুটুবিহারীকে পুরী থেকে চিঠি লিখছেন,

'…জগন্নাথের মন্দির ও অন্যান্য মঠ মন্দির দেখা হয়ে গিয়েছে। এখান থেকে বুধবার ভুবনেশ্বর যাবো এবং উদয়গিরি, খণ্ডগিরি ইত্যাদি দেখবো। ১৯শে ভুবনেশ্বর থেকে রওনা হয়ে (পুরী প্যাসেঞ্জারে) হাওড়া পৌঁছবো।' (অপ্রকাশিত)।

২০ জুন বারাকপুর গ্রামে ইন্দু রায়ের বাড়িতে বসে গল্প হয়—বারাকপুর-বাসী সীতানাথ রায়ের প্রতিপত্তির গল্প। ইন্দু রায়ের বাড়িতে এক মজুর ছিল। সে নাকি বাংলা মুলুকের সব জায়গা বেড়িয়েছিল—বাহাদুরপুর পর্যন্ত, গোয়াড়ির ওপারে, 'আর যাতি সাহস হোল না'। বিভূতিভূষণ লেখেন 'বেশ গল্প'। (অ. র. : ৯৯)। আর সেদিনের আড্ডা থেকে "রূপো বাঙাল" আর "সিঁদুরচরণ" গল্পদুটির প্রস্তুতি নিশ্চয় শুরু হয়ে যায়। "সিঁদুরচরণ" 'ক্ষণভঙ্গুর' সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আগে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'গল্পভারতী' পত্রিকার বৈশাখ ১৩৫২ সংখ্যায়, অর্থাৎ ১৯৪৫-এর এপ্রিল-মে মাসে (বি র ১২ : ৪০৯)। "রূপো বাঙাল" গল্পটি অবশ্য 'অসাধারণ' সংকলনে গ্রন্থিত হওয়ার আগে কোথায় প্রথম বেরিয়েছিল, তার হদিস মেলে না।

পরলোকতত্ত্বচর্চা এবং 'দেবযান' লেখা তখন বিভূতিভূষণের প্রাত্যহিক জুড়ে আছে। ৫ জুলাই দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ লেখেন, 'গত বৎসরেও ঈশ্বর, পরলোক, জ্ঞান, মৃত্যুর অসত্যতা প্রভৃতি সন্দেহের বস্তু ছিল—গত জানুয়ারী মাসে ঘাটশিলায় Stainton Moses-এর Spirit teachings পড়ে কমাসের মধ্যে আমার সে অবিশ্বাস চলে গেছে।' (অ. র. : ১০৭)। ঠিক দশদিন পরে বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে যে আকুলতা মিশে থাকে, তা বুঝিয়ে দেয়, মানুষটার পরলোক-বিশ্বাস বুঝি তাঁর ইহলোক-অনুরাগেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। আগেই বলেছি, একই সূত্রে খোঁজা যায় 'দেবযান'-এর যুক্তি, কালিদাস রায়ের সেই জিজ্ঞাসু বিস্ময়, 'জানিনা লিখেছ কেন তুমি "দেবযান"'-এর উত্তর। ১৫ জুলাই ডায়েরিতে বিভূতিভূষণ লিখেছেন, 'সারারাত বর্ষা সকালে নদীর ঘাটে গিয়ে অপূর্ব্ব অনুভূতি। মা লক্ষ্মী মেয়ের মত হয়ে ধানের জমি করিয়ে দিলেন নাকি? বাবার ভাল করবে না মেয়ে? কিন্তু আমি যেন মুক্তাত্মা দেবযান পথের পথিক—তাই যেন আমার সামনে জ্বল জ্বল করচে। কিন্তু মর্ত্যের গাছপালা, ষাঁড়া, বৈঁচি ছেড়ে কোথায় যাবো? চোখে জল আসে ওদের ছেড়ে যাবো ভাবলে। তাই গাইলুম—"যুগে যুগে আমি এ মোহন দুনিয়ার দুঃখীর অশ্রুজল মুছাইয়া যাবো হায়"।' (অ. র. : ১১৪)।

১৬ জুলাই বনগাঁ স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রথমনাথ ঘোষ খবর দিলেন যে ওই স্কুলে বিভূতিভূষণের চাকরি হয়েছে, পরদিনই গিয়ে দেখা করতে হবে। কিন্তু এ চাকরিতে কল্যাণীর মত নেই, মত নেই বারাকপুর গ্রামের প্রতিবেশীদেরও (অ. র. : ১১৫)। অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বিভূতিভূষণের দৈনন্দিন ভরে থাকে শারদীয় লেখালেখির ব্যস্ততায়। ২ অগাস্টের দিনলিপিতে তার উল্লেখ আছে (অ. ব. : ১২০), ১৪ অগাস্ট রাতে শেষ হল "মুক্তি" গল্পটি, হাজরা যুগীর বউকে নিয়ে লেখা (অ. র. : ১২৫)। ২১ অগাস্ট বারাকপুর থেকে কলকাতা হয়ে ঘাটশিলা যাচ্ছিলেন, পথে ট্রেনে এক মুসলমান কাঁদল—তার বাইশ বছরের ছেলে মরে গেছে। তার কান্না দেখে মায়া হয় বিভূতিভূষণের, সান্ত্বনা দেন তাকে। আর কলমে আসতে থাকে আর একটি কাহিনী—"ভিড়"। (অ. র. : ১২৮)। ১ সেপ্টেম্বর থেকে লিখতে শুরু করেন হেলিওডোরাসের গল্প, যার নাম শেষ পর্যন্ত হয়েছিল "স্বপ্ন-বাসুদেব" (অ. র. : ১৩১)। এই কাহিনীটি নিয়ে বিভূতিভূষণের যত্ন আর পরিশ্রমের অন্ত ছিল না। ১৭ সেপ্টেম্বর, বহরাগড়ায় হেডমাস্টারের বাড়িতে গল্পটি যখন পড়া হচ্ছে, তখন তার নাম ছিল "হিন্দু ও গ্রীক" (অ. র. : ১৩৬)। ২০ সেপ্টেম্বর ঘাটশিলায় যখন ডাক্তার সুবোধ বসুর বাড়িতে "ভিড" আর এই গল্পটি পড়া হচ্ছে, গল্পটির উল্লেখ থাকছে হেলিওডোরাসের গল্প বলেই (অ. র. : ১৩৯)। সেবছর "মুক্তি" বেরিয়েছিল শারদীয় 'আনন্দবাজার' পত্রিকায়, "পার্থক্য" 'দেশ' পত্রিকায়, "ভিড" 'শনিবারের চিঠি'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (বি র ৭ : ৫০৭), "বর্শেলের বিড়ম্বনা" 'রূপরেখা' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় (বি. র ৪ : ৪৯২)। সজনীকান্ত দাসের বাড়িতে "ভিড" গল্পটি 'শনিবারের চিঠি'র জন্য নেওয়া হয়েছিল ২৯ সেপ্টেম্বর (অ. র. : ১৪১)। সেই ২৯ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সজনীকান্ত দাসের বাড়িতে হেলিওডোরাসের গল্প আবার পড়া হয়েছিল।

তিন পাতার এই ছোটগল্পটির পিছনে যে কতদিনের পরিশ্রম ছিল, তা 'পথের পাঁচালীর বিভূতিবাবু' বলেছিলেন যোগেন্দ্রনাথ সিন্‌হাকে, '…এই তিন পৃষ্ঠার গল্পটি লিখতে গিয়ে আমাকে ছ'মাস পরিশ্রম করতে হয়েছিল। এই ছ'মাস প্রত্যহই আমাকে ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী যেতে হয়েছিল ঐ যুগের ইতিহাস পড়বার জন্য। উত্তর প্রদেশের এক সহরে এই প্রকার স্মারক আমি দেখেছিলাম। এটা দেখে আমার মনে ভারী সুকুমার অনুভূতি হোল : একটি গ্রীক সৈনিকের সঙ্গে একটি ভারতীয় মহিলার প্রেম, এবং তার স্মৃতিরক্ষায় এরূপ নিষ্ঠা ও

হৃদয়াবেগের প্রকাশ! কাহিনী রচনা তো সহজই ছিল, কিন্তু সেই যুগের লোকেদের নাম কেমন হোত, বাড়ীঘর কেমন ছিল, বাগান ইত্যাদি কি প্রকার হোত, স্ত্রীলোকেদের সাড়ী গয়না এবং তাদের প্রসাধন কেমন ছিল, এইসব বিষয়ের ভালোমত জ্ঞান এই কাহিনী লিখতে আবশ্যক ছিল। এই জন্যই যথাযথ ও নির্ভুলভাবে তা সংগ্রহ করতে আমাকে এতটা পরিশ্রম করতে হয়েছিল। সমসাময়িক পরিস্থিতি, আচার ব্যবহার ও ভাবধারা ফুটিয়ে তোলাই এই সব কাহিনীর প্রাণ। যদি এই সব কাহিনীতে নায়ক নায়িকার আধুনিক নাম দেওয়া হয় অথবা তাদের আধুনিক পরিচ্ছদ পরানো হয় তাহলে সে কাহিনী আস্তাকুঁড়েই ফেলবার যোগ্য হয়ে পড়ে। ভালো গল্প লিখতে হোলে লেখকের এতটা পরিশ্রম করতেই হবে'। (সতীশচন্দ্র ঘোষাল, পৌষ-মাঘ ১৩৭৭ ব : ৩৭৪)।

তবে এত পরিশ্রমের মধ্যে সভাসমিতিও থেমে নেই, বেড়ানোরও বিরাম নেই। ৭ অগাস্ট কলকাতার সেনেট হলে নিখিল ভারত রবীন্দ্রস্মৃতি সংস্থার উদ্যোগে যে সভা হয়, সেখানে স্যার বীরেন মুখোপাধ্যায় সভাপতি হিসেবে লর্ড বিশপের নাম প্রস্তাব করলে, প্রস্তাবের সমর্থনে বলতে ওঠেন বিভূতিভূষণ, বক্তৃতা করেন মঞ্চে। বনগ্রাম স্কুলে 'রবীন্দ্র শ্রাদ্ধ-তিথি'র সভাপতি হতে পারেননি, কলকাতায় আসতে হল বলে (অ. র. : ১২১-২২)। ২৯ অগাস্ট ঘাটশিলা থেকে বেড়াতে গেলেন বরাজুড়ি। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি চাকুলিয়া, নরসিংহগড, বহরাগড়া, দুধকুণ্ডী বাংলো, কেশুরদা বন, সুবর্ণ রেখা নদীর তীরে মোগালিঘাট, আবার রাখা মাইনস, হিডনী ফলস, চাইবাসায় নাকৃটি (অ. র. : ১৩০, ১৩৩-১৩৯ —এসব বেড়ানো যে জীবনে কতবার বেড়িয়েছেন বিভূতিভূষণ, তার হিসেব নেই। যে জায়গা ভালো লাগত, সেখানে বারবার ফিরে ফিরে যাওয়াই বুঝি বিভূতিভূষণের ভ্রমণপিপাসার বৈশিষ্ট্য। প্রিয় জায়গা কখনো পুরনো হত না তাঁর কাছে। ১৯৪৩-এই পরিমল গোস্বামী এবং সুধীর ভট্টাচার্যর সম্পাদনায় 'নূতন পত্র' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কার্তিক, অগ্রহায়ণ এবং পৌষ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দের এই তিনটি সংখ্যাই পত্রিকাটির বেরিয়েছিল, তারপর বন্ধ হয়ে যায়। অগ্রহায়ণ এবং পৌষ সংখ্যায় বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন "বহরাগড়া" ভ্রমণকাহিনী। অসমাপ্ত সেই ভ্রমণকাহিনী আজও অগ্রন্থিত পড়ে আছে।

'নূতন পত্র' বন্ধ হয়ে গেল, কারণ হঠাৎ পুলিসবিভাগ থেকে খবর এল যে, যুদ্ধকালীন নতুন নিয়মে দিল্লির অনুমতি না নিয়ে কোনো কাগজ প্রকাশ করা যাবে না। পরিমল গোস্বামী জানিয়েছেন, আসলে তিন সংখ্যা নয়, চার সংখ্যা

বেরিয়েছিল 'নূতন পত্র', চতুর্থ সংখ্যায় নাকি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভিড়" গল্পটি বেরিয়েছিল। আজ অবশ্য কোনো নথি থেকে এর সত্যাসত্য যাচাই করা অসম্ভব, কারণ 'নূতন পত্র'র চতুর্থ সংখ্যা কোথাও পাওয়া যায়নি। শুধু এইটুকু নথি আছে যে, ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪ তারিখে বিভূতিভূষণ পরিমল গোস্বামীকে চিঠিতে লিখেছিলেন '"ভিড়" গল্পের টাকা মনি অর্ডার করবেন বারাকপুরের ঠিকানায় কিংবা আপনার কাছে রেখে দেবেন গিয়ে নেবো।' (পরিমল গোস্বামী, ১৯৭১ : ১৩৬-৩৭)। তবে কি 'শনিবারের চিঠি'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বেরনোর পরে 'নূতন পত্র'তেও "ভিড়" বেরিয়েছিল? অবশ্য ১৯৪৪-এর মার্চে পরিমল গোস্বামীর সম্পাদনায় 'মহামন্বন্তর' শীর্ষক একটি গল্পসংকলন বেরিয়েছিল, যেখানে ছাপা হয়েছিল "ভিড়" গল্পটি।

১৯৪৩-এর ২২ অক্টোবর বিভূতিভূষণের কাছে এসে পৌঁছল সারাণ্ডা ভ্রমণের আমন্ত্রণ, যোগেন্দ্রনাথ সিন্‌হার চিঠি (অ. র. : ১৫১)। যেদিন বিভূতিভূষণ দিনলিপিতে লিখেছিলেন মন্বন্তরের কথা, মানুষ মরে পাহাড় জমার কথা, সেই ২১ অক্টোবরের পরে দু'সপ্তাহেরও কম ব্যবধানে তিনি বেরিয়ে গেলেন বনভ্রমণে—১৯৪৩-এর ১০ নভেম্বর (অ. র. : ১৫৬)। মাঝের সময়টুকুতে বিভূতিভূষণ পড়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনী, লিখছিলেন 'দেবযান', 'মৌচাকে' পাঠিয়েছিলেন "বনে-পাহাড়ে"।' আর ৯ নভেম্বর চাইবাসায় রবীন্দ্রস্মৃতিভবনের সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন, কালী মিত্র, যোগেন্দ্রনাথ সিন্‌হার বক্তৃতা, ফরেস্ট রেঞ্জার রমণী ঘোষালের কমিক নিয়ে সেই সভা (অ. র. : ১৫৬)। এই সাহিত্যসভায় যুবকেরা বিভূতিভূষণকে প্রশ্ন করেছিল, 'মশাই, আপনি মজুরদের সমস্যা নিয়ে লেখেন না কেন? আজকাল এসবের তো খুব চাহিদা।' বিভূতিভূষণ উত্তরে বলেছিলেন '…মজুর সমস্যা সম্বন্ধে লিখতে ইচ্ছা করলেও লিখতে পারছি না। আমি মজুরদের জীবন ঠিক জানি না। খবরের কাগজে ওদের বিষয়ে দ্রুতবেগে চোখ বুলিয়ে যাওয়া, দর্শক হিসেবে কারখানায় ওদের দেখে আসা অথবা কুলী ধাওড়ায় ঘুরে আসা—এভাবে জানা ওদের যথার্থ জানা নয়। ওদের জানতে হলে ওদের সঙ্গে থাকতে হবে, ওদের ভিতরে প্রবেশ করতে হবে, ওদের চিন্তাধারার স্রোতে নিজেকে বইয়ে দিতে হবে। ওদের সুখ দুঃখে হাসতেও হবে কাঁদতেও হবে। নইলে আমার যা সামর্থ্য আছে, আর শ্রমিক সম্বন্ধে যতটা জ্ঞান আছে, তার সাথে সমুচিত মাত্রায় কল্পনা মিশিয়ে এমন একটি শ্রমিক সাহিত্য রচনা করতে পারি যা পড়ে লোকে বাহবা!

বাহবা! বলে উঠবে। কিন্তু তা লেখকের পক্ষে নিজের বিবেকের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা হবে। কোনও বিবেকবান লেখক পাঠকের চাহিদা পূরণ করবার জন্য সাহিত্য রচনা করতে পারেন না। তিনি তখনই লিখবেন যখন তাঁর মনে সেই ভাবনার উদয় হবে আর ঐ ভাবনার উদ্রেকের জন্য বিষয়টির সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়ের প্রয়োজন মৌলিক। ভাড়া করা সাহিত্যের সুন্দর চেহারা হতে পারে কিন্তু তাতে আত্মার অধিষ্ঠান সম্ভব নয়।' (সতীশচন্দ্র ঘোষাল, আষাঢ়-আশ্বিন ১৩৭৮ ব: ৩৩-৩৪)।

বনের ভিতরে পাহাড়ে ঘেরা কুমৃডি বাংলো। স্বতঃস্ফূর্ত বয়ে চলেছে পাহাড়ি নদী কোইনা। হাজার ফুট উঁচু শশাংদাবুরু বনে ঘেরা। মোটর থেকে চোখে পড়ে হাতি, শোনা যায় বার্কিং ডিয়ারের ডাক। কোইনা নদী পেরিয়ে থলকো-বাদ। সে অরণ্য শজারু, বাইসন, বাঘের পায়ের ছাপে ভরা, সে বনের গুহার গায়ে কে কবে লিখে রেখে গেছে God is here, সে বনের প্রান্তেই জংলি গাঁ তিরিলিপোসি, তারপর মনোহরপুর—সারাণ্ডা শৈলমালা আর ছোট-নাগপুর মালভূমি মিলেছে যেখানে। তারপরে অরণ্য গভীরতর। সারাণ্ডা-কোলাহান-গোড়াহাট-বোনাই সব পাশাপাশি বন। এদিকের সবথেকে উঁচু গিরিচূড়া বুদ্ধবুরু যেতে সাতাশশো ফুট অতি দুর্গম পথ পেরতে হয়। দেখা হয়ে যায় ছোটনাগরা, উম্বরিয়া ঝর্ণা, লুবডানালার উপত্যকা। বরাইবুরু থেকে ডাইনে কারো নদী পেরিয়ে জামদা হয়ে বনের পথে নোয়ামুণ্ডি মাইনস, জগন্নাথপুর গ্রাম, দূরে পিছনে কেওনঝরে অস্পষ্ট দেখা যায় কোলাহান সারাণ্ডার পর্বতমালা। মোটর ধরা হল কেন্দ্‌পাসি স্টেশনে। ঘাটশিলায় ফিরতে ফিরতে নভেম্বর শেষ। (অ. র.: ১৫৬-৭৫)।

কলকাতায় যখন বোমা পড়ল খিদিরপুর এলাকায়, সেই ৫ ডিসেম্বর বিভূতিভূষণ এসেছিলেন কলকাতায়। জর গায়ে ঘাটশিলা ফিরলেন মেল ট্রেন ধরে (অ. র.: ১৭৮)। এই সময় তিনি পড়ছেন 'সদ্‌গুরুসঙ্গ', মে সিনৃক্লেয়ারের 'আনক্যানি স্টোরিজ', নিগমানন্দের ভক্তিযোগ। অ. র.: ১৮১)। ততদিনে-সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় বেরিয়েছে "স্বপ্ন-বাসুদেব" (অ. র.: ১৭৯)। বিভূতি ভূষণ তখন লিখছেন 'দেবযান' উপন্যাসের শেষাংশ। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি বিভূতিভূষণ আছেন কখনো গালুডিতে, বাগালগোড়া কালাঝোড় পাহাড়ের সামনে, কখনো বা ঘাটশিলায় ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে পড়ে শোনাচ্ছেন নিজের একান্ত প্রিয় গল্প—আনাতোল ফ্রাঁসের 'দ্য ওয়েল অভ্‌ সেন্ট ক্লেয়ার' (অ. র.: ১৮১)।

১৯ ডিসেম্বর এলেন ঝাড়গ্রামে (অ. র. : ১৮২)। মন্বন্তরের বছর কি তবে বিভূতিজীবনের শেষ দশকে সবচেয়ে ভ্রমণব্যস্ত বছর ?

২৫ ডিসেম্বর শেষ হল বহুদিনের বহু পরিকল্পনার, সাধনার 'দেবযান'। ১৯৩৭ এর পরে পাঁচ-পাঁচটি বছর ফেলে রেখে যে উপন্যাসে আবার নতুন করে হাত দিয়েছিলেন ১৯৪২ সালের ২৫ মার্চ। (অ. র. : ১৮৪)। ২৮ ডিসেম্বর আবার সে উপন্যাসে যোগ করলেন একটি নতুন অধ্যায় (অ. র. : ১৮৫)। আর ১৯৪৩-এর শেষ দিনটিতে বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে দেখি, 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় নাকি লেখা দিতেই হবে, তাই প্লট খুঁজছেন তিনি (অ. র. : ১৮৬)। এই অন্বেষণ থেকেই কি ১৯৪৪-এ শুরু হবে 'অশনি-সংকেত' উপন্যাস ?

১৯৪৪-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৪৬-এর জানুয়ারি পর্যন্ত 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় 'অশনি-সংকেত' উপন্যাস ধারাবাহিক বেরিয়েছিল। তারপর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়, 'অশনি-সংকেত'-ও শেষ হয় না (বি র ৫ : ৪৮৪)। এই অসম্পূর্ণতার মূলে কি শুধুই 'মাতৃভূমি' পত্রিকার বন্ধ হওয়া, নাকি আরো কোনো কারণ ছিল ? বিভূতিভূষণ কি বুঝেছিলেন, তাঁর 'অশনি-সংকেত' আসলে শেষ হয় না ? শেষ করতে গেলে, তাঁর সাহিত্যে এযাবৎকাল গড়ে তোলা শৃঙ্খলার অনেক নিয়মকে ওলটপালট করে দিতে হয় ? যে টালমাটালের ভিতর দিয়ে যাওয়ার কোনো সাহিত্যিক তাগিদ বিভূতিভূষণ হয়তো তখন বোধ করছিলেন না। ১৯৪৪-এর বিভূতিজীবন মন্বন্তরের ভারে তেমন ক্লিষ্ট ছিল না। সে সময়টায় বরং তাঁর খানিকটা সচ্ছলতার অবকাশ মিলেছে। বাল্যের প্রায় অজ্ঞান বয়স থেকে আকালের ভার কথকবাড়ির বড়ছেলেকে বইতে হয়েছিল। এখন যেন সে জীবনে খানিকটা নিশ্চিতি এসেছে, আর্থিক সামাজিক প্রসাদ এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্ক বিভূতিভূষণ নিজের জীবনে কতটুকু দেখেছিলেন, তা সঠিক জানি না। কিন্তু সন্ত্রস্ত, নিষ্প্রদীপ কলকাতায় নিম্নবিত্ত বাঙালির টালমাটাল দৈনন্দিনের ভিতর দিয়ে, তাদের বাঁচা-মরার তাড়নার ভিতর দিয়ে নিজের সাহিত্যের একটা যাত্রাপথ বানানোর তাগিদ সেদিন বিভূতিভূষণের ছিল। কিন্তু 'অশনি-সংকেত'-এর হাহাকার, অন্নাভাব আর খিদেকে, 'পথের পাঁচালী'-'অপরাজিত'-'দৃষ্টিপ্রদীপ'-'আরণ্যক'-'অনুবর্তন'-'দেবযানে'র স্রষ্টা কি আয়ত্তের মধ্যে পেতে চান, মন্বন্তরের অভিজ্ঞতাকে তেমন প্রত্যক্ষে বহন না করেও ?

১৯৪৪-এর সেপ্টেম্বরে না হয় দিল্লির প্রবাসী বাঙালিদের বঙ্গ সাহিত্য সমিতি সেখানে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মতিথি পালন করবে বলে চিঠি পাঠায়,

না হয় হরিনাভির অ্যাংলো স্যানস্ক্রিট ইনস্টিটিউশন প্রত্যাশা করে, যদি তাদের স্কুলে আশি টাকা মাসমাইনেতে সহ-প্রধানশিক্ষকের কাজ নিয়ে আসতে রাজি হন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং বিভূতিভূষণ তাঁদের প্রত্যাশা পূরণ করেন না (১৯৪৪-এর ৮ সেপ্টেম্বর নুটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি, অপ্রকাশিত), কিন্তু চিরকাল তো এমন দিন ছিল না ! ১৯১০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি বারাকপুর গ্রামের কথকব্রাহ্মণ মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় গোপালনগর ডাকঘরে একটি অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন পঞ্চাশ টাকা দিয়ে। মহানন্দ যখন ১৯১১ সালে মারা যান, তখন সেই অ্যাকাউন্টে ছিল ২ টাকা ঃ আনা ৭ পাই। (অপ্রকাশিত)। মহানন্দর বড ছেলে বিভূতি তখন বনগ্রাম হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। অনাহার, অর্ধাহাব, অনটন আর ছন্নছাড়া জীবনযাপনকে দীর্ঘসময় ধরে বিভূতিভূষণেব প্রাত্যহিক অঙ্গে অঙ্গে বহন করেছে। বাল্য-কৈশোর-যৌবন-জোড়া আকালের সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৯৪৪-এ পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ বিভূতিভূষণ কি ভাবতে চান যে, মন্বন্তব নিয়ে, খিদে নিয়ে সাহিত্য লিখতে তাঁর অন্তত কোনো বাডতি দেখাশোনা, চেনাজানা অথবা যন্ত্রণার প্রয়োজন নেই ? ১৯৪৩-এর অনেক আগে লেখা "সই" কাহিনীটিতে খিদের মরিয়া তাগিদে দুলে-মায়ের যে মর্মান্তিক বিন্যাস বিভূতিভূষণ কবেছিলেন, সেখানে কি তিনি একবারও পৌঁছতে পারেন 'অশনি-সংকেত' উপন্যাসে ? সেখানে তো মতি তার মরণের প্রলাপেও কোনো আহার্যের স্বপ্ন দেখে না , সে বলে হলুদ পাখির ছড়া।

বিভূতিসাহিত্য এবং জীবনকে বিচার করবার মন নিয়ে একথা লেখার নয়। মন্বন্তরের ১৯৪৩ নিঃসন্দেহে তাঁর জীবনের পরম ভ্রমণব্যস্ত বছরগুলির একটি। কিন্তু এই তথ্য থেকে এমন কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো আমার উদ্দেশ্য নয় যে, সামাজিক সচেতনতায় বিভূতিভূষণ ছিলেন একেবারে রিক্ত। তবে কোনোদিনই তিনি সমগ্রের সান্ত্বনা খুঁজবার অভিলাষে নিজের অপরিচিত কোনো জীবন-প্রবাহকে, নিজের নাগালের বাইরের কোনো তত্ত্ব, আদর্শকে সাহিত্যের বিষয় বানাতে চাননি। আর জীবনের শেষ দশকে এমনি হল তাঁর দেশের অবস্থা যে, বিভূতিভূষণের আবাল্য চেনা গ্রামের মেয়েবউকে পেটের খিদেয় জ্বলতে জ্বলতে শহর-কলকাতায় আসতে হল—লড়াই নাকি পেটের খিদের আর শরীরমনের ইমানের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বোমার আতঙ্কে কলকাতাবাসীর ত্রস্ত পলায়ন, যে আত্মবিশ্বাসে বিভূতিভূষণ সাহিত্যে গেঁথেছিলেন, সেই বিশ্বাসের কোনো

ঘাটতি হয়তো তিনি নিজের ভিতরে বোধ করেছিলেন, যখন সময় এল নিরন্ন গ্রামবাসীর নির্বিকল্প কলকাতাযাত্রার কাহিনী লেখার। হয়তো তাই ঠিক সেই সময়টিতে তাঁকে খুঁজতে হল 'দেবযানে'র সান্ত্বনা। হয়তো তাই শেষ হল না 'অশনি-সংকেত' উপন্যাস। যখন 'নূতন পত্রে' "বহরাগড়া" লিখছিলেন বিভূতিভূষণ, অর্থাৎ ১৯৪৩-এর শেষে কি ১৯৪৪-এর শুরুতে পরিমল গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য বিনিময় হয়েছিল। পরিমল গোস্বামী বলেছিলেন, 'আপনি তো মানুষের দুঃখবেদনার কথা লেখেন, আমি একটি অদ্ভুত কাহিনী বলি, শুনুন···একটি ইংরেজী গল্প।···একটি গরিব লোক তার একটি হাঁসকে নানা রকম খেলা শিখিয়েছিল, কিছু উপার্জন হবে উদ্দেশ্যে। কিন্তু যা হত তাতে তার চলত না।। একবার একটি ভ্রাম্যমাণ থিয়েটারের দল তাদের অঞ্চলে এলে ঐ দুঃখী লোকটি তার হাঁসটিকে নিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে বলল, আমাকে যদি আপনাদের দলে একটি চাকরি দেন, তা হলে আপনাদের ইণ্টারভ্যালের সময় আমার এই হাঁসের খেলা দেখিয়ে দর্শকদের খুশি করব।

'ম্যানেজার খেলা দেখে মুগ্ধ হলেন এবং বললেন, তোমাকে নেব, কিন্তু কয়েকটা দিন দেরি হবে। তোমার নাম ঠিকানা লিখে দাও, জানাব।···লোকটি দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে লাগল, খবর আর আসে না। অবশেষে টেলিগ্রাম এলো, অবিলম্বে হাঁস নিয়ে এই ঠিকানায় চলে এসো।

'লোকটি উত্তরে জানাল, "দুঃখিত, বড্ড দেরি করে ফেলেছেন, ইতিমধ্যে অভাবে পড়ে হাঁসটাকে খেয়ে ফেলেছি – SORRY, MUCH TOO LATE. HAD TO EAT DUCK."

'বিভূতিবাবু এ কাহিনী শুনে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। তারপর বেদনার্ত কণ্ঠে যেন আত্মগত ভাবেই বলে উঠলেন – বলেন কি! হাঁসটাকে খেতে হল? Had to eat duck?

'আবার চুপ। আবার ঐ একই প্রশ্ন। হাঁসটাকে খেতে হল?' এই বিনিময়ের বর্ণনা দিয়ে পরিমল গোস্বামী লিখেছেন, 'বিভূতিবাবুকে দুঃখে এমন অভিভূত হতে আগে কখনো দেখি নি।' (পরিমল গোস্বামী, ১৯৬৯ : ২৫৯-৬০)। মানুষের দুঃখ বেদনা বলতে বিভূতিভূষণ যাকে চিনতেন, তার সঙ্গে তবে খিদের জ্বালায় পোষা হাঁস খেয়ে ফেলা মেলে না। এই সূত্রেও কি পড়ে নেওয়া যায় 'অশনি-সংকেত' অসম্পূর্ণ থাকার যুক্তি?

বিভূতিসাহিত্যে গঙ্গাচরণ চক্রবর্তী যখন এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে ঘুরে শেষে

নতুনগাঁয়ে এসে একটু একটু করে গুছিয়ে তুলছে অনঙ্গ আর তার সংসারটাকে, বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' তখন দ্বিতীয় সংস্করণে পৌঁছচ্ছে, 'পথের পাঁচালী' পঞ্চম সংস্করণে। 'ঊর্মিমুখর' নামের দিনলিপিটি ছাপা হচ্ছে। ১৯৪৪-এর ২১ জুলাই নুটুবিহারীকে লেখা যে চিঠিতে এসব কথা আছে, সেখানেই দেখি, '"ছোটদেব পথের পাঁচালী" ইউনিভার্সিটিতে Rapid Reader হিসেবে চাপানো (চালানো ?) হবে বলে একজন publisher জানিয়েছে আমায় ২০০্ টাকা··· দিয়ে। লাভ যা হবে, অর্দ্ধেক তার, অর্দ্ধেক আমার। সেই পাবলিশাবই সেদিন আমায়··· travelling allowance দিয়েচে, বলেচে শুক্রবার আবার আসবেন, শনিবার সেনেটের মিটিং, আমাকে নিয়ে দু-একজন মেম্বরের কাছে যাবেন। যেমন সুনীতিবাবু, কালিদাস নাগ ইত্যাদি'। (অপ্রকাশিত)। সেই জুলাইমাসে বারাকপুর গ্রামে বিভূতিভূষণের জমিতে ধান রোয়ার কাজ শুরু হয়েছে, বাড়িতে বেগুন, লাউ বুনছে বাহাদুব। গোপালনগরের মেছোবাজার থেকে দু'টাকা সেব কন্‌ট্রোলের সন্দেশ বিভূতিভূষণ মাঝেমধ্যে কিনে আনেন।

বইয়ের চাহিদা নাকি অসম্ভব বেড়েছে। 'নবাগত' গল্পসংকলন বেরিয়েছিল জানুয়াবি মাসে, ১০ অগাস্টের চিঠিতে বিভূতিভূষণ নুটুবিহাবীকে লিখছেন যে, 'নবাগত'র এডিশন শেষ হয়ে গেছে। আরো লিখছেন যে 'দেবযান' যে বেরনো-মাত্রই সংস্করণ ফুরোবে, এ নিয়ে তাঁর কোনো সংশয় নেই। বিভূতিভূষণ যে ভুল করেননি, তার প্রমাণ নভেম্বব মাসে নুটুবিহারীকে লেখা চিঠি, 'এখানে ৪০০ কপি "দেবযান" বেঁধে এসেচে— হু হু করে বিক্রী হচ্চে। এক ভদ্রলোক বরিশাল থেকে পুত্রশোক ভুলেচেন "দেবযান" পড়ে—দীর্ঘ পত্র লিখেচেন আমাকে। বইখানি লেখা সার্থক।' ২১ ডিসেম্বর গুটুকের কাছে বিভূতিভূষণ লিখছেন, '৮০০ শত কপি বই বিক্রি হয়ে গিয়েচে। শীঘ্রই ২য় সংস্কবণ প্রেসে যাবে।' (অপ্রকাশিত)। সে বছবের অক্টোবর পর্যন্ত 'পথের পাঁচালী'র ষষ্ঠ সংস্করণ বেরিয়েছে, 'অভিযাত্রিক'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রেসে, 'অপরাজিত'র দ্বিতীয় সংস্করণও বেরনোর মুখে। (বি. র. ১২ : ৩৮৮)। ওই অক্টোবর মাসেই বিভূতি-ভূষণ সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে দিন তিনেকের জন্য শান্তিনিকেতন যাচ্ছেন, ডেকে পাঠিয়েছেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (বি র ১০ : ৩৮৭)। এবছর "একটি ভ্রমণকাহিনী" প্রকাশিত হয়েছে 'দেশ' পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় (বি র ৮ : ৪০৯)।

মে মাসের শেষে পুরী গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ, সঙ্গে গজেন্দ্রকুমার মিত্র এবং সুমথনাথ ঘোষ। ফিরবার পথে উদয়গিরি খণ্ডগিরি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

(নুটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৩০.৫.৪৪ তারিখে লেখা চিঠি, অপ্রকাশিত)। সে বছর ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকীতে হুগলি কলেজের অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন বিভূতিভূষণ (নুটুবিহারীকে লেখা ১০ অগাস্টের চিঠি, অপ্রকাশিত)। আর ২৫ ডিসেম্বর সজনীকান্ত দাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং যদুনাথ সরকারের সঙ্গে বিভূতিভূষণ রওনা হলেন কানপুর। সেখানকার সম্মিলনে মূল সভাপতি যদুনাথ সরকার এবং আধুনিক বঙ্গসাহিত্য-শাখার সভাপতি বিভূতিভূষণ, (গুটুকের কাছে লেখা ২১.১২.৪৪ তারিখের চিঠি, অপ্রকাশিত)। কানপুরে সম্মিলন সেরে বিভূতিভূষণ লখনউ আর এলাহাবাদ বেড়িয়ে ৩ জানুয়ারি ১৯৪৫-এ ফিরেছিলেন। ১৯৪৫-এর ৫ জানুয়ারি নুটুবিহারীকে চিঠিতে এ খবর জানাচ্ছেন। বারাকপুর থেকে ৭ জানুয়ারি শাশুড়ি সাধনা দেবীকেও চিঠিতে লিখছেন, 'কানপুর হইতে লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলাম। সেখান হইতে আগ্রা যাওয়া ঘটে নাই, তবে আসিবার পথে এলাহাবাদ ও মোগলসরাই হইয়া আসি।...লক্ষ্ণৌ শহরটি সুদৃশ্য ও সুন্দর।' (বি র ১০ : ৩৬২-৬৩)।

১৯৪৪-এই সিগনেট প্রেস প্রকাশ করছেন 'আম-আঁটির-ভেঁপু'র সচিত্র সংস্করণ। সে বইয়ের অলংকরণ করতে করতে ডি. জে. কীমার কোম্পানির তরুণ কমার্শিয়াল আর্টিস্ট সত্যজিৎ রায়ের মনে 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে যে আগ্রহ, যে প্রেরণা তৈরি হচ্ছিল, তার হদিস বিভূতিভূষণের কাছে ছিল না। সে আগ্রহের পরিণাম যে বিশ্বজোড়া খ্যাতি এনেছিল, বিভূতিভূষণ তা দেখে যাননি।

১৯৪৪-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত নুটুবিহারী সম্ভবত চাইছেন ধলভূমগড়ের C. P. W. D. হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে দিতে। কারণ গুটুকের কাছে ২১ ডিসেম্বরের চিঠিতে বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন, 'না হয় নুটু যেন প্র্যাকটিস আরম্ভ করে ঘাটশিলায়।' ১৯৪৪-এর শুরু থেকে, অথবা হয়তো আরো আগে থেকেই চাকরি ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা নুটুবিহারীর ছিল। এ বিষয়ে বিভূতিভূষণের সঙ্গে তাঁর পত্রবিনিময়ও হয়ে থাকবে। বিভূতিভূষণের তেমন একটি চিঠিতে দেখি, যে বিভূতিভূষণ তিনের দশকে কলকাতা শহরে বঙ্গশ্রীর আড্ডায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে দেশে ফিরে যাওয়ার কথা ভেবেছিলেন, যিনি ১৯৪১ সালে নিজের স্বাধীন সাহিত্যিক জীবনের পরিকল্পনায় স্বগ্রাম বারাকপুরকেই প্রেয়তম বাসভূমি ভেবেছিলেন, সেই বিভূতিভূষণের মনেই বারাকপুর নিয়ে ক্ষোভ জমছে। অথবা ভাবা যায়, নুটুবিহারীকে তিনি যা লিখছেন, সেটা বিভূতিভূষণের কাণ্ডজ্ঞান

অথবা ধানচালের বোধ থেকেই সহজে আসছে। তেমন বোধ থেকে কোনো ছুটি নেওয়ার ফুরসত তো তাঁর জীবনে বড়ো একটা মেলেনি। তরুণ কবি শিবদাস চক্রবর্তীকে 'দেবযান'-এর লেখক একবার বলেছিলেন, '…বেশ কবিতা লিখতে পার তো। লেখো, লেখো। তোমার বয়সে আমরাও ওরকম লিখতে পারিনি। …তবে কি জান, একটু গল্প লেখারও চেষ্টা করো। তা নইলে টিকে থাকা কঠিন। কবিতা আমাদের দেশে একেবারে পারমার্থিক ব্যাপার কি না।' (শিবদাস চক্রবর্তী, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ ব : ১৫৬)।

৩ এপ্রিল, ১৯৪৪ বিভূতিভূষণ ছোট-ভাইকে একটি চিঠি লিখেছিলেন : 'তুমি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে এখানে আসবে লিখেচ, সে প্রস্তাব আমার ভাল লাগলো না। এ দেশে বেশিদিন ভালো লাগবার কথা নয়। লোক সব মামলাবাজ, অশিক্ষিত—গোপালনগর ও বারাকপুর দুই সমান। আমি ভাবচি এ দিকের কাজ মিটে গেলে আর বেশিদিন এ দেশে থাকবো না। তোমার বৌদিদিকে নিয়ে ঘাটশিলা চলে যাবো। দৃশ্য হিসেবে ও দেশ আমার ঢের ভাল লাগে। তা ছাড়া এ সময়ে ও জায়গা ছেড়ে আসা উচিত নয়ও। নানা কারণে। গোপালনগর চাকুরী আমি নাও করতে পারি। এ জায়গা বেশিদিন ভাল লাগে না। নতুন করে একটা জিনিসের পত্তন করা বডই কঠিন। শেষে এ কূল ও কূল দু কূলই না যায়। এখানে যা দূরে বসে ভাবচো, আসলে তা নয়। কে পয়সা দেবে গোপালনগরে? বারোমাস বিশেষত বর্ষায় ৬ মাস রাস্তার মূর্ত্তি দেখলে আঁৎকে উঠবে। হাঁটা অসম্ভব। সাইকেল তো দূরের কথা।' (অপ্রকাশিত)।

গোপালনগরের স্কুলের চাকরি অবশ্য বিভূতিভূষণ কোনোদিনই ছাড়েননি। কিন্তু তখনকার পঠন-পাঠন পরীক্ষা ইত্যাদিতে তাঁর অনীহা বড় কম ছিল না। খাতা দেখবার সময় প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্ক বিভূতিভূষণের অল্পই থাকত। তাঁর কাছে অরিজিনাল প্রশ্নটির জবাব এবং তার অলটারনেটিভ প্রশ্নটির উত্তর, দুটি লিখলে, দুটিতেই নম্বর পাওয়া যেত। ছাত্ররা যদি বলত, 'স্যার, অ্যানুয়াল পরীক্ষা তো এসে গেল, কোর্সও তো শেষ হয়নি, প্রমোশনের কী হবে', মুচকি হেসে বিভূতিভূষণ জবাব দিতেন, 'মাইনে শোধ করিচিস্ তো, ক্লাশশুদ্ধ প্রমোশন।' আর ফার্স্ট ক্লাসের ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে স্কুল পরিদর্শনে আসা ডি. আই. সাহেবকেও মুগ্ধ করে ওই একই বিভূতিভূষণ পড়িয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের "পূজারিণী" কবিতা—যেমন আবৃত্তি, তেমনি বিশ্লেষণ। টিফিনের ঘণ্টা কখন বেজে গেছে, কারো খেয়ালই ছিল না। (বিশ্বনাথ পাল, ১৯৯৩ : ৮১, ৮৩)। চারের দশকে গোপাল-

নগরে হরিপদ ইনস্টিটিউশনে যাঁরা ছাত্র ছিলেন, তাঁদের কারো কারো স্মৃতিতে আজও আছে, যে বিভূতিভূষণ 'মাঝে মাঝে কয়েকটা শব্দ দিতেন এবং সেই শব্দগুলির সাহায্যে একটি মাত্র বাক্য রচনা করতে বলতেন তা সে বাক্য যত বড়ই হোক্ না কেন? রচনাশৈলীর ও সৌন্দর্যবোধের বিচার করতেন "G" অর্থাৎ "Gold", "S" অর্থাৎ "Silver" আর "B" অর্থাৎ "Brass" মার্কা দিয়ে। ...আমরা সবাই চিন্তা করতাম কী করে আমার বাক্যটি সব শব্দবিন্যাসে অথচ স্বল্প পরিসরে সমৃদ্ধ ও ভাবগ্রাহী হয়ে ওঠে।' (বিশ্বনাথ পাল, ১৯৯৩ : ৮৩)।

১৯৪৫ সালের ২১ অগাস্ট বিভূতিভূষণ ডায়েরিতে লিখেছেন, '...দিন কত এগিয়ে গিয়েচে। এখন সারা ভারত জুড়ে নিমন্ত্রণ পাচ্ছি।... কালিদাসদা বল্লেন, তোমার মত এতবড় সাহিত্যিক ম্যাট্রিকের পরীক্ষক হবে কি? বি.এ.-র জন্যে দরখাস্ত করো।' (অ. র. : ২৩৭)। সেবছর ফেব্রুয়ারি মাসে বিভূতিভূষণ লিখেছেন বিখ্যাত ছোটগল্প "শাবলতলার মাঠ" (অ. র. : ১৯৮)। 'অথৈ জল' উপন্যাসের প্রস্তুতিও চলছে। 'ছেলেদের আরণ্যক' জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স-এর মালিক সুরেশচন্দ্র দাসকে তৈরি করে দিয়ে দেন ১০ এপ্রিল, বই বেরিয়েছিল অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে—অর্থাৎ এই ১৯৪৫-এই। সেই ১০ এপ্রিল কালিকা থিয়েটার্সে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে 'মেঘমল্লার' নৃত্যাভিনয় হল। (অ. র. : ২০৮)। 'দেবযান' নিয়ে উত্তেজনা ১৯৪৪ পেরিয়ে ১৯৪৫-এ এসে পড়েছে। ১১ ফেব্রুয়ারি বিভূতিভূষণ নুটুবিহারীকে চিঠিতে লিখছেন, 'Lady Bose (সার জগদীশের স্ত্রী) "দেবযান" পড়ে দেখা করতে চেয়েছিলেন—কাল সকালে তাঁর ওখানে গিয়েছিলুম।...অনেক কথা বল্লেন। আমার মনে হয় "your writings are greater than Saratchandra".' এমন খবরও আসছে যে 'প্রেমেন (প্রেমেন্দ্র মিত্র) বলছিল যে বিভূতি সেণ্ট হয়ে গিয়েচে, এখন পাঠকদের মুখ চেয়ে আর কিছু করে না, যা খুশী তাই করে।' (অ. র. : ২২৯)।

এদিকে সরস্বতী পুজোতে ধলভূমগড়ে সাহিত্যসভায় সভাপতিত্বের অনুরোধ এসেছে (বি র ১০ : ৩৬২)। কলকাতার স্কুল থেকে চাকরি নেওয়ার অনুরোধ এসেছে। নিউইয়র্ক থেকে চিঠি এসেছে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনকথা জানতে চেয়ে। সমকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী সংবলিত 'এনসাইক্লো-পেডিয়া'য় এ জীবনকথাও তারা যুক্ত করতে চায় (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ৯১)। ১৫ এপ্রিল জয়নগর মজিলপুরের সাহিত্যসভায় গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ (অ. র. : ২০৯)। সেই সভায় দেবকুমার গুপ্ত গর্বভরে বলেছিলেন, 'আমরা

তারাশংকর, মানিককে তৈরী করেছি। তাঁরা এখন সমাজ সংস্কারে শিল্পীর দায়িত্ব স্বীকার করেন। তাঁরা বর্তমান সমস্যার গুরুত্বও যেমন স্বীকার করেন তেমনি তাঁদের সাহিত্যে সমাধানের দিক নির্ণয়ের ইঙ্গিতও দিয়ে থাকেন। আমরা আশা করব বিভূতিবাবুও তাঁর সাহিত্যে শুধু সমস্যাই নয় সমস্যা সমাধানের পথও দেখিয়ে দেবেন।' উত্তরে বিভূতিভূষণ তাঁর অভিভাষণে বললেন, 'সাহিত্যিক ত অঙ্কের মাস্টার নন। তাঁর কাজ বাস্তব সমস্যাকে তীব্র, মর্মস্পর্শী করে ফুটিয়ে তোলা। সেই সৃষ্টির আবেদন এমন হবে যে, পাঠক সচেতন হয়ে উঠবে এবং সমাধানের পথ খুঁজে বার করবার চেষ্টায় তৎপর হবে। খাঁটি সাহিত্যের ধর্ম অপরের মনে রেখাপাত করা। সমাধানের ধারাবাঁধা ফর্মুলা শিল্পীর হাতে আছে বলে আমার ধারণা নেই। যাঁদের আছে তাঁরা করুন না।' (গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, ১৯৮৯ : ২২)।

তবে বিভূতিভূষণকে যে কেবল সাহিত্যসভায় দেখা যায়, তা নয়। ১৯৪৫-এর ২৯ এপ্রিল যশোর জেলা শিক্ষক সমিতির অধিবেশনে তিনি আছেন। সেইদিনই বনগাঁয় লিচুতলার পথে প্রফুল্ল ঘোষের আটচালায় হিন্দুসভার মিটিঙে স্বামী নিখিলানন্দ এসেছেন দেবমন্দির করতে। সেই সভাতেও বিভূতিভূষণ অনুপস্থিত নন। (অ. র. : ২০৯-১০)। বহুদিন পরে গোনা যাত্রার আসর শোনার বাসনাও তাঁকে ছেড়ে যায়নি—১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারিতে গোপালনগরে তেমন এক আসরেও বিভূতিভূষণ ছিলেন শ্রোতাদের মধ্যে। (অ. র. : ২০১)। সঙ্গে পড়াশুনাও চলে, কখনো দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', আবার Alexander Dumas-র *Twenty Years After*, Balzac-এর *Droll Stories*। পাশাপাশি Julian Huxley-র *God is Universe*, জলধর সেনের 'হিমালয়', এমনকী অনেকদিন পরে আর একবার রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি'। বিভূতিভূষণের প্রথম গল্পসংকলন 'মেঘমল্লার'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ বেরল ৯ মে, লেখাপড়া হল 'বিচিত্র জগৎ'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের (অ. র. : ২১২ ।

১৯৪৫-এ বিভূতিভূষণের বেড়ানোর শুরু ২৭ মে। আবার পুরী। ৩১ মে পুরীর রাজবাড়িতে মহারাজ শ্রীশ নন্দীর সংবর্ধনা সভায় যোগ দিলেন, কল্যাণী ছিলেন সঙ্গে। ৩০ মে পুরীর অন্নপূর্ণা থিয়েটারে 'রাবণ' প্লে দেখা হল। ৩ জুন পুরী লাইব্রেরিতে দেখলেন 'মন্থরা' প্লে। ২ জুন সন্ধ্যায় পুরীর রাজেন্দ্র-মন্দিরে এক সভায় বিভূতিভূষণের বক্তৃতা ছিল। (অ. র. : ২১৭-১৮)। ৬ জুন খুটুবিহারীকে চিঠিতে লিখছেন 'কাল কোনারক থেকে রাত একটার সময় ঘুরে

এলুম। ...বিশাল সূর্য্যমন্দির সূর্য্যদেবের...এক বিরাট রথ। তেজস্বী সাতটি পাথরের ঘোড়াতে রথ টানছে। বিশাল মন্দির ধূ ধূ বালির সমুদ্রে একা দাঁড়িয়ে আছে নির্জ্জনে। মন্দিরের ওপরে উঠে তোমার বৌদিদি ও আমি ছাদের কার্নিসে শুয়ে বিশ্রাম করলাম। হু হু হাওয়া। অদূরে নীল সমুদ্র বালিয়াড়ির ওপারে। এখানে মরীচিকা দেখা যায় বালির চরে, হরিণের দল ঘুরে বেড়ায়।' (অপ্রকাশিত)। ভুবনেশ্বর উদয়গিরি খণ্ডগিরি এ যাত্রায় আবার দেখা হল। পুরী থেকে ফিরে বিভূতিভূষণ পশ্চিমের বিভিন্ন জায়গা থেকে চিঠি পান – মোগলসরাই, দেরাদুন, দিল্লি। কাগজে সবাই দেখেছেন, বিভূতিভূষণের পুরী যাওয়ার খবর. জানতে চান, পশ্চিমে কেন আসবেন না তিনি (নুটুবিহারীকে লেখা ২৭.৬ ৪৫-এর চিঠি. অপ্রকাশিত)। সে বছর পুজোর ছুটিতে বিভূতিভূষণ গিয়েছিলেন কাশী. আগ্রা, দিল্লি, হরিদ্বার, লছমনঝোলা, হৃষীকেশ. দেরাদুন, মসৌরি। ১৭ অক্টোবর যাত্রা শুরু। কল্যাণী জানতেন, যাওয়া হচ্ছে সালানপুর. কাশীতে গাড়ি ঢুকবার মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের মিথ্যারসিকতায় বিভূতিভূষণ অটুট রইলেন (অ. র. : ২৫১-৫৫)। ৩ নভেম্বর ফিরেছিলেন ঘাটশিলায়। ২৪ অক্টোবর ঘাটশিলায় নুটুবিহারীকে কুতবমিনার থেকে আপ্লুত বিভূতিভূষণ চিঠিতে লিখছেন, 'এইমাত্র তোমার বৌদিদি ও আমি কুতবমিনার থেকে নামলুম। এখনও হাঁপাচ্চি। পরশু আগ্রা থেকে এসেছি। জ্যোৎস্নায় তাজমহল কি অপূর্ব্ব। তোমার বৌদিদি কেঁদে ফেললে। কুতবমিনার ডাকঘরের ছাপ দেখো উল্টোপিঠে।' (বি র শ ১ : ৪৯১)। ৩১ অক্টোবর নুটুবিহারীকে লিখছেন, 'দেরাদুন হয়ে মুসৌরী এসেছি। অপূর্ব্ব রাস্তা দেরাদুন থেকে মুসৌরী, ৬০০০ ফুট হিমালয় পর্ব্বতের ওপর ঘুরে ঘুরে মোটরবাস উঠলো।' (অপ্রকাশিত)।

সেবছর বিভূতিভূষণের জন্মদিনে ঘটা হয়েছিল খুব। ২৯শে ভাদ্র বনগ্রামের তরুণ সঙ্ঘের সেই অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার মেয়র দেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, নলিনাক্ষ সান্যাল, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছিলেন, সভায় তা পড়া হল। প্রবোধ সান্যালসহ কলকাতার অনেক সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন সেদিনের সভায়। কার্যকরী সভার সম্পাদিকা অন্নপূর্ণা গোস্বামী। সভার নিমন্ত্রণ জানাতে তিনি যখন বিভূতিভূষণের বারাকপুরের বাড়িতে গিয়েছিলেন, বিভূতিভূষণ তাঁকে একটি বিদেশী পত্রিকা দেন, বলেন, 'এতে আনাতোল ফ্রাঁসের একটা গল্প আছে পড়বেন। আমি প্রথম জীবনে কত যে ইংরেজী সাহিত্য পড়েছি তার হিসাব

নেই।' (অন্নপূর্ণা গোস্বামী, ১৩৫৭ ব : ২৭২)। অনুষ্ঠানের দিনে বনগ্রাম স্কুল হলে পা রাখবার জায়গা ছিল না, যত লোক ভিতরে, তত লোক বাইরে। ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫-এর চিঠিতে খুটুবিহারীকে এই সভার বর্ণনা দিতে দিতে বিভূতিভূষণ লিখেছেন, তাঁদের ছোটমামা বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় হঠাৎ সেই সভায় এসে পড়েছিলেন। বসন্তকুমার সেদিন মঞ্চে দাঁড়িয়ে সাশ্রুনয়নে যে কবিতাটি বলেছিলেন তা হল :

হে বিভূতি, ভারত সাহিত্যক্ষেত্রে গৌরীশৃঙ্গ তুমি
যশোদীপ্ত শির তব উঠিয়াছে অভ্রদেশ চুমি।
পথের পাঁচালি রীতি আরণ্যক মুখে শুনি গর্বভরা প্রাণে
ভারত কোবিদবৃন্দ চেয়ে আছে আজি তব মুখ পানে
মল্লারে অনুবর্তনে আর দেবযানের নবীন প্রবাহে
গর্বভরা প্রাণে আজি মহানন্দ গীতি জনে জনে গাহে
আশীর্বাদ করি তোমা হে বৎস বিভূতিভূষণ
প্রতিভায় অপরাজিত হও তুমি ভারত ভূষণ।

বিভূতিভূষণ ছোটভাইকে লেখেন, 'কৌশলে এর মধ্যে বাবার নাম ও তোমার প্রথম পক্ষের বৌদির নাম ঢুকিয়ে দেওয়া আছে।'

কবিশেখর কালিদাস রায় যে কবিতাটি সেদিনেব সভায় পাঠিয়েছিলেন, তার শেষ পংক্তি হল, 'দাদা বলে ডাকো মোরে সেই মোর পরম গৌরব।' বসন্তকুমারের হাতে ভাটপাড়ার শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ একটি সংস্কৃত শ্লোক পাঠিয়েছিলেন। (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ৪৫-৪৬)। মাস দুয়েক আগে যখন ৮ জুলাই নৈহাটিতে বঙ্কিম জন্মোৎসবে গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছিলেন উপাধি দেবেন বলে। (অ. র. : ২২৫) ১৬ জুলাই খুটুবিহারীকে লেখা বিভূতিভূষণের চিঠিতে আছে, 'ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরা আমায় একটা অভিনন্দন দিচ্চে—সেদিন সভাস্থলে শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ বল্লেন। সজনীকেও ওঁরা সে উপলক্ষে আসতে বলেচে। একটা সংস্কৃত শ্লোক লিখেচেন ওঁরা আমার নামে—ছোটমামাকে গিয়ে শুনিয়ে এসেচেন। তাতে কৌশলে পথের পাঁচালী থেকে দেবযান পর্যন্ত সব বইয়ের উল্লেখ করা হয়েচে।' (অপ্রকাশিত)। এই শ্লোকটিই কি ১৩৫২ বঙ্গাব্দের ২৯শে ভাদ্র বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মারফত বিভূতিভূষণের হাতে এল? মাঝখানে কোনো আলাদা অভিনন্দনসভা হয়েছিল বলে দিনলিপিতে অথবা চিঠিতে উল্লেখ মেলে না।

১৯৪৫-এর ৭ অক্টোবর ক্যানিং টাউন মাৎলায় বিভূতিভূষণের জন্মদিন উৎসব হওয়ার কথা ছিল, সভানেত্রী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। (হুটুবিহারীকে লেখা ২৭.৯.৪৫-এর চিঠি, অপ্রকাশিত)। 'পথের পাঁচালী' গুজরাতিতে অনুবাদ হয়েছে (হুটুবিহারীকে লেখা ২৫.৬.৪৫-এর চিঠি, অপ্রকাশিত)। বেরিয়েছে 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ। খ্যাতির বিড়ম্বনা বিভূতিভূষণে বর্তেছে। তাঁর ছোটমামিমার পরিচিতি এক মহিলা সভানেত্রী হবেন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অভ্যর্থনা কমিটির; তাঁর বক্তৃতাটি নাকি বিভূতিভূষণকে লিখে দিতে হবে। লিখে দিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। সেবছর পুজোর লেখায় তাগাদাও ছিল খুব বেশি। (হুটুবিহারীকে লেখা ৪.৯.৪৫-এর চিঠি, অপ্রকাশিত)। শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় সেবছর "মাকাললতার কাহিনী" গল্পটি ছাপা হয়। দিনলিপিতে আছে, ২৪ সেপ্টেম্বর, সজনীকান্ত দাসের বাড়িতে সুরেন মজুমদার ওই গল্পটি জোর করে নিলেন (অ. র.: ২৪৫)। "পিদিমের নীচে", "দুইদিন" এবং "অসাধারণ" যথাক্রমে শারদীয় 'দৈনিক কৃষক', 'বর্ষশ্রী' পূজা-বার্ষিকী এবং 'সোনার বাংলা' আশ্বিন সংখ্যায় ছাপা হয়। "ভূত" কাহিনীটি বেরিয়েছিল 'সপ্তডিঙা' পূজাবার্ষিকীতে। (বি. র. ৭: ৫১২)। 'গল্পভারতী'র বৈশাখ সংখ্যায় যে "সিঁদুরচরণ" প্রকাশিত হয় সেকথা আগেই বলেছি। ১৯৪৫-এ 'দেশ' পত্রিকার বৈশাখ আর শ্রাবণ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল যথাক্রমে "একটি কোঠাবাড়ীর ইতিহাস" আর "হাট" (বি. র. ১২: ৪০৯)। 'আচার্য কৃপালনী কলোনি' (যার পরবর্তী নাম 'নীলগঞ্জের ফালমান্ সাহেব') সংকলনের "মড়িঘাটের মেলা" গল্পটিও ১৯৪৫-এই সম্ভবত লেখা হয়েছিল। লেখা যদি নাও হয় সেবছরে, কাহিনীর প্রস্তুতি যে বিভূতিভূষণের মনে ১৯৪৫-এর শুরুতেই আরম্ভ হয়ে গেছে, তার প্রমাণ জানুয়ারির শেষে হুটুবিহারীকে লেখা চিঠিটি: 'কাল রাত্রি ১১টার সময় মাঘপূর্ণিমা উপলক্ষে মড়িঘাটা হইতে গঙ্গাস্নান করিয়া নৌকা করিয়া ফিরিয়াছি। ...মোল্লাহাটের ঘাট থেকে ...২ ঘণ্টা হেঁটে বড় সুন্দর। দুধারে উঁচু পাড়, খাবরাপোতা, পাঁচপোতা, অম্বরপুরের ঘাট, মেয়েরা নাইচে।...মড়িঘাটা পৌঁছে এপারে এক বৈষ্ণব সাধুর আশ্রমে ওঠা গেল... ওপারে মেলা বসেচে—তেলে ভাজা, পাঁপরভাজা, কদমা, মুড়কি, পুতুল প্রভৃতির দোকান। লোকে রান্না করে খাচ্চে গাছতলায়। সন্ধ্যার সময় পূর্ণচন্দ্র যখন উঠলো, তখন নৌকা ছাড়া গেল।' (অপ্রকাশিত)।

৫ অক্টোবর বনফুলের আমন্ত্রণে ভাগলপুর কলেজের সাহিত্য সম্মিলনীতে

সভাপতি হয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। আঠারো বছর পরে ভাগলপুরে এসে দেখেন, যে ঘরে বসে 'পথের পাঁচালী' লিখেছিলেন, বিহারের গত ভূমিকম্পে সে ঘর ভেঙে গেছে। (অ. র. : ২৪৮)। নভেম্বর মাস থেকেই দক্ষিণ শ্রীপুর, টাকী, কোচবিহার, রংপুর, এরকম নানান জায়গা থেকে আসছিল বড়দিনের সময়কার বিভিন্ন সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্বের আমন্ত্রণ। কিন্তু বিভূতিভূষণ ২২ ডিসেম্বর কলকাতা থেকে দিল্লি এক্সপ্রেস ধরে রওনা হবেন মীরাটে। মীরাটের প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ লেখায় মন দিয়েছেন ২৯ নভেম্বর থেকেই। (অ. র. : ২৫৮, নুটুবিহারীকে লেখা ১.১২.৪৫-এর চিঠি, অপ্রকাশিত)। তাই যাওয়া হবে না আর কোথাও, এবার যেমন রাখতে পারেননি বছরের প্রথমভাগে ঝাড়গ্রামের মুন্সেফ সমরেন্দ্র বাগচীর রবীন্দ্র জন্মোৎসবের নিমন্ত্রণ (নুটুবিহারীকে লেখা ১২.৫.৪৫-এর চিঠি, অপ্রকাশিত)। এমন একটি বছরের মাঝামাঝি এসে বিভূতিভূষণের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তাঁর দিন অনেক এগিয়ে গেছে। ভারত জুড়ে আজ তাঁর নিমন্ত্রণ, খোদ নিউ ইয়র্ক থেকে জানতে চায় তাঁর জীবনের কথা। অথচ জন্মদিনের এত উৎসবের মধ্যেও বিভূতিভূষণের সঠিক জন্মতারিখটি তখনও কোনো উদ্যোক্তার জানা নেই। তখনও বিভূতিভূষণ বারাকপুর গ্রামে বসে ছোটভাইকে ঘাটশিলায় চিঠি লেখেন, ১৯৪৫ সালের ১৯ নভেম্বর তারিখে, 'এখানে বেগুনের সের ⌊৫, ⌊১০ পয়সা, অন্যান্য তরিতরকারীর দাম তত সস্তা নয়। মাছ ভীষণ আক্রা। পাওয়া যায় না। দুধ গ্রামে অমিল। মাঘ ফাগুন মাসে দুধ হয় কারণ তখন গরুর বাছুর হয়। নিজেদের গরু না থাকলে দেখচি গরুর দুধ খাওয়া হয় না আজকাল।' ঠিক তার পরের চিঠিতেই লিখছেন, 'এখানে বেগুন এক পয়সা সের হয়েচে বটে কিন্তু মাছ ২, ২॥• টাকা, মাংসও তাই। ফুচু (প্রতিবেশী নগেনখুড়োর ছেলে) সর্ব্বদাই ঘাটশিলায় যাবো, ঘাটশিলায় যাবো বলচে। মানে ওদের বাড়ির খাওয়াদাওয়া ভালো—এই হোল আসল কথা।' (নুটুবিহারীকে লেখা ১.১২.৫৫-এর চিঠি, ডাকমোহর ১.১২ তারিখের, চিঠিটি ২৭.১১-তে লেখা হয়েছিল, অপ্রকাশিত)।

এই একই বিভূতিভূষণ মীরাট অধিবেশনের অভিভাষণে বলেছিলেন, 'বৈদেশিক সাহিত্যেও আদর্শস্থানীয় মননপ্রধান উপন্যাসের সংখ্যা হাতে গুণে ঠিক করা যায়। গত মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপীয় সাহিত্যক্ষেত্রে ফরাসী লেখক ও সমালোচক জুলিয়ান বেন্দা এই মননপ্রধান কথাশিল্পের ক্ষেত্র তৈরী করেন,

তাঁর আন্দোলনকে তখন অনেকে সাময়িক হুজুগ বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আজ এই শ্রেণীর উপন্যাস ইউরোপীয় সাহিত্যে ক্রমশঃ দেখা দিতে শুরু করেচে। যদিও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, নামজাদা ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে প্রায় সকলেই সাবেকপন্থী। ওদেশের পাঠকমনেরও গ্রহীষ্ণুতার প্রসারতা যে আমাদের দেশের চেয়ে বেশী নয়, বৃটিশ সাহিত্যের দরবারে জেমস জয়েসের মত খাঁটি মননপ্রধান লেখকের অভ্যর্থনা লক্ষ্য করলেই সেটি অনুমিত হয়।' (বি র ১২ : ৩৬৮-৬৯)। এই আত্মবিশ্বাসে যিনি নিজের জানাশোনাকে প্রকাশ করতে পারেন, তাঁকেই তো দিনলিপিতে দেখি সমকালীন ইতিহাসের জটিলতার মুখোমুখি ঈশ্বরের উপর নির্বিকল্প নির্ভর করতে। ১৯৪৫-এর ১৬ অগাস্ট বিভূতি-ভূষণের ডায়েরিতে লেখা হয়, 'জাপান আত্মসমর্পণ করেচে। ভগবান তাঁর বিশ্বে শান্তি এনে দিন।' (অ. র. : ২৩৫)। ২৭ অগাস্ট সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদে তাঁরই চোখে জল আসে, ভাবেন 'বাঙ্গালার সুভাষচন্দ্র বাঙ্গালীর সুভাষচন্দ্র' (অ. র. : ২৩৮)।

এইসব নিয়েই বিভূতিভূষণ, ১৯৪৫-এ বাংলার সাহিত্যজগতে অগ্রগণ্যদের অন্যতম একজন। বছরের শেষে, যেদিন মীরাট সাহিত্য অধিবেশনের অভিভাষণ লিখতে শুরু করছেন, তার ঠিক আগের দিন ডায়েরিতে তিনি লেখেন, 'মানুষ ভগবানের সমান হতে পারে জ্ঞানে। সে-জ্ঞান এক জীবনেই লাভ হতে পারে। কিন্তু ভক্ত তা চায় না। সে বলে, একটা অত বড় ভরসা মানুষের, তিনি আছেন। ···ভগবান গেলে থাকবো কাকে নিয়ে? ভগবান বোধহয় মানুষ নিয়ে থাকেন। তিনি চান বিশ্ব। আমরা না হলে তাঁর চলে না।' (অ. র. : ২৫৭-৫৮)। আর বছরের শুরুতে যে চিঠিতে বিভূতিভূষণ ছোটভাইকে মড়িঘাটার মেলার কথা লিখেছিলেন, সেই একই চিঠির শেষে ছিল, 'তুমি কাত্যায়নী বুক স্টলের ঠিকানায় উমেশ সোমের নামে (উমেশচন্দ্র সোম) একখানা চিঠি দিও, যে মায়ের নামের উৎসর্গপত্র "অপরাজিত"-এ নেই কেন এ সংস্করণে? বেশ কড়া চিঠি দিও একখানা।'

দাঙ্গা দেশভাগ স্বাধীনতা

১৯৪৬ বিভূতিভূষণের দেশে এক বিপর্যয়ের বছর। বিভূতিভূষণের সমাজ-রাজ-নীতি-মনস্কতার ঘাটতি নিয়ে যাঁরা বহুদিন ধরে বিরক্ত, তাঁদের বিরাগভঞ্জনের উপযুক্ত কোনো ঘটনা বিভূতিভূষণের জীবনে কিংবা সাহিত্যে ওই দাঙ্গার

বছরটিতে ঘটেনি। ১৯৪৬-এর ২ সেপ্টেম্বর বিভূতিভূষণ নুটুবিহারীকে লিখছেন, 'এবার পয়সাকড়ির অবস্থা ভালো না। কলকাতার ব্যাপারে খুবই ক্ষতি হোল। যতগুলো কাগজ বেরুচ্ছিল পুজোয় বার্ষিকী—তার অর্ধেকও বেরোবে না। সুতরাং গল্প লিখে যে টাকাটা পুজোর সময় পাওয়া যেতো—তা পাওয়া যাবে না। হাত একেবারে খালি। এরকম দুর্ব্বৎসর কখনো দেখিনি।'

ইছামতীর তীর থেকে কলকাতার বইপাড়ায় পৌঁছানোর পথটা তবে এতই কঠিন ছিল যে, সাম্প্রদায়িক সংঘাত নিয়ে কোনো নৈর্ব্যক্তিক চিন্তাভাবনাও বুঝি বিলাসই মনে হত! আর বিভূতিভূষণ তো একভাবে সেই জীবনপ্রবাহে অভ্যস্ত ছিলেন, যেখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কথাটির কোনো আলাদা আলগা মানে খুঁজতে হত না। "আহ্বান" গল্পের সেই মুসলমান বৃদ্ধার কবরে মাটি দিতে বিভূতিজীবন অথবা বিভূতিসাহিত্য দাঙ্গার জন্য অপেক্ষা করেনি। ইচু মণ্ডলের গল্প "ফকির"ও ১৯৪৬-এর দু'বছর আগেই লেখা হয়ে গেছে। অথচ এটাও ঠিক যে 'অভিযাত্রিক'-এর লিপিকার ১৯৪৬-এর অনেক অনেক আগে বাংলার গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে ভেবেছিলেন, '...মুসলমান ও কাওরালী পাড়ার অবস্থা দেখে চোখ জুড়ুলো।...সর্বত্রই দেখেচি, সমান অবস্থা—ভদ্রলোকদের পতন, মুসলমান ও অনুন্নত জাতির অভ্যুদয়। ভদ্রলোকের পাড়ায় ভগ্ন অট্টালিকা, মজাপুকুর, ভগ্ন দেবালয়, ঘন বনজঙ্গল—আর চাষাপাড়ায় ক্ষেতভরা তরিতরকারি, গোয়ালভরা গোরু, ধানের মরাই, ছাগল, ভেড়া, হাঁস ইত্যাদি গৃহপালিত পশুপক্ষীর পাল। ...ভদ্রলোকদের মধ্যে সাধারণত যারা শিক্ষিত ও উপার্জনক্ষম, তারা থাকে বিদেশে শহরে, আর ঝড়তি-পড়তি মাল যেগুলি, তারা নিরুপায় অবস্থায় পড়ে থাকে গ্রামে...এইসব ভদ্রবংশের লোকের না আছে খাটবার ক্ষমতা, না আছে উদ্যম উৎসাহ কোনো কাজে।...পল্লীগ্রামের ভবিষ্যৎ ভেবে হতাশ হয়েচি। আর পঞ্চাশ বছর এইভাবে চললে, গ্রাম থেকে উচ্চবর্ণের হিন্দু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—এখনই যেতে শুরু করেচে।' (বি র ২ : ৩৪৫-৪৬)।

যন্ত্রণা বিভেদ হিংসা সংঘাত নিয়ে কোনো সুচিন্তিত ধারণায় পৌঁছনোর মন অথবা মনন বিভূতিভূষণের ছিল না। তবে কে বলতে পারে হয়তো বিভূতিভূষণ সেই মুসলমান বৃদ্ধ আর দুজন চালওয়ালিকে নিয়ে "গল্প নয়"-এর মতো একটি কাহিনী বুনবার কথা ভাবতেই পারতেন না, যদি না তাঁকে দেখতে হত ১৯৪৬! 'জ্যোতিরিঙ্গণ' সংকলনের অন্তর্গত সেই গল্পে বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন, 'মানুষের প্রতি মানুষের হিংসায়, শঠতায়, নিষ্ঠুরতায়, স্বার্থপরতায়, ঈর্ষায় যে বিংশ

শতাব্দীর নভোমণ্ডল আজ ধূমমলিন···সেখানে এই ময়লা-শাড়ী-পরনে দরিদ্রা পল্লীবধূটি ও তার করুণাময়ী সঙ্গিনী এক নতুন বার্তা শুনিয়ে দিলে। সে বার্তা নতুন হলেও হিমালয়ের মতই পুরনো।' (বি র ১১ : ৩১৪)। ধর্মনির্বিশেষ যে স্বতঃস্ফূর্ত সহাবস্থানে বিভূতিভূষণ অভ্যস্ত, তার অন্তর থেকে খোঁজা চলে বিভূতিজীবনের আর বিভূতিসাহিত্যের কোনো উপকরণ।

১৯৪৬-এর ১৫ অগাস্টের পরে বারাকপুরে বসে বিভূতিভূষণ ঘাটশিলায় নুটুবিহারীকে প্রথম চিঠি লিখেছিলেন ২১ অগাস্ট। লিখছেন, 'আমি নিরাপদে ভাগ্যে বাড়ী পৌঁছিয়াছিলাম, দেরি করিলে কলিকাতা হইতে ফিরিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। এ অঞ্চলে ট্রেণ বন্ধ, ডাক বন্ধ। দার্জিলিং মেল, ঢাকা মেল গোপালনগর হইয়া বনগ্রামে আসিয়া থামিয়া থাকিতেছে। main line-এ কোনো ট্রেণ যাইতেছে না।' (অপ্রকাশিত)। সেই ২১ অগাস্ট যে একবার ডাক যাবে, এ খবর বিভূতিভূষণকে যে লোকটি এনে দিয়েছে, নাম তার গফুর। গফুরের কাছে খবর পেয়ে, তবেই বিভূতিভূষণ ভাইকে নিজেদের কুশল জানাতে পারছেন, জানতে চাইতে পারছেন, ঘাটশিলার সকলের কুশল। একই সময়ে, নুটুবিহারীর কাছে তিনি লিখছেন 'মির্জ্জাপুর স্ট্রীটে ক্ষতির পরিমাণ বেশি। বিজু বা তার দোকান কেমন আছে কে জানে।' (বি র শ ১ : ৪৯২-৩)। এ চিঠির তারিখ ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬। ১৬ সেপ্টেম্বর আবার লিখছেন, 'বিজুকে একখানা পত্র লিখে খবর নাও। আমার তো খুব সন্দেহ হচ্ছে বিজু সম্বন্ধে।' (অপ্রকাশিত)। পরাধীনতা, উপনিবেশ, দেশ, দেশহীনতা, সবকিছুকেই বিভূতিভূষণ অনুপুঙ্খের অনুষঙ্গেই ছুঁতে চেয়েছেন বারবার। তাই দাঙ্গার বিশৃঙ্খল অনিশ্চিতির মধ্যে একজন বিজুর জন্য দুশ্চিন্তা বা একজন গফুরের সহযোগিতা বিভূতিজীবন আর বিভূতিসাহিত্যের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। বৃহত্তর চিন্তার ভারে দীর্ণ কোনো মনের কাছে একে যদি অর্থহীন মনে হয়, তাতে তো বিভূতিজীবনের এবং অবশ্যই বিভূতিসাহিত্যের সত্য মিথ্যে হয়ে যায় না। দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতায় বিভূতিভূষণের দেখাশোনাও তো অনেকখানি সত্যকেই বহন করে।

২ সেপ্টেম্বর নুটুবিহারীকে লেখা চিঠিতে আছে, 'সে চেহারা আর নেই। শেয়ালদহের কাছে দোকান পসার সব দগ্ধ ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত।···লোকজন তেমন চলচে না, প্রায় সব দোকান বন্ধ। মাঝে মাঝে দুচার খানা দোকান খোলা। লোক এখনো স্বাভাবিক অবস্থায় আসেনি। · কলকাতায় সব লোকেই ক্ষতিগ্রস্ত।' বারাকপুরে বসে এই চিঠি লিখতে লিখতে বিভূতিভূষণ নুটুবিহারীকে

জানাচ্ছেন, 'এখানে দিনকতক রেল ও ডাক বন্ধ ছিল কলিকাতার হাঙ্গামার জন্যে। বাজারে আটা নাই, একটা দেশলাই ৵০ আনা। লবণ নাই, সরিষার তেল নাই। কলিকাতায় কাল সব দোকান বেড়াইয়া একটা টুথপেস্ট পাইলাম না।' একই চিঠিতে আছে 'কলকাতায় এসো না। ঘাটশিলাতে নিশ্চয়ই এসব থেকে নিরাপদ। কংগ্রেস গবর্নমেণ্টের অধীনে বাস করাই এখন সর্ব্বাপেক্ষা ভালো।' ২৫ সেপ্টেম্বর লিখছেন, 'Bengal-এর অবস্থা ভালো না। এ সময়ে বিহারে একখানা বাড়ি থেকে খুবই উপকার হয়েচে। কতলোক ঘাটশিলা অঞ্চলে যেতে চাইচে। কলকাতার বহু লোক কলকাতায় বাড়ি করবার জন্য অনুতাপ করচে।··· কোনো কারণেই এখন কলকাতা আসবে না···ছুরিকাতঙ্ক সমভাবে বিদ্যমান।' (বি র শ ১ : ৪৯৩)।

সত্যিই সেবছর শারদীয় লেখালেখিও বড় কম। শারদীয় 'আনন্দবাজার' ছেপেছে বিভূতিভূষণের "রান্নাহাড়ি" গল্পটি, শারদীয় 'প্রত্যহ' পত্রিকায় বেরিয়েছে "বেসাতি" (বি র ১০ : ৩৭৫)। বন্ধ হয়ে গেছে 'মাতৃভূমি' পত্রিকা, অসমাপ্ত পড়ে আছে 'অশনি সংকেত'। অথচ বিভূতিভূষণের বছর তো সেই ভ্রমণ, সেই সভা সমিতি, জীবন আর প্রাত্যহিকের ছোটবড আনন্দ-নিরানন্দ নিয়েই শুরু হয়েছিল। জানুয়ারি মাসে যোগেন্দ্রনাথ সিনহার চিঠি এসেছিল—৬ ফেব্রুয়ারি ঘাটশিলায় এসে বিভূতিভূষণকে নিয়ে বহরাগডা যেতে চান। সেই জানুয়ারিতেই দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের জন্মভূমিতে ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠানে বিভূতিভূষণ ছিলেন প্রধান অতিথি। (নুটুবিহারীকে লেখা ৩০.১.৪৬-এর চিঠি, অপ্রকাশিত)। মার্চের শুরুতে কবি কৃষ্ণদয়াল বসুর ভাইপোর বিয়েতে গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, বিমল ঘোষ (মৌমাছি) আর বিভূতিভূষণ যাচ্ছেন কটক। ফিরবার পথে একদিনের জন্য পুরী যাবেন। বিভূতিভূষণের ইচ্ছে, নুটুবিহারীও এই সুযোগে একবার পুরী বেড়িয়ে আসেন। কিন্তু পুরী যদি যেতে হয় নুটুকে, তার যে কী বিচিত্র পদ্ধতি, তা ৪ মার্চ ১৯৪৬-এর চিঠিতে জানাচ্ছেন নুটুর দাদা ; এমন জানাতে বুঝি একমাত্র তিনিই পারেন, যিনি পরিচিত বন্ধুজনদের কাছে মিথ্যে কথা বলে ধরা পড়লে বলতেন, 'না দেখ, মিছে কথা খুব কম কইছি আজকাল···প্রায় বলিই না।' (গজেন্দ্রকুমার মিত্র, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ ব : ১৩৪)।

নুটুবিহারীর দাদা ৪ মার্চের চিঠিতে লিখছেন, '···যদি ৪ দিনের ছুটি নিয়ে আসতে পারো তবে পুরী বেড়িয়ে আসতে পারো এই সুযোগে। তবে তাহোলে

তুমি বলবে যে আমি এমনিই পুরী যাচ্চি, তোমাকে আমি যেন ওদের বলে কটকে নামিয়ে নিচ্চি বিবাহের রাত্রে, এমন ভাব দেখাতে হবে। গোটা ২০৲ টাকা লাগবে খরচ।...তুমি বলবে তুমি নিজেই পুরী যাচ্ছো। যেন হঠাৎ দেখা হয়েচে এমন ভান করতে হবে।' (অপ্রকাশিত)। আবার এই চিঠি যোগেন্দ্রনাথ সিন্‌হাকে দেখাতে বলেছেন বিভূতিভূষণ। কারণ যোগেন্দ্রনাথ ৭ মার্চ মাঠাবুরু যাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিলেন বিভূতিভূষণকে; কেন যেতে পারছেন না, কটকে যেতেই হচ্ছে, এই কথাটা তাঁকে জানানো দরকার। কিন্তু ভারতবিখ্যাত এক দাদা ছোটভাইকে পুরী বেড়ানোর যে কৌশল শেখাচ্ছেন, সেটা যোগেন্দ্রনাথের মতো বন্ধুজন জানতে পারলে কি বিভূতিভূষণের কোনো অস্বস্তি হওয়ার কথা? সম্ভবত না। খুব বেশি হলে, হয়তো বলতেন বিভূতিভূষণ, 'তাই তো, চালে একটু ভুল হয়ে গেল।' (গজেন্দ্রকুমার মিত্র, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ ব : ১৩৬)। সেই বছরই ২৪ মার্চ বিভূতিভূষণ সস্ত্রীক গেছেন রাজগিরে, উষ্ণ-প্রস্রবণে স্নান করেছেন, দেখে এসেছেন সেই সোনভাণ্ডার গুহা, যেখানে বুদ্ধদেব ধর্মপ্রচার করেছিলেন। এরপর যাবেন পাটনা। (নুটুবিহারীকে লেখা ২৪.৩.৪৬ তারিখের চিঠি. অপ্রকাশিত)।

১৯৪৬-এই রাজপুতানার উদয়পুর থেকে বিভূতিভূষণ ডাক পেয়েছিলেন সেখানকার স্কুলের চাকরিতে, মাসমাইনে ১৫০ টাকা। চাকরি যদি বা বেশিদিন সেখানে নাও করেন, একবার বেড়িয়ে আসবার ইচ্ছেটা খুবই আছে। বিশেষত তাঁরা যখন যোগদানের জন্য রেলভাড়া দেবেন। তবে উদয়পুর গেলে কুচবিহার সাহিত্য সম্মিলনে যোগ দেওয়া হবে না (নুটুবিহারীকে লেখা ৪.৩.৪৬-এর চিঠি, অপ্রকাশিত)। হ্যাঁ, ৮, ৯ মার্চ যে কুচবিহার সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতিত্বের আমন্ত্রণ ছিল, সেকথা ৮ ফেব্রুয়ারির চিঠিতেই ছিল। উদয়পুর যাওয়া বিভূতিভূষণের হয়নি। ২৮ সেপ্টেম্বর পুজোর ছুটি হলে, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের বাড়িতে, বহরমপুরে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল কল্যাণী আর উমাকে নিয়ে। ভেবে-ছিলেন, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ আর গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য সঙ্গে ট্রেনে বিলাসপুর পর্যন্ত বেড়িয়ে আসবেন। দুপাশে পাহাড়, গাছপালা দেখতে দেখতে যাবেন, ফিরবার পথে ঘাটশিলায় নামবেন। সেবছর ঘাটশিলার পুজোয় নুটুবিহারী সেক্রেটারি। পুজোর সময় একবার ঘাটশিলায় যাওয়ার ইচ্ছে খুবই ছিল। এদিকে যোগেন্দ্রনাথ সিন্‌হা অক্টোবরের ৭ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত ফরেস্ট বাংলো নিয়ে রেখেছেন বিভূতিভূষণের নামে। কিন্তু নানাদিকের

গোলমালে কোথাও সেবার যাওয়া হল না। তখন ভাবছেন, যদি লক্ষ্মীপুজোর সময় ঘাটশিলা যেতে পারেন। (নুটুবিহারীকে লেখা ২৫.৯.৪৬ এবং ৭.১০.৪৬ তারিখের চিঠি, বি র শ ১ : ৪৯৩-৪)।

সেবছরও বনগ্রামে হয়েছিল বিভূতি জন্মোৎসব, কিন্তু কলকাতা থেকে কেউই আসতে পারেননি সেখানকার হাঙ্গামার কারণে (নুটুবিহারীকে লেখা ১৬.৯.৪৬-এর চিঠি, অপ্রকাশিত)। ডিসেম্বর মাসেও বারাকপুর গ্রামে জিনিসপত্র সেবছরে সস্তা নয় – সর্ষে তেল ৩৸৹/৪৲, মাছ ২৲, আলু ॥৹ ॥৵৹, বেগুন ৶৹ মাংস ২৲, সব বাঁধা দর। নভেম্বরের শেষে কলকাতার কোনো এক বড ম্যাজিশিয়ান এসে নাকি এখানে চড়কতলার মাঠে তাঁবু খাটিয়ে খেলা দেখাচ্ছে, ৵৹, ৶৹ আনা টিকিট, লোকের খুব ভিড়। সেই মাসেই গোপালনগরে একদিন এরোপ্লেন থেকে আঠাবো বস্তা চাল ফেলে, তার মধ্যে দু'বস্তা আবার ট্যাংরার জলেব মধ্যে পড়ে যায়। বিভূতিভূষণের ধারণা, হয়তো নোয়াখালি বলে ভুল করে ওই চাল ফেলছিল। এদিকে সাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওয়ালটেয়ার থেকে চিঠি দিয়েছেন, যদি বিভূতিভূষণ বেডাতে যান সেখানে। যোগেন্দ্রনাথ সিন্‌হা লিখেছেন. ২৫ ডিসেম্বর মনোহরপুর যেে, সেখান থেকে সারাণ্ডার জঙ্গলে থলকোবাদে বিভূতিভূষণকে নিয়ে যাবেন তিনি। আবার ভাগ্নী উমাকে বিয়ের জন্য পাত্রপক্ষের দেখতে আসবার কথা, সেও ওই বড়দিনের ছুটিতেই। তাই সব জায়গায় বেড়ানোই অনিশ্চিত। খুব ইচ্ছে ছিল বিভূতিভূষণের, ত্রিবান্দ্রমে এডুকেশনাল কনফারেন্সে যাওয়ার। কিন্তু ১৯৪৭-এর ৫ জানুয়ারি মূলাজোড ভারতচন্দ্র লাইব্রেরির সভায় সভাপতিত্ব করবার কথা। তাছাড়া ত্রিবান্দ্রম যাওয়া মানে একশ-দুশ টাকা খরচ; এবারের দুর্বৎসরে সেটাও বড গায়ে লাগছে। (নুটুবিহারীকে লেখা ২৭।১১।৪৬, ২৯।১১।৪৬, ১৫।১২।৪৬ এবং ২৩।১২।৪৬-এর চিঠি, অপ্রকাশিত)।

শেষ পর্যন্ত গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ, ১৯৪৬ সালে ডিসেম্বর মাসের শেষে, বোনাইগড় স্টেটের অরণ্য অঞ্চলে বেড়াতে। সাত-আট দিন ঘন বনের মধ্যে ডাকবাংলোতে থাকতে থাকতে, পাহাড়ের বনে বনে কত অজানা পাখির ডাক শুনেছিলেন। চারদিকে অরণ্যাবৃত লৌহপ্রস্তরের পর্বতমালা। এ বনে বাঘ আছে, তবে দিনেমানে বেরোয় না। হাতিকে ভয় বেশি, কারণ সে নাকি দিন-রাত মানে না। (বাণী রায়কে লেখা ৫.১.৪৭ তারিখের চিঠি, বি র ১০ : ৩৬৮-৬৯)। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে আনন্দবাজার পত্রিকার সুরেশ

মজুমদার, পত্রিকার দোল সংখ্যার জন্য সারাগুা ভ্রমণের কাহিনী চাইলেন। এ লেখার জন্য তিনি একশ টাকা দিতে রাজি। বিভূতিভূষণের মনে হয়, 'ভ্রমণে খরচ করলে দেখি উঠে আসে তার তিনগুণ।' (নুটুবিহারীকে লেখা ৫.২.৪৭-এর চিঠি, অপ্রকাশিত)। অবশ্য দোল সংখ্যা আনন্দবাজারের জন্য বড় গল্প এবং অন্য একটি পত্রিকার জন্য ভ্রমণকাহিনী লিখবেন, এরকম উল্লেখ বিভূতিভূষণের চিঠিতেই আছে (বি র ১০ : ৩৬৯)।

'দুর্ব্বৎসর'এর পরের বছরটিও বিভূতিভূষণের দৈনন্দিনে, জীবনে, সেই ভ্রমণ, সভাসমিতি আর লেখালেখির ব্যস্ততাতেই শুরু হয়েছিল। যশোহর সাহিত্য সম্মেলনে সেবারের সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৫ জানুয়ারি সেখানে তারা বিভূতিভূষণকে মানপত্র দেবে। ১ ফেব্রুয়ারি পাটনা কলেজে বক্তৃতা। সুরজপুরের রাজা বিভূতিভূষণের বিশেষ ভক্ত। সরস্বতীপুজোর সময় আরা টাউনে নাগরী প্রচারণী সভায় বক্তৃতা দেওয়ার কথা। (নুটুবিহারীকে লেখা ৮.১.৪৭ আর ১৭.১.৪৭-এর চিঠি, অপ্রকাশিত)।

ফেব্রুয়ারির প্রথমদিকে বারাকপুর থেকে বিভূতিভূষণ নুটুবিহারীকে লিখছেন, 'আমরা গতকাল আরা থেকে ফিরে এসেছি। পাটনা কলেজে মিটিং করে সেই রাত্রেই রাজাসাহেবের মোটরে আবার আরাতে যাই All India Music Conference-এ নিমন্ত্রিত হয়ে। তোমার বৌদিদি আরা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বিমানবিহারী মজুমদারের বাড়ি ছিলেন। আরা গিয়ে দেখি conference আরম্ভ হয়ে গিয়েচে। তোমার বৌদিদি বিমানবাবুর মেয়েদের সঙ্গে এসে সামনের আসনে বসে আছে। অনেক বড় গায়ক ছিল। আমার ভাল লাগলো বিসমিল্লার সানাই, নারায়ণ রাও ব্যাসের খেয়াল, মিসেস্ কারওয়ালের ঠুংরি, চন্দ্রিকাপ্রসাদ দুবের সেতার ও হাফিজ আলির শরদ।' (নুটুবিহারীকে লেখা ৮.২.৪৭-এর চিঠি, বি র শ ১ : ৪৯৪)।

সংগীতে বিভূতিভূষণের উৎসাহ অনেকদিনের। ১৯৩৬-এ কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে All Bengal Music Conference-এ আবদুল করিম খানের গান শোনা, ১৯৩৮-এর conference-এ কেশরীবাঈ, হীরাবাঈ, লছমীবাঈয়ের গান শোনার স্মৃতি 'উর্মিমুখর' দিনলিপিতে আছে। জীবনের শেষ দশকে পুরনো যেসব স্মৃতি তাঁর কাছে ফিরে আসে, তার ভিতরে আছে মোৎজার্টের সংগীত শুনবার স্মৃতি; 'হে অরণ্য কথা কও' দিনলিপিতে তার উল্লেখ মেলে। অবশ্য এ শ্রবণ বিভূতিভূষণেরই শ্রবণ, যা নিয়ে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর

মতো সংগীতবোদ্ধার বিদ্রূপ করার অধিকার হয়তো থাকে। আর রবীন্দ্রসংগীতে তো বিভূতিভূষণের অবারিত গতি। তাঁর উদ্ধৃতির খাতাটির বিভিন্ন পাতায় রবীন্দ্রনাথের যেসব গান সম্পূর্ণ কিংবা অসম্পূর্ণ কয়েক পঙ্‌ক্তি ইতস্তত লেখা আছে, তার মধ্যে পাই, 'হে মোর দেবতা', 'ধায় যেন মোর সকল ভালোবাসা', 'তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে', 'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী', 'তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি', 'ওদের কথায় ধাঁধা লাগে তোমার কথা আমি বুঝি', 'পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে', 'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে', 'মন্দিরে মম কে আসিলে হে' (অপ্রকাশিত)'। অবশ্য এইসব গান তাঁকে সুরে বেশি আকৃষ্ট করেছিল, নাকি কবিতা হিসেবে, তার চুলচেরা বিচার আজ আর সম্ভব নয়। তবে বারাকপুর গ্রামে কেদারবাবুর বাড়িতে রামায়ণগান শোনা থেকে একা ঘরে শুয়ে শুয়ে 'ভজরে মন অমৃতসমান রামচন্দ্রকি নাম' অথবা 'চাকর রাখো জি' গাওয়া (অ. র.: ১২১) পর্যন্ত কোনো কিছুতেই তো কোনো এক অকারণ পুলক ছেড়ে যায় না বিভূতিভূষণকে।

সেবছর মার্চের প্রথমদিকে শ্রীহট্ট-প্রগতি-লেখক-সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে সভাপতি হওয়ার কথা বিভূতিভূষণের (বি র ১০ : ৩৭০; নুটুবিহারীকে লেখা ১১.২.৪৭-এর চিঠি, অপ্রকাশিত)। আর কটকের বাঙালি ক্লাবের নববর্ষ উৎসবে সভাপতিত্বের নিমন্ত্রণবার্তাও ওই একই চিঠিতে নুটুবিহারীকে জানাচ্ছেন। সে উৎসব সেরে এসে বাণী রায়কে লিখছেন এপ্রিলের মাঝামাঝি, 'কটকে গিয়েছিলাম নববর্ষের বিশেষ উৎসবে সভাপতিত্ব করতে, সেখান থেকে একদিনের জন্য পুরী গিয়েছিলাম। টোটা-গোপীনাথের মন্দিরের পেছনে সমুদ্রকূলের ঝাউবনে সমস্ত সময়টা একা বসে নীল সমুদ্রের ঢেউ গুণেছি। ··চমৎকার কেটেছিল দিনটা।' (বি র ১০ : ৩৭১)। মার্চ মাসে কল্যাণীকে নিয়ে শিমুলতলা গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ, সেখান থেকে রানীগঞ্জ। রানীগঞ্জে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউটে সাহিত্যসভার সভাপতি তিনি। শিমুলতলা বিভূতিভূষণের তেমন ভালো লাগে না, 'থৈ থৈ করচে Space—তবুও বলবো ঘাটশিলার মত পাহাড়শ্রেণীর সৌন্দর্য্য এখানে নেই। আর চারিদিকেই কলকাতার বড়লোকদের সাজানো বাগানবাড়ি। এ আমার তত ভাল লাগে না।' (নুটুবিহারীকে লেখা ৭.৩.৪৭-এর চিঠি, অপ্রকাশিত)।

১৯৪৬-এর অরাজকতার জের, নিত্যনতুন বিশৃঙ্খলা ১৯৪৭-এ সমানেই চলছে। মার্চ মাসের ট্রাম ধর্মঘটের সময় বিভূতিভূষণ বাণী রায়কে লিখেছেন, 'কলকাতায় যাই, কিন্তু ট্রামধর্ম্মঘটের জন্য দূরে যাওয়া সম্ভব নয়। শেয়ালদার,

কাছে বই-এর দোকান ঘুরে চলে আসি।...বাসে ওঠা আমার কর্ম্ম নয়। এঞ্জিনের ওপর পর্য্যন্ত লোক বসে, বাসে ওঠার চেয়ে যে কোনো দু'হাজার ফুট উঁচু পাহাড় আরোহণ করতে আমি রাজী আছি।' (বি র ১০ : ৩৭০)। এপ্রিলের শুরুতে নুটুবিহারীকে লিখছেন, 'যেরকম কলকাতার অবস্থা তাতে ইস্টারের ছুটিতে ঘাটশিলায় যাওয়া ঘটলো না। আমাদের এদিকে ট্রেণের বড় গোলমাল। কখন কোন ট্রেণ আসে ঠিক নেই। লোকাল ট্রেণগুলো সব বন্ধ। এ অবস্থায় পথে নামি কোন উপায়ে ?' (নুটুবিহারীকে লেখা ৭. ৪. ৪৭-এর চিঠি, অপ্রকাশিত)। ধর্মতলা পুরো বন্ধ অথবা আলিপুর থেকে হাঁটতে হাঁটতে বালিগঞ্জ স্টেশনে আসা, এরকম অভিজ্ঞতা তখন বিভূতিভূষণের প্রায়শই হয়, যখনি আসেন বারাকপুর থেকে কলকাতায়। মনে হয় 'কলকাতার জীবনযাত্রা দুর্বিবহ হয়ে উঠলো।' (বি র ১০ : ৩৭১)। যে মাসে নুটুবিহারীকে লেখেন, 'কাল সন্ধ্যা ৭টায় রেডিও বক্তৃতা ছিল। সেই উপলক্ষে কলকাতায় এসেছি। কলকাতার অবস্থা খুব খারাপ। মোড়ে মোড়ে বোমা, ছুরি মারা চলচে। কাল বিকেলে গজেনবাবুর দোকানের সামনে কলেজস্ট্রীট মার্কেটের সামনে একজন লোককে ছুরি মারলে। পার্কসার্কাস ট্রামে কাল ছুরি মেরেচে। আজ হাওড়ার ট্রাম বন্ধ। কাল বিকেলে রেডিওতে গিয়ে বক্তৃতা রেকর্ড করে থেকে এসেছি। নতুবা অত রাত্রে রেডিও স্টেশন থেকে বেরুনো নিরাপদ নয়।' (২৩. ৫. ৪৭-এর চিঠি; যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ২৬)।

অথচ ১৯৪৭ বিভূতিভূষণের জীবনে এমন একটি বছর, যখন তিনি সংসারে, সমাজে, দেশে পরিপূর্ণ শান্তিশৃঙ্খলা হয়তো আর পাঁচটা বছরের চেয়ে একটু বেশি করেই চাইছিলেন। সেবছর 'অভ্যুদয়' পত্রিকায় লিখতে শুরু করেছেন বহু পরিকল্পিত 'ইছামতী' (নুটুবিহারীকে লেখা ১৭.৭.৪৭-এর চিঠি) অথবা সেই-বছরই বিভূতিভূষণের "মেঘমল্লার" গল্প তিমিরবরণের নির্দেশনায় সংগীতনাট্যে রূপান্তরিত হয়েছে রেডিয়োতে অভিনয়ের জন্য (নুটুবিহারীকে লেখা ২৩.৫.৪৭-এর চিঠি); কিন্তু এসব ঘটনা তো সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের জীবনে সেই চারের দশকের যে-কোনো বছরেই ঘটতে পারত। আর ১৯৪৭-এ বিভূতিভূষণের তো জানা ছিল না যে 'ইছামতী'ই হবে তাঁর শেষ সম্পূর্ণ উপন্যাস। সে তো ছিল বহু যত্নে, বহু পরিশ্রমে, কম-বেশি ভালোলাগায় লেখা এতদিনের এতগুলি উপন্যাসের তালিকায় আরো একটি বিশিষ্ট সংযোজনের প্রস্তুতিমাত্র! কিন্তু সেই অরাজকতার বছরটিতে বিভূতিভূষণের সাংসারিক অর্জন শঙ্কা আর আনন্দে মেশা এক প্রত্যাশায় আকীর্ণ ছিল।

১৯৪২ সালে কল্যাণীর যখন প্রথম সন্তানসম্ভাবনা হন, তখন তিনি খুবই অসুস্থ হয়েছিলেন। বিভূতিভূষণের বাল্যবন্ধু বন্ধুদা, যশোহরের বিখ্যাত চিকিৎসক সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তখন যুদ্ধের সময় কিছুদিনের জন্য বারাকপুর গ্রামে এসেছিলেন। কল্যাণীর চিকিৎসা তিনিই করছিলেন। কল্যাণী দেড়মাস টাইফয়েডে ভোগেন। সেই অসুখের মধ্যেই তাঁর একটি মেয়ে হয়। মেয়েটি মাত্র একদিন জীবিত ছিল। কল্যাণীর তখন কোনো জ্ঞানই নেই। মৃত প্রথম সন্তানকে বিভূতিভূষণই নিয়ে গিয়ে ইছামতীর তীরে লতাগুল্মের ঝোপের তলায় মাটি দিয়েছিলেন। শোকপ্রকাশের কোনো আশ্রয় সেদিন তাঁর ছিল না। অনেকদিন পরে নৌকায় ইছামতীতে বেড়াতে বেড়াতে আঙুল তুলে একটি জায়গা দেখিয়েছিলেন ভ্রাতৃবধূ যমুনাকে, 'ঐ দেখ বউমা, কল্যাণীর প্রথম মেয়েটিকে ঐখানে মাটি দিয়েছিলাম।' (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ৩৮)। সেই ১৯৪২-এর চিঠিতে নুটুবিহারীকে লিখেছিলেন, 'তোমার বৌদিদির জ্বর ১০০°তে এসে দাঁড়িয়েছে। ·· দুর্ব্বল হয়ে পড়েচে। বমির ভাবও আছে। সুরেন বলচে কোনো ভয় নেই— এমন কি কাল ঘোল খেতেও দিয়েছে। রাত্রে জ্বর বাড়ে আমি বেশ বুঝতে পারি। এখন তোমাদের আসবার দরকার নেই। আবশ্যক হোলে তার করবো। এদিকে "আনন্দবাজার" পূজাসংখ্যার জন্য উপন্যাস চেয়েচে। কিন্তু এ অবস্থায় তাও লিখতে পারচিনে।' (২৩.৭.৪২-এর চিঠি, বি র শ ১ : ৪৯০)। মেয়েটি ভাদ্রমাসে হয়েই মারা যায়। দিনলিপিতে আছে, '···ভাদ্র মাসে একটি কন্যাসন্তান হয়ে মারা যায়— তারপর কল্যাণী একটু সেরে উঠলে গত ১৫ই ভাদ্র ওকে নিয়ে যাই কোলাঘাটে শ্বশুরবাড়ীতে। শ্বশুর মশায় তখন ছিলেন কোলাঘাটে···' (হে অরণ্য কথা কও, বি র ৭ : ৩৮৮)।

১৯৪৪ সালে কল্যাণীর দ্বিতীয় মেয়েটির জন্ম হয়। মেয়েটি মৃতই হয়েছিল। বিভূতি-রচনাবলীতে আছে, 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যাহ্নকালে বিভূতিভূষণের দ্বিতীয়া কন্যার জন্মের সময় তিনি বনগ্রামে বাসা ভাড়া করিয়া কিছুদিন অবস্থান করেন। ···বিভূতিভূষণের বন্ধু যতীন ডাক্তার "অসাধারণ" গল্পে উল্লিখিত মেয়েটিকে বিভূতিভূষণের স্ত্রীর পরিচর্য্যার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাকে অবলম্বন করিয়াই বিভূতিভূষণ "অসাধারণ" গল্পটি রচনা করেন।' (বি র ৭ : ৫১২-১৩)। গল্প তো হল, কিন্তু বিভূতিভূষণ-কল্যাণীর দ্বিতীয় সন্তানটিও থাকল না। যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় আছে, '১৯৪৪ সালে দিদির দ্বিতীয় মেয়েটি হওয়ার সময়ও বড়ঠাকুর কারোর কথা শুনলেন না, দিদিকে দেশে নিয়ে এলেন। ঐ সময় উনি

গোপালনগর থেকে বনগাঁ শহরের উপর এসে বাসা করেন।···দিদির কাছে শুনেছি, যেদিন দিদির মেয়েটি হবে, বড়ঠাকুর লেডি ডাক্তারকে ডেকে দিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বাড়িতে ছিল মানুঠাকুরঝি আর পাড়ার একজন মহিলা। ···বড়ঠাকুরেব প্রাত্যহিক জীবনে কোনো পরিবর্তন আসেনি।···যথারীতি ভোরে উঠতেন, প্রাতঃকৃত্য সেরে লিখতে বসতেন।···দিদিকে এ সময়ে প্রচুর বই এনে দিতেন বড়ঠাকুর লাইব্রেরী থেকে—যতদিন অসুস্থ ছিলেন দিদি।' (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ৪৩-৪৪)।

১৯৪৭-এ, সেই টালমাটালের বছরটিতে কল্যাণীর তৃতীয়বার সন্তান-সম্ভাবনা হল। বিভূতি রচনাবলীতে আছে, '···রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিক হইতেই দীর্ঘকাল অসুস্থ অবস্থায় ব্যারাকপুরে পিতৃগৃহে আসিয়া অবস্থান করেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই আগস্ট মাস হইতে ব্যারাকপুরে আসিয়া বিভূতি-ভূষণ মাঝে-মাঝেই শ্বশুরগৃহে উঠিতেন।' (বি র ১০ : ৩৮০)। ১৯৪৭-এর ২৫ জুন বিভূতিভূষণ নুটুবিহারীকে চিঠিতে লিখছেন, 'তোমার বৌদিদিকে বারাকপুরে নিয়ে যেতে বলেছেন শ্বশুরমশায়। পশুপতি ডাক্তার বলেচে বারাকপুরে এসে একদিন দেখে যাবেন, তারপর কলকাতায় কোনো হাসপাতালে নিয়ে গিযে রাখবেন।···বেশি নাড়ানাড়ি না করে বারাকপুবে রাখাই ভালো হবে বোধ হয়।' (অপ্রকাশিত)।

দুই দশকেরও বেশি গৃহহীন বিভূতিভূষণ ১৯৩০-এর শেষে ঘর পেয়েছিলেন। সে ঘরে দৈনন্দিনের সাংসারিক স্থিতি এসেছিল ১৯৪২-এর শুরুতে। আরো পাঁচ-পাঁচটি বছর তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল নিজেব সংসারের পূর্ণতর অবয়বটি দেখবার জন্য। আগে দু-দুবার সে সম্পূর্ণতার খুব কাছাকাছি এসেও শূন্যতাতেই সব প্রত্যাশা শেষ হয়েছিল। আর তৃতীয়বার আবার সেই পূর্ণতার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, ১৯৪৭-এর এই অনিশ্চিত দিনগুলিতে পাঁচজন ছাপোষা বাঙালির মতো বিভূতিভূষণকেও ভাবতে হয় 'এখানে boundary commission নিয়ে কি হয় জানি নে। মেয়েদের সরিয়ে দিলাম। Savings bank account ঘাটশিলায় transfer করছি। পাকিস্থানের সবাই তাই করচে। ডাকঘর থেকে লোকে হাজার হাজার টাকা রোজ ওঠাচ্ছে।' (নুটুবিহারীকে লেখা ১৭.৭.৪৭-এর চিঠি, বি র শ ১ : ৪৯৪-৫) অথবা ২৫ জুনের চিঠিতে 'নতুন বঙ্গভাগ হয়ে গেল। ভালোই হোল। বাঙালী হিন্দু হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। আমাদের ভয় নেই, হিন্দুস্থান, পাকিস্থান, দু'জায়গাতেই বাড়ি আছে। পাকিস্থানী শাসনের নমুনা দেখি কি রকম দাঁড়ায়।' (অপ্রকাশিত)।

এই সময় বিভূতিভূষণ যখন শ্বশুরবাড়ি যেতেন, দেশবিভাগ ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে শ্বশুরমশায় ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হত। শ্যামনগর, আগরপাড়া, বেলঘরিয়া, আলমবাজার, এরকম নানজায়গায় বিভূতিভূষণ জমি খুঁজে বেড়াতেন। পরিকল্পনা ছিল ষোড়শীকান্ত আর বিভূতিভূষণ ব্যারাকপুর মহকুমায় বাড়ি করবেন। সে বাড়ির ভিত্তিভূমি খুঁজতে খুঁজতে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা বিভূতিভূষণের সঞ্চয়ে জমছিল। এই সঞ্চয় "আচার্য্য কৃপালনী কলোনি" গল্পটির সাহিত্যিক প্রস্তুতির সহায় হয়। প্রসঙ্গত জে. বি. কৃপালনী সেই ১৯৪৭-এ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন, ক্ষমতা হস্তান্তরে তাঁর ছিল অন্যতম প্রধান ভূমিকা। এ কাহিনীর নামকরণে সেই সাম্প্রতিকের প্রভাব পড়ে। গল্পটি বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন ১৯৪৭ সালে পুজোর আগে, ব্যারাকপুরে ভূতনাথ কুটীরে, দোতলার চিলেকোঠার ছাদে বসে। (বি র ১০ : ৩৮০)। তবে বিভূতিভূষণের মাপের কোনো সাহিত্যিকের সৃষ্টির প্রস্তুতি খুবই সম্ভব তাঁর নিজেরও অবচেতনে মিশে থাকে প্রাত্যহিক দিনযাপনের টানাপোড়েনে। "আচার্য্য কৃপালনী কলোনি"র ব্যঞ্জনাকে একদিকে যেমন পড়ে নেওয়া যায় বিভূতিভূষণের বাড়ি তৈরির জমি খুঁজে ফেরায়, তেমনি তার রেশ এসে পড়ে নুটুবিহারীকে লেখা ১০ জুলাই-এর চিঠিতে। বারাকপুর গ্রাম থেকে বিভূতিভূষণ লেখেন, 'এদিকে পাকিস্থানী সমস্যার মধ্যে বাস করতে পারা যাবে কি না কি জানি ?...পাকিস্থানী গোলমাল না মিটলে এখন কোথাও অবস্থানের স্থিরতা দেখচিনে। এখানে থাকা যাবে কি না ১৫ই আগস্টের পরে বোঝা যাবে।' (অপ্রকাশিত)।

অবস্থানের স্থিরতাবিহীন সেই ১৯৪৭-এর জুলাইতে সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের অর্জনে আরো কিছু যোগ হল। দিল্লি থেকে ভারতীয় সাহিত্য সম্মেলনে বাংলা সাহিত্যের ডেলিগেশনে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ এল। চিঠিতে আমন্ত্রণকারী হিসেবে নাম আছে রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং সরোজিনী নাইডুর। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করবেন জওহরলাল নেহরু; নেহরুর ওখানে একটা চা-পার্টি হবে, যেখানে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা হওয়াও অসম্ভব নয়। Constitution House-এ সাহিত্যিকদের থাকবার বন্দোবস্ত হবে। সাহিত্যিকরা যে বিনা খরচে সেখানে থাকতে পারবেন, একথাও বিভূতিভূষণ আলাদা করে লিখেছেন ভাইকে। লিখেছেন, 'আন্তঃ এশিয়া সম্মেলনের মত ব্যাপারটা হবে। চীন ও পারস্যের প্রতিনিধি আসবেন।...স্বাধীন ভারতে সর্ব্বজাতীয় সাহিত্যশিল্পীদের আহ্বান এই প্রথম।' (নুটুবিহারীকে লেখা ২২.৭.৪৭-এর চিঠি, যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ৭৯)।

দিল্লির এই সম্মেলন ৩১ আগস্ট থেকে পিছিয়ে যায় ১৩ সেপ্টেম্বরে; কারণ ১৫ অগাস্টের উৎসব। তারপর পিছিয়ে গেল অনির্দিষ্ট কালের জন্য; কারণ দিল্লির ভীষণ দাঙ্গা। (নুটুবিহারীকে লেখা ২৪.৮.৪৭-এর এবং ১৩.৯.৪৭-এর চিঠি; যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ৭৯)।

এই সময়েই চিত্ররূপা লিমিটেডের কাছ থেকে খবর এসেছে—তারা 'অনুবর্ত্তন' উপন্যাসের ফিল্ম বানাতে চায়। দেবকী বসু এ প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণের সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহী, বিভূতিভূষণকে তিনি ডেকেছেন কলকাতায়; আসতে বলেছেন, সপ্তাহ দুয়েকের মতো কলকাতায় থাকবার প্রস্তুতি নিয়ে। (নুটু-বিহারীকে লেখা ২২.৭.৪৭-এর চিঠি)। 'অনুবর্ত্তন' অবশ্য শেষ পর্যন্ত ছবি হয়নি। চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় আছে, 'সম্ভবত ১৯৪৭ সালের মে অথবা জুন মাস। প্রসিদ্ধ চিত্র পরিচালক দেবকী বসুর সহকারী বিজন সেনগুপ্ত মহাশয় বিভূতি-ভূষণের "অনুবর্তন" উপন্যাসের ছবি তুলবেন বলে স্থির করেছিলেন। সে সম্পর্কে কথাবার্তা বলতে আমাদের ব্যারাকপুরের বাড়িতে দু-একবার এসেওছিলেন। অতি অল্প টাকায় একটা আনুষ্ঠানিক চুক্তিও হল।...কিন্তু সে ছবি শেষ পর্যন্ত আর হয়ে ওঠেনি।' (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৩ : ১১)

১৯৪৭ সালে ১৫ অগাস্টের উৎসব বিভূতিভূষণ কলকাতা শহরে দেখে-ছিলেন। নুটুবিহারীকে ঘাটশিলায় চিঠিতে লিখছেন, '১৫ই আগস্ট কি অপূর্ব্ব উৎসবই দেখলুম কলকাতায়। হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে আলিঙ্গনের দৃশ্য অতি প্রাণস্পর্শী। কলাবাগান ও রাজাবাজার অঞ্চলে ঢুকিয়া মেয়েরা পর্য্যন্ত মুসলমান মেয়েদের আলিঙ্গন করিয়াছে। নাখোদা মসজিদে হিন্দু হাজারে হাজারে গিয়াছে। মুসলমানেরা গোলাপ জল ও আতর দিয়াছে, সন্দেশ ও সিগারেট খাওয়াইতেছে—সে এক অভিনব দৃশ্য। আমি গান্ধিজির ওখানে ৩ ঘণ্টা ছিলাম শনিবার। সোরাবর্দ্দী ওসমান প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ হোল। আব সে সোরাবর্দ্দীই নেই। রাজপথে হিন্দু মুসলমানে আলিঙ্গন করছে। আমি বহু মুসলমানকে আলিঙ্গন করেছি। তোমরা ওখানে করো।' একই চিঠির পরের অনুচ্ছেদে আছে, 'শুনে সুখী হবে বনগ্রাম ও গাইঘাটা থানা পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে। জয় হিন্দ্‌!' (২১.৮.৪৭-এর চিঠি, বি র শ ১ : ৪৯৬)।

এইসব মিলিয়েই বিভূতিভূষণ। সুফীবাদ বিষয়ক প্রবন্ধ 'প্রবুদ্ধ ভারত' কিংবা 'উদ্বোধন' পত্রিকায় এতটাই মন দিয়ে পড়েন যে, সেই প্রবন্ধের অংশবিশেষ লেখা থাকে তাঁর উদ্ধৃতির খাতায়; যে খাতা একদিকে বিভূতিভূষণের কোরান শরিফ

পাঠের হদিস দেয়; আবার সেখানে লেখা থাকে মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনার কথাও। (অপ্রকাশিত)। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে আলাপের সম্ভাবনায় তিনি উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, ১৫ অগাস্টের বিজয়োৎসবে কলকাতার পথে মুসলমানদের আলিঙ্গন করেন। আর এই প্রসাদ, এই অংশগ্রহণ সবকিছুই সার্থক হয়ে ওঠে, তাঁর বনগ্রাম পাকিস্তানে না পড়ার আনন্দে। ওই 'জয় হিন্দ্'-এর বিভূতিভূষণ তো বিভূতি-সাহিত্যে ছড়িয়ে থাকা অনেক ভণ্ডুলমামার একজন, যাঁরা বুঝতে পারেন না যে নিজেদের আনন্দে-স্বস্তিতে-আশায়-আস্থায় আসলে তাঁরা কতখানি অনিকেত। আবার না-বোঝার সেই সারল্যকে শিল্পের কোন্ অমোঘ নিয়মে অতিক্রম করে ওই 'জয় হিন্দ্'-এর বিভূতিভূষণই হয়ে উঠতে পারেন তাঁর দেশকালের ভাঙা বাড়ি, ভাঙা পেশা আর ভাঙা জীবনের কথাকার। একজন ভণ্ডুলমামা না-হয় তিনের দশকেই বিভূতি-সাহিত্যের আঙিনায় ঘুরে গেছেন! কিন্তু গোটা চারের দশক জুড়েই তো বিভূতিভূষণের কলমে ভণ্ডুলমামাদের আনাগোনার বিরাম নেই। এই ১৯৪৭ সালেই যে ঢাকার 'সোনার বাংলা' পত্রিকার শারদসংখ্যায় তাঁর "অনুসন্ধান" গল্পটি বেরোল, সেই কাহিনীর নারাণমাস্টারের চেয়ে বড়ো ভণ্ডুলমামা বিভূতিভূষণের দেশে কালে কজনই বা মিলবে?

না, সেই কাহিনীতে দেশভাগ, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা-উত্তর যে পরাধীনতা, তার কোনো প্রত্যক্ষ বিন্যাস নেই। কিন্তু বিভূতিভূষণের সমকালীন ইতিহাসের সহায়হীন, অবলম্বনবিহীন, ছিন্নমূল স্বরূপ ওতপ্রোত মিশে আছে নারাণমাস্টারের অন্তহীন ব্যর্থতায়। জীবনে এবং সাহিত্যে বিভূতিভূষণ তো বারবারই অনুপুঙ্খের আশ্রয়ে নিজের দেশকালের অসংগতিকে বুঝতে চেয়েছেন, গাঁথতে চেয়েছেন। সে বোধের প্রক্রিয়ায়, সে গ্রন্থনার প্রস্তুতিতে কখনও থাকেন একজন নারাণমাস্টার, কখনও বা থাকে বনগ্রাম-বারাকপুরের মতো কোনো দেশ। মাউন্টব্যাটেনে আগ্রহী, পাকিস্তান-সমস্যায় সন্ত্রস্ত, জয় হিন্দ্-এ আস্থাবান মানুষটির এক তারিখ-বিহীন চিঠি এই সূত্রে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। সম্ভবত ১৯৪৭-এর ২১ অগাস্টের চিঠিটির পরবর্তী চিঠি এটি। নুটুবিহারীকে লিখছেন, 'এদিকে হিন্দুস্থান হওয়ায় মুসলমানেরা বড় ম্রিয়মান (ণ?)। বিশেষতঃ বনগ্রামে। বনগ্রাম আর মহকুমা রইল না। এটা হোল জেলা ২৪ পরগণা, বারাসত মহকুমা টাউন হিসেবে বনগ্রামের improtance চলে গেল।··· শুনচি হিন্দুরা চেষ্টা করচে বনগ্রাম মহকুমা করবার জন্যে। ২টো থানা নিয়ে তো একটা মহকুমা চলতে পারে না। শুধু বনগাঁ থানা ও গাইঘাটা থানা নিয়ে কি একটা মহকুমা চলে? তাই ওরা গিয়েচে হরিণঘাটা ও

হাবড়া থানাকে এর মধ্যে দিয়ে বনগ্রাম মহকুমা বজায় রাখতে।··· মহকুমা না হোলে বনগ্রামের হাট, বাজার, ঘরবাড়ি, জায়গাজমির মূল্য আর একদম থাকবে না।··· হিন্দুমুসলমানের অভূতপূর্ব্ব মিলন কলকাতায়···মহাত্মার ওখানে ২ দিন গিয়েছিলাম। একদিন তোমার বৌদিদিও ছিল আমার সঙ্গে। সুরাবর্দ্দির সঙ্গে আলাপ হোল। এখন মহাত্মার শিষ্য। আবহাওয়া ভয়ানক বদলে গেল এই ক'দিনের মধ্যে।··· আমাদের অসুবিধেও হোল। বারাসত মহকুমা অনেকদুর। বনগাঁ ছিল বাড়ির কাছে। উকিল মোক্তারদের সর্ব্বনাশ। যদি বনগাঁ সত্যিই উঠে যায়, ওরা মারা পড়বে।' (রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৫ : ৩৬৫)

স্বাধীনতা-দেশভাগের এই বছরেই বিভূতিভূষণের সংসারে এল বাবলু, অর্থাৎ তারাদাস—১৫ অক্টোবর, ১৯৪৭। নভেম্বরের শেষে বিভূতিভূষণ বারাকপুর থেকে নুটুবিহারীকে লিখলেন, 'তোমার বৌদিদি ও খোকন ভাল আছে। তুমি একদিন এসে দেখে যেও। গজেনবাবুরা খোকার জন্যে ভালো baby লেপ ও তোষক দিয়েচে।' পরের চিঠিতে আছে, 'খোকনের সর্দ্দি কাশি মত হয়েচে। বড় দুষ্টু হয়েচে। রাগ হোলে দুধ খায় না।' (২৯.১১.৪৭-এর চিঠি ; ৫.১২.৪৭-এর চিঠি, অপ্রকাশিত)। এর পর থেকে বিভূতিভূষণের চিঠি অথবা দিনলিপি, তাঁর ভ্রমণ কিংবা সভাসমিতি, তাঁর প্রাত্যহিক জীবনযাপন—কোনোকিছুই তাঁর খোকার সঙ্গের পূর্ণতা অথবা তাঁর খোকাকে কাছে না-পাওয়ার শূন্যতা বাদ দিয়ে নয়। ছেলের জন্মের পরে মাত্র একটি বছরেরই সাল-তারিখ-সমেত সম্পূর্ণ দিনলিপি পাওয়া যায় বিভূতিভূষণের। সেটি তাঁর জীবনের শেষ বছর ১৯৫০। পাঠক দেখেন, জীবনভর পথের সন্ধানী সেই ভ্রমণপাগল বিভূতিভূষণ কী অনিবার্যভাবে ঘরের কাঙাল হয়ে উঠেছেন! তাঁর ভ্রমণ, তাঁর সভাসমিতি, এমনকী তাঁর লেখা-পড়া, তাঁর সাহিত্য, সবকিছুকে ছাপিয়ে তাঁর দিনলিপি ভরে উঠেছে বিভূতিভূষণের ভগবানে আর বিভূতিভূষণের একমাত্র সন্তানে।

ডিসেম্বর মাসে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কথাসাহিত্য শাখার সভাপতি হিসেবে বোম্বাই গেলেন বিভূতিভূষণ, সঙ্গে ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুমথনাথ ঘোষ, বিমল ঘোষ, প্রবোধ সান্যাল। শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বোম্বাই শহরের নামকরা ধনী। তাঁর বাড়িতেই বিভূতিভূষণের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। মালাবার উদ্যান, মহালক্ষ্মী মন্দির, অ্যাপোলো বন্দর, গেটওয়ে অভ্ ইণ্ডিয়া, এলিফ্যাণ্টা, সব জায়গায় বেড়িয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। নুটুবিহারীর ডায়েরিতে আছে, '১৯৪৮ সাল ২রা জানুয়ারী দাদা এলেন বম্বে

থেকে, প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভা সেরে। দাদা বম্বেতে এঞ্জীনিয়ার শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিলেন। আসার দিন মেজর সান্যাল দাদাকে ভূসোয়াল স্টেশন থেকে একটি ট্রাঙ্ককল করেন অজন্তা ইলোরার গুহাচিত্র দেখার নিমন্ত্রণ জানিয়ে এবং ভূসোয়াল স্টেশনে দুজন লোক পাঠিয়েছিলেন ওঁদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে। প্রায় মাঝরাত্রে স্টেশনে ওঁদের ডাকাডাকি করে তাঁরা নামিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। মিলিটারী ক্যাম্পে। সেখানে থাকা ও খাওয়ার রাজসিক ব্যবস্থা হয়েছিল। পরদিন, দাদারা সকলে অজন্তা ইলোরা দেখতে যান। দাদা বলেছিলেন, জিয়াযুদ্দিন নামে এক ব্যক্তি অজন্তা ইলোরার তত্ত্বাবধানে ভারপ্রাপ্ত।' (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ৮২)। কল্যাণীকে বিভূতিভূষণ চিঠিতে লিখে-ছিলেন, বোম্বাই সহরে তোমাকে একবার নিয়ে আসবো বাবলু বড় হোলে।··· বাবলুর নামে যে চিঠি দিয়েচি তা বোধহয় এতদিনে পৌঁছেচে।' (বি র ১২ : ৩৮০-৮১, ৪২৩)। অনেক আকাঙ্ক্ষার মতো, বিভূতিভূষণের এই আকাঙ্ক্ষাও অপূর্ণ থেকে গিয়েছিল। পরবর্তী তিন বছরে কল্যাণীকে তিনি বোম্বাই দেখাতে পারেননি। বাবলুর বড় হওয়াও তাঁর না-দেখাই থেকে গেল।

১৯৪৭ সালের শেষে নিশ্চয় চলছে 'ইছামতী' লেখা। সঙ্গে আরো বেশ কিছু ছোটগল্পের প্রস্তুতিও অসম্ভব নয়, কারণ ১৯৪৮-এর পুজোয় বিভূতিভূষণের গল্পের প্রাচুর্য পাঠক দেখতে পেয়েছিলেন। ১৯৪৭-এ প্রকাশিত হয়েছে 'অথৈ জল' উপন্যাস, 'মুখোশ ও মুখশ্রী' গল্পসংকলন এবং আরো একটি সংকলন, যার নাম 'বিভূতিভূষণেব শ্রেষ্ঠ গল্প'। কিন্তু ১৯৪৭-এর ইতিহাসে যে বিভূতিভূষণের দেশের কতখানি পালাবদল নিহিত ছিল, তাঁর দেশের স্বাধীনতার স্বরূপ যে আসলে কী, এর কোনো হদিসই সেদিন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের আযত্তে আসেনি। তেমন কোনো আয়ত্তির দাবিও কোনোদিনই তাঁর ছিল না। ন্যুটুবিহারীর কাছে লেখা যে চিঠিতে, দিল্লি থেকে রাজেন্দ্রপ্রসাদ আর সরোজিনী নাইডুর নাম লেখা আমন্ত্রণপত্র পেয়ে তাঁকে বেশ প্রসন্ন দেখি, যে চিঠিতে আবার পাকিস্তান-সমস্যা-সন্ত্রাস নিয়ে তাঁকে বেশ বিচলিতও মনে হয়, সেই একই চিঠিতে আছে আরো অনেক কথা।

বিভূতিভূষণ লিখেছেন, 'হাঁ। হৃদয় হালদার বলে গোপালনগরের এক জেলে ঘাটশিলা যেতে চায় স্ত্রীপুত্র নিয়ে। লিভারের অসুখে ও অম্বলে ভুগচে। বাড়িভাড়া চায়। অবস্থা মাঝারি। ২০০৲ টাকা খরচ করবে একমাসে। একে একমাস বা দুমাসের জন্যে একখানা ঘর জোগাড় করে দিতে পারবে? এটি বিশেষ দরকার। সে

পয়সা দিয়েচে পোস্টকার্ড লেখবার জন্য। এটি চাইই। তোমার ডিসপেন্সারির ওপরের ঘর দাও না? ২৫৲ টাকা ভাড়া দেবে। তোমার ওষুধও খাবে। দেশের লোক সাহায্য করা দরকার।' (বি র শ ১ : ৪৯৫-৬)। এক সপ্তাহের খুব বেশি পরে হবে না, বিভূতিভূষণ আবার লিখছেন, 'হৃদয় হালদারের কি ঠিক করলে? ...তোমার ডাক্তারখানার ওপরেব ঘর হয় না? ...তোমার রুগীও হবে সে।' (নুটুবিহারীকে লেখা ৩০.৭.৪৭-এর চিঠি, অপ্রকাশিত)। সেই একই চিঠিতে বিভূতিভূষণ লিখছেন, তাবাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আর সজনীকান্ত দাসের ইচ্ছা, প্লেনে দিল্লি যাওয়ার। কিন্তু বিভূতিভূষণ ১৫০৲ টাকা কেবলমাত্র যাওয়ার ভাড়া গুনতে রাজি নন। (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ৭৯)।

সাহিত্য সম্মেলন করতে প্লেনে চেপে দিল্লি যাওয়ার মধ্যে যে একটা অসংগত অপচয় আছে, আর তেমন অপচয়ের সঙ্গে হৃদয় হালদারের মতো দেশের লোকের উপকার করতে চাওয়ার একটা মারাত্মক স্ববিরোধ আছে—এমন কিছু কি বিভূতিভূষণ নিজের মতো করে বুঝতেন? তিনি তো দেশ বলতে কখনোই কোনো সমগ্রকে বুঝতে বা বোঝাতে চাননি। অথচ তাঁর দেশে যেমন হৃদয় হালদার আছে, তেমনি গফুর অথবা বিজু আছে, আবার আছেন সভাসমিতির উদ্যোক্তারা, সাহিত্যিক বন্ধুরা, আছেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সরোজিনী নাইডু, জওহরলাল নেহরু। বিভূতিভূষণ কিন্তু চিরকাল নিজের অতি পরিচিত সব অনুপুঙ্খকে ছুঁয়ে ছুঁয়েই দেশের সংজ্ঞায় পৌঁছতে চাইতেন। তাই কি খানিকটা প্রতীকের মতোই হয়ে যায় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হওয়ার ঠিক আগের বছরটিতে বিভূতিভূষণের জীবনাবসান? যে পরিকল্পনায় তাত্ত্বিক-অর্থনীতিবিদ্-রাজনীতিবিদেরা এই বিশাল দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের সমস্যা, দ্বন্দ্ব, সুখ, দুঃখকে কয়েকটি সমজাতীয়ের অনুধারণায় বেঁধে প্রগতি-অপ্রগতির স্বপ্ন দেখিয়ে চলেছেন! বিভূতিভূষণের জীবন আর সাহিত্য তাঁর দেশের পরিকল্পিত উন্নয়নের সঙ্গে কোনোরকম বিনিময়ের অবকাশ পেল না। এ অনবকাশ হয়তো সেই ১৮৯৪ থেকে বিভূতিভূষণের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত দিয়ে, প্রতিটি সংগ্রাম দিয়ে, প্রতিটি নির্মাণ দিয়েই তৈরি।

১৯৪৮ ভারতবাসীর জীবনে শুরু হয়েছিল গান্ধীজির মৃত্যু দিয়ে। 'শনিবারের চিঠি'র মাঘ ১৩৫৪ সংখ্যায় বিভূতিভূষণ লিখলেন "বাপুজী"। (দ্র পরিশিষ্ট ক) ১৩ ফেব্রুয়ারি ঘাটশিলায় নুটুবিহারীকে চিঠিতে লেখেন, 'কাল বারাকপুরে মহাত্মাজীর অস্থিবিসর্জ্জন উৎসব দেখলুম। তোমার বৌদিদিও সঙ্গে ছিলেন। সে এক বিরাট ব্যাপার। ৫/৬ লক্ষ লোক হয়েছিল।' দেশ ভাগার প্রস্তাবে বিভূতি-

ভূষণ অনেক বাঙালি হিন্দুর মতোই ভেবেছিলেন 'ভালোই হোলো'; বনগ্রাম যদি পাকিস্তানেও পড়ে তাহলেও যে মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরপুরুষদের দুটি বাড়ির একটি হিন্দুস্থানে, একটি পাকিস্তানে পড়বে, এইরকম ভেবে তিনি নিশ্চিন্ত বোধ করেছিলেন। ১৯৪৭-এর ১৫ অগাস্ট তিনিই তো কলকাতার পথে অনেক মুসলমানকে আলিঙ্গন করেছিলেন। আবার বনগ্রাম পাকিস্তানে না-পড়ায় 'জয়হিন্দ্'-এর আশ্বাস তাঁকে প্রসন্ন করেছিল। তিনি তো এরকমই মানুষ—এর বেশিও নয়, কমও নয়। তাই গান্ধীজির মৃত্যুর সদ্যস্মৃতি সঙ্গে নিয়ে তিনি আবো অনেক বাঙালির মতো নিজের নিত্যনৈমিত্তিক দৈনন্দিনের অংশ হয়ে যেতে পারেন।

সে বছর বিভূতিভূষণের জীবনে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ সমস্যাটি হল, বাপ-মা-মরা ভাগ্নী উমার বিয়ে দেওয়া। ৮ জানুয়ারি নুটুবিহারীকে লেখা চিঠিতে (অপ্রকাশিত) তার উল্লেখ আছে। সাহিত্যিক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই বিয়ে স্থির। পাত্রপক্ষ যে প্রায় চার হাজার টাকা দাবি করছেন, সেটা বিভূতিভূষণের কাছে খুব নীতিবিরুদ্ধ মনে হচ্ছে, এমন প্রমাণ সে চিঠিতে মেলে না। ১৯৪৮-এর বৈশাখ মাসে উমার বিয়ে হয়েছিল। ঘাটশিলায় বিয়ে; বর আর বরযাত্রীরা এসেছিলেন কলকাতা থেকে। বড়মামিমা কল্যাণী বরণ করেছিলেন; উমার বাবা পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় আর মা জাহ্নবীর অকালমৃত্যুর স্মৃতি সেদিনের আনন্দ উৎসবে মিশে ছিল। (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ৮৩-৮৪)। উমার বিয়েতেই বোধ করি বিভূতিভূষণের জীবনের বড়রকম সাংসারিক দায়দায়িত্ব শেষ। পরের দুটি বছরে আর তেমন কোনো গুরুভার ছিল না। যা বাকি থাকল, তা অনেক দীর্ঘমেয়াদি। তা পালনের অবকাশ বিভূতিভূষণ পাননি।

১৯৪৮-এই জ্যৈষ্ঠ মাসে বাবলুর অন্নপ্রাশন হয়। সেই অনুষ্ঠানের আগে হঠাৎ বিভূতিভূষণের কী খেয়াল হল, বললেন, তাঁদের বংশে নাকি মুখেভাত নেই, সুতরাং ভাত হবে না। মহানন্দর পুরনো খাতা বের করে নুটুবিহারী দেখালেন যে, বিভূতিভূষণেরও অন্নপ্রাশনের তারিখ সেখানে লেখা আছে। কিন্তু খেয়ালি বিভূতিভূষণ রাগ করে ঘাটশিলা থেকে চলে গেলেন, 'তোমরা ভাত দাও, আমি থাকব না।' আর অনুষ্ঠানের ঠিক আগের রাত্রে ফিরে এসে বললেন, 'আমাদের আবার নাড়ু আছে; সে কথা তোমাদের মনে আছে তো?' রাত্রে সকলের সঙ্গে খেতে বসে যমুনাকে বললেন, 'যাক, আজ উতরে গেছ বউমা।' সেদিনের সব রান্না যমুনা করেছিলেন, জোগাড় দিয়েছিলেন কল্যাণী। যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'বড়ঠাকুরের ইচ্ছা বাড়ির মেয়েরাই রান্না করে। ওঁদের গ্রামে কাজকর্ম হলে

বাড়ির মেয়েরাই সব করেন, তাই আমাদেরও করতে হবে।' (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ৮৬-৮৭)।

এই আর এক বিভূতিভূষণকে তাঁর সংসারজীবনের আখ্যান থেকে বারবার পড়ে নেওয়া যায়। যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতেই আছে, 'একবার কি হোল, পৌষের প্রচণ্ড হাড়-কনকনানি শীত পড়েছে, বড়ঠাকুরের কি খেয়াল চাপল, বললেন, "কল্যাণী, তুমি আর বউমা দুজনে কাল ভোরে বাঁধ থেকে স্নান করে এসে বড়ি দিও। আমার মা দিতেন। এগুলো গৃহস্থঘরের লক্ষণ।" …পর দিন ভোরে দুই জায়ে শীতে হি-হি করতে করতে স্নান করে এসে বড়ি দিলাম। …একদিন বললেন, "শীতের দুপুরে রোদে পিঠ দিয়ে বসে দুজনে কাঁথা সেলাই কর। আমার মা এমনি শীতে দুপুরে ঘুমুতেন না, গল্পের বইও পড়তেন না। সংসারের টুকিটাকি কাজ করতেন, সেলাই করতেন।" …কোথায় গল্পের বই পড়বো, কিংবা গল্প করবো, তা নয়, কাঁথা নিয়ে বসতে হবে। …আমাদের মনোভাব বড়ঠাকুর মনে মনে বুঝতে পারলেও, মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না। দুপুরে কাঁথা সেলাই করতে বসলাম।' (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ৮৯-৯০)। বারাকপুর গ্রামে স্থায়ী বসবাস শুরু হওয়ার আগে থেকেই বিভূতিভূষণ কল্যাণীকে বলতেন, 'গ্রামে এসে তোমাকে থাকতে হবে, যেমন করে আমার মা এই গ্রামে সংসার করতেন তোমাকেও তাই করতে হবে।' গ্রামে যখন থাকতেন, কল্যাণীকে গ্রামের আর সকলের মতো সব আচার অনুষ্ঠান, পালাপার্বণ পালতে হত। বিভূতিভূষণ বলতেন, 'আমার মা কুলুই মঙ্গলবার করতেন, তোমরাও করো। চাবড়া ষষ্ঠীতে আমার মা চাবড়া ভাসাতেন…' (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ৩১)।

চাইবাসা মহিলাসমিতির সভানেত্রী হয়েছেন কল্যাণী, আর বিভূতিভূষণ দিনলিপিতে লিখেছেন, 'বাবার পুত্রবধূ মোটরে সভানেত্রী হয়ে ফিরে এল।' (অ. র. : ৬১)। খুব ভোরে উঠতে না-পারার সাহেবিয়ানা বিভূতিভূষণ মোটেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। খুব ভোরে উঠবার অভ্যাস কল্যাণী করে নিয়েছিলেন। বারাকপুর গ্রামে থাকলে ইছামতী নদীতে, আর ঘাটশিলায় থাকলে গৌরীকুঞ্জের নিকটবর্তী পুকুরে কল্যাণীকে নিয়ে স্নান করতে যেতেন বিভূতিভূষণ। বলতেন, 'আমাদের গ্রামের লোক বাথরুম পাবে কোথায়? তারা গাঙেই স্নান করে। আমার ছোটবেলায় দেখেছি মা, সইমা, খুড়িমারা দল বেঁধে নদীতে স্নান করতে যেতেন। অবগাহন স্নানে যেমন তৃপ্তি, বাথরুমে স্নান করে সে তৃপ্তি কোথায়?' (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ৩৯)। বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে

আছে, 'ঘাটের পথে কল্যাণী যখন কলসী কাঁকে জল আনতে যায়—সে দৃশ্য এই গ্রামের বহু বিস্মৃত পুরোনো দিনের বধূদের সঙ্গে ওকে এক করিয়ে দেয়।' (অ. র.: ৮৪)। তেমনভাবে এক হতে জীবন যৌবন পণ করেন কল্যাণী, তাই-না বিভূতিভূষণের বারবার মনে হয়, কল্যাণীকে যে পেয়েছেন তিনি, এ এক অপূর্ব দান ঈশ্বরের! বারবার ভাবেন, কল্যাণীর মন গঙ্গাজলে ধোয়া!

১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে বিভূতিভূষণ গিয়েছিলেন রামগড়ে—ডাল্টনগঞ্জ, গয়া, হাজারিবাগ, এইরকম ছিল পরিকল্পিত ভ্রমণসূচি। রাজরোপ্পা ঝরনা, চুটুবাল চাতরা অরণ্য দেখেছিলেন। আর রামগড়ে শৈলমালার সামনে বসে সে বছরের শারদীয় লেখালেখি সারছিলেন। গজেন্দ্রকুমার মিত্রকে রামগড় থেকে ২৩ জুলাই তারিখের চিঠিতে জানাচ্ছেন, সাতটি গল্প 'complete', আরো লিখবেন। (বি র ১০ : ৩৬৪)। সেবছর 'গল্পভারতী' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল বিভূতিভূষণের "অন্তর্জ্জলি" কাহিনীটি (বি র ১০ : ৩৭৫)। 'মৌচাক' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় বেরিয়েছে "বিরজা হোম ও তার বাধা" (বি র ৪ : ৪৯০)। আর বিভিন্ন পত্রপত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় যে গল্পগুলি বেরোল, তার মধ্যে আছে 'দিগন্ত' পত্রিকায় "সংসার", 'পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা'য় "বন্দী", 'যুগান্তরে' "কালচিতি", 'গল্পভারতী'তে "হিংয়ের কচুরী" (বি র ১১ : ৪৭৫)।

জীবনের শেষ কটা বছর যে বিভূতিভূষণ তাঁর বাবলুকে নিয়ে ভরে উঠেছিলেন, তার প্রমাণ মেলে দিনলিপিতে, নিকটজনদের স্মৃতিচারণে। যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'জীবনের শেষ কটা বছর বড়ঠাকুর বাবলুকে নিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। বাবলু কথা বলছে, হাসছে, খেলছে, এ যেন তাঁর কাছে মহাবিস্ময়। সকলকে ডেকে ডেকে তা দেখাতেন। পিতৃস্নেহের রুদ্ধ নির্ঝর সহসা মুক্তির পথ পেয়ে উত্তাল ও উচ্ছল হয়ে উঠেছিল।' (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ৯৩) সে রুদ্ধতার অন্তরালে নিশ্চয় ছিল ১৯৪২ সালে নিজের প্রথম সন্তানটিকে একা বয়ে নিয়ে গিয়ে ইছামতীর তীরে মাটি দেওয়ার স্মৃতি; ছিল ১৯৪৪-এ কল্যাণীর মৃত সন্তান প্রসব করার স্মৃতি। যা রুদ্ধ ছিল, তা যে কী মর্মান্তিক রুদ্ধ, তার হদিস বিশেষ কেউ পাননি। কিন্তু মুক্তির প্রাচুর্যে নিকটজনেরা বিস্মিত হতেন। ১৯৪৯ সালে বিভূতিভূষণ যখন আবার সারাণ্ডা অরণ্যে বেড়াতে গেলেন, সেখান থেকে দু'বছরের বাবলু ব্যানার্জির নামে চিঠি এল (বি র ৯) ঘাটশিলার গৌরীকুঞ্জে। ছেলের খাওয়াদাওয়া, যত্ন, দেখাশোনা নিয়ে কল্যাণীকে তিনি এতটাই উপদেশ দিতেন, নানাজনের নানা মত, নানা কথা

বলে বলে যে, কল্যাণী কেঁদে ফেলতেন, 'বল তো যমুনা, আমার ছেলে আমি বুঝি না, ওর কতটা খেতে হবে, কি খেলে ও ভাল থাকবে, তা নয়, কে কি বললে তাই আমাকে করতে হবে।' (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ৮৬)। পরিচিত বন্ধু-বান্ধবরা তখন বিভূতিভূষণকে নিয়মিতই দেখতেন, কখনও ছেলের সঙ্গে ঘোড়া হয়ে খেলতে, কখনও তাকে কাঁধে নিয়ে মাইলের পরে মাইল হাঁটতে, নিমন্ত্রণে গিয়ে যে খাদ্যটা মুখে লাগত, তা বাবলুর জন্যে নিয়ে আসতে। ১৯৪৯ সালের অগাস্ট মাসে কলকাতার হাজরা পার্কে ঋষি অরবিন্দর জন্মদিন উপলক্ষে কয়েক-দিনব্যাপী সম্মেলন। একদিন বিভূতিভূষণ ছিলেন প্রধান বক্তা। বারাকপুর গ্রামে উদ্যোক্তারা এসেছেন বিভূতিভূষণকে নিয়ে যেতে। রওনা হওয়ার মুখে ছেলে এসে বলল, 'বাবাই আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবি নে?' বিভূতিভূষণের সভায় যাওয়া হল না; বললেন, 'শ্রীঅরবিন্দ আমার মাথায় থাকুন। তিনি মহাপুরুষ। তাঁর জন্যে বক্তার অভাব হবে না। কিন্তু আমার বাবলুকে নিয়ে বেড়ানোর আমি ছাড়া কেউ নেই।' (কিশলয় ঠাকুর, ১৯৭৮ : ২৬২)।

বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পরে সুমথনাথ ঘোষ লিখেছিলেন, 'সব বাপই ছেলে-মেয়েকে ভালবাসে। কিন্তু বিভূতিভূষণের মত এমন উগ্র ভালবাসা বড় একটা দেখা যায় না। বেশি বয়সের সন্তান আরও অনেকের আছে, একমাত্র পুত্রের পিতাও আরও অনেক দেখেছি; কিন্তু ঠিক এরকমটি আর দ্বিতীয় দেখি নি বললে অত্যুক্তি হয় না।···তাঁর ইদানীংকার অধিকাংশ রচনার মধ্যে তাই কোন না কোন ফাঁকে একটি ছোট ছেলে এসে পড়ত, তিনি কিছুতেই তাকে এড়াতে পারতেন না।' (সুমথনাথ ঘোষ, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ ব : ১৩৮)। কোনো ফাঁক নয়, কাহিনীর পুরো জমিটাই পিতা-পুত্রের বন্ধুত্বকে ছেড়ে দিয়েছেন বিভূতিভূষণ, তেমন গল্প প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৯-এর শারদীয় 'যুগান্তর'-এ—"খেলা" (বি র ১১ : ৪৭৮)। বাবা মতিলাল আর তার ছেলে টুলুর খেলার এমন নির্মম পরিণাম কেন যে মৃত্যুর ঠিক আগের বছর বিভূতিভূষণের কলমে এসে গেল, তার উত্তর আজও অজানা। বিভূতিভূষণ জীবনের শেষদিকে কল্যাণীকে নাকি মাঝে-মধ্যেই বলতেন, 'যদি আমি চলে যাই দুঃখ করার কিছুই নেই।···মৃত্যু মানে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাওয়া···মৃত্যু···শুধু খোলস বদলানো।' (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ৯৩-৯৪)। ১৯৪৯ সালে শারদীয় 'যুগান্তর' পত্রিকায় "খেলা" ছাড়া বেরিয়েছিল 'কল্যাণশ্রী' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় "অনুশোচনা" (বি র ১১ : ৪৭৫), 'কথা-সাহিত্য' পত্রিকার কার্তিক এবং পৌষ সংখ্যায় যথাক্রমে "বড়-দিদিমা" আর "শিকারী" (বি র ১১ :

৪৭৮)। নভেম্বর মাসে সারাণ্ডা অরণ্য ভ্রমণে গিয়ে ছেলের নামে আলাদা চিঠি তো পাঠিয়েছিলেনই ; তাছাড়া ২৬ নভেম্বর কল্যাণীকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'বাবলু কেমন আছে ? আমার নাম করে কিনা ?' (বি র ১২ : ৩৮২)।

১৯৫০ সালে বিজয় রায় সম্পাদিত 'বাঙলা' পত্রিকায় বিভূতিভূষণের 'অনশ্বর' উপন্যাসটি বেরচ্ছিল। বারাকপুর গ্রামে তখন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ভরা সংসার। বাঁশবনে বসে তেল মাখতে মাখতে ভাবেন, 'ভগবানের নাম এখানে স্বাভাবিকই উচ্চারিত হয়। কলকাতায় বাড়ি করে কি সুখ পেতাম আমি ?' (অ. র. : ২৬৭)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে বেলুড়ের সভা, সর্বত্রই যাতায়াত, চালকীতে ধান মাপতেও যান তারই মধ্যে। (অ. র. : ২৬৩-৬৪, ২৬৬)। শরীরের কোনো ক্লান্তি কি অস্বস্তির হদিস দিনলিপিতে মেলে না। অবশ্য আগের বছর মে মাস নাগাদ পিঠে একটা কারবাংকাল হয়ে বড় কষ্ট পেয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। খবর পেলে নুটু-বিহারী ব্যস্ত হয়ে ঘাটশিলা থেকে ছুটে আসবেন বারাকপুরে, তাই কল্যাণীকে বাধা দিচ্ছিলেন—ওদের কিছু জানাতে হবে না। শেষ পর্যন্ত কল্যাণীর চিঠি পেয়ে যমুনা আর নুটুবিহারী বারাকপুরে এসেছিলেন ; বিভূতিভূষণ বড়ো রোগা হয়ে গেছেন। ভাই-ভায়ের বউকে দেখে কিন্তু খুব খুশি। অবশ্য কল্যাণীকে বললেন, 'তুমি অযথা এদের কষ্ট দিলে।' (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ৯৬)। তবে সে তো ১৯৫০ সালের গোটা জুলাই মাসটাই পথে পা মুচ্‌কে পড়ে প্রায় শয্যাগত ছিলেন বিভূতিভূষণ (অ. র. : ২৮৮-৯০)। এমন ছোটখাটো অসুবিধায় কি আর একজন এতখানি প্রাণবন্ত মানুষের জীবনাবসানের ইঙ্গিত পাওয়া যায় ?

পড়াশুনাও চলছে কম নয়—রামায়ণ, ত্রৈলঙ্গস্বামীর জীবনচরিত, শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ সম্পাদিত 'হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিন', শিশিরকুমার ঘোষের 'নিমাইচরিত', স্বামী অভেদানন্দের 'লাইফ বিয়নড ডেথ', সঙ্গে সঙ্গে বিনোদবিহারী সাধুর 'আমার ব্যবসাজীবন' অথবা পুরুষোত্তম ট্যাণ্ডনের নাসিক কংগ্রেসের সভাপতির বক্তৃতা। (অ. র. : ২৬৮, ২৭৩-৭৪, ২৮৪, ২৮৬, ২৯৩, ২৯৯, ৩০৩)। তখনও খুশি হওয়ার ক্ষমতা তাঁর অম্লান। পরিমল গোস্বামী 'মারকে লেঙ্গে' বইটি আর চারজনের সঙ্গে বিভূতিভূষণকে উৎসর্গ করেন। সে বই হাতে পেয়ে আর পড়ে বিভূতিভূষণ যে কত খুশি, তার প্রমাণ ১৯৫০-এর ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখে পরিমল গোস্বামীকে লেখা চিঠি, '...“মারকে লেঙ্গে” চমৎকার লাগছে, প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ...স্যাটায়ারে আপনার হাত চমৎকার, ব্যঙ্গের সঙ্গে প্রয়োজন মতো হাসি বা কারুণ্য বা একসঙ্গে দুইই আপনি অতিশয় সূক্ষ্মতার সঙ্গে ফুটিয়ে

তুলেছেন…বেশ ভালো একখানি বই, নামটা যুক্ত করার জন্ম আবার ধন্তবাদ জানাচ্ছি।' (পরিমল গোস্বামী, ১৯৭১ : ৩৫০-৫১)।

১৯৫০-এর গোড়ায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে 'ইছামতী'। 'গল্পভারতী' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় বেরিয়েছিল "যাচাই" গল্পটি। তার ইংরেজি অনুবাদ "The Consolation" নামে 'নেহরু অভিনন্দন গ্রন্থ ১৯৪৯'-এ অন্তর্ভুক্ত হয় (বি র ১০ : ৩৮৩)। সেবছর মে মাসে 'কেদার রাজা' উপন্যাসের ছবি করার প্রস্তাব এসেছিল (অ. র. : ২৮৪)। সেবছরও বিভূতিভূষণ বি.এ. পরীক্ষার খাতা দেখেছেন, মার্কশিট তৈরি করেছেন (অ. র. : ২৮৬), মুকুল চক্রবর্তীর সঙ্গে লরিতে চেপে বেড়াতে গেছেন ধারাগিরির ওপরে স্থকজলের ঘন জঙ্গলে (অ. র. : ৩০৭-৮)। 'কথা-সাহিত্য' পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় বেরিয়েছে বিভূতিভূষণের বিখ্যাত গল্প "কুশল পাহাড়ী", 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে "ঝগড়া" আর শারদীয়া 'যুগান্তরে' "সীতানাথের বাড়ী ফেরা"। সেবছরই 'তরুণের স্বপ্ন' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় বেরিয়েছিল "হরি কাকা" (বি র ১১ : ৪৭৮)।

'…ঐকান্তিক সাহিত্যিক…'

বিভূতিভূষণের জীবনের শেষ দশক তাঁর দেশের সমাজ-রাজনীতির অনুষঙ্গে বড়ো বেশি ঘটনাবহুল আর জটিল দশক। সেসব জটিলতার সমান হদিস বিভূতিভূষণ করতে পারতেন না। এমনকী অনেক জটিল যে তাঁর জানাচেনার বাইরেই থেকে গেল, এমন কোনো অপূর্ণতার বোধও হয়তো তাঁর ছিল না। নিষ্প্রদীপ কলকাতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকাল তিনি একভাবে চিনতে চান। সে চেনার সত্যকে 'অনুবর্ত্তন' উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে তিনি গেঁথে দিতে পারেন শিল্পীর অনায়াস দক্ষতায়। কিন্তু যখন তিনি সেই 'অনুবর্ত্তন' উপন্যাস লেখেন, কিংবা 'অনুবর্ত্তন' শেষ করে তাঁর বহু-পরিকল্পিত 'দেবযান' সাধনায় মনোনিবেশ করেন কলকাতার যথেষ্ট কাছাকাছি থাকতে থাকতে, তখন বাংলা জুড়ে যে রাজনৈতিক টানাপোড়েন অবিরাম চলে, তা তো তাঁর ইহলোকে তেমন কোনো রেখাপাত করে না। ১৯৪৫-এর শেষে মীরাট সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে বিভূতিভূষণ বলেন, 'এত বড় মন্বন্তর ঘটে গেল বাংলাদেশে, অথচ চিত্রে ও রঙ্গমঞ্চে আমরা তার কি ছবি পেলাম? আমরা পেলাম নায়িকার নাকেকান্না প্যানপ্যানানি গান, মিষ্টি মিষ্টি কথায় নায়কের প্রেম-নিবেদন আর মান্ধাতার আমলের যাত্রার পালার ট্র্যাডিশনে কতকগুলি

পৌরাণিক নাটক।' (বি র ১২ : ৩৭১)। বিভূতিভূষণ কি জানতেন তখন 'নবান্ন' নাটকের কথা, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রযোজনায় বিজন ভট্টাচার্যর যে নাটক তখন অনেক বাঙালি দর্শকের যন্ত্রণাকে, শূন্যতাকে একধরনের আশ্রয় দিয়েছে? সে আশ্রয়কে একেবারে না জানলে কি বোঝা যায় যে তার মধ্যে কতখানি নিরাশ্রয়ও নিহিত আছে? যে গোপাল হালদার একদিন ছিলেন বিভূতিভূষণের একান্ত অন্তরঙ্গ, যাঁর আনুকূল্য 'পথের পাঁচালী' প্রকাশের পথে সহায় হয়েছিল, তিনি তো ছিলেন 'নবান্ন' নাটকের অনেক অভিনেতার একজন। গোপাল হালদারের লেখাতেই আছে, '…বিভূতিভূষণ ছিলেন ঐকান্তিক সাহিত্য-সেবক। থানা-পুলিসের উপদ্রব তাঁর পক্ষে হ'ত অবাঞ্ছিত বিড়ম্বনা। মনে পড়ে ১৯৩০-এর সেই দিনটি, লবণ-আন্দোলনের বিপুল আলোড়নে আমরা তখন সকলেই আলোড়িত। সে উত্তেজনা বিভূতিভূষণের চিত্তও স্পর্শ করেছিল প্রথম দু-একদিন। তারপর একদিন তিনি বললেন—বেশ স্থিরনিশ্চয় হয়েই, "ওসব আমাদের কিছু নয়। আমরা সাহিত্যিক; আমরা জীবনের অনেক গভীরতর দেশকে দেখি। রাজনীতি তো তার উপরকার ভাসা-ভাসা জিনিস মাত্র।" এ কথায় যতটা সত্য আছে, ততটাই আছে ভুল। বরং আমার বিবেচনায় ভুলের মাত্রাই বেশি। যাই হোক, বিভূতিভূষণের কথা ছিল কিন্তু তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস। তাই তাঁর লেখায় রাজনীতিক জীবনের যে সামান্য উল্লেখ আছে, তা ভাসা-ভাসা। আর সেদিনে আমি যদি ডায়েরি রাখতাম তা হ'লে তাতে যে কারণে কারও নাম উল্লেখ করতাম না, বিভূতিভূষণের ডায়েরিতে সে কারণেই সেদিনের মহামন্থনের কথা ও সে সম্পর্কিত বন্ধুদের কথাও হয়েছে বর্জনীয়।' (গোপাল হালদার, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ ব : ২০৫)।

দুয়ের কি তিনের দশকে গোপাল হালদারের দেখা বিভূতিভূষণ চারের দশকে নিশ্চয় তাঁর অবস্থান পরিবর্তন করেননি। তাই ১৯৪৬-এর 'দুর্ব্বৎসর' তাঁর কাছে কখনোই শুরু থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত রাষ্ট্রবিপ্লবের বিভিন্ন প্রকাশে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে না। ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি নুটুবিহারীকে চিঠিতে লেখেন, '…খুব হাঙ্গামা চলিতেছে। রাণাঘাট লাইন বন্ধ। সব ট্রেণ বনগাঁ দিয়া যাইতেছে।…ট্রাম বাস সব বন্ধ।' (৮.২.৪৬-এর চিঠি, অপ্রকাশিত)। কিন্তু রসিদ আলি দিবসের অঙ্গীকার, তারও আগে রামেশ্বরের হত্যা বিভূতিভূষণের দৈনন্দিন ভাবনায় কিংবা যাপনে যানবাহন বিভ্রাটের অতিরিক্ত কোনো বার্তায় চিহ্নিত হয়নি। তারপর ১৯৪৬-৪৭ জুড়ে যখন দাঙ্গা এবং দাঙ্গা-পরবর্তী অরাজকতায় কলকাতার জীবনযাত্রা ক্রমশই অনিশ্চিত, বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, তার

উল্লেখ বিভূতিভূষণের চিঠিতে বারবার মেলে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন এবং তার পরবর্তী ইংরেজ-বিরোধী প্রতিরোধের টালমাটাল চেহারায় যে বিশৃঙ্খলা ছিল, তা যে দাঙ্গার অপচয় থেকে ভিন্ন, এমন কোনো উপলব্ধির দায় বিভূতিভূষণে বর্তায়নি। হয়তো সেই একই গ্রহণ-বর্জনের যুক্তিতে ১৯৪৫ সালে বিভূতিভূষণ 'নবান্ন'কে অস্বীকার করে ফেলেন। 'নবান্ন' নাটক যখন মঞ্চস্থ হয়েছিল, তার আগেই কলকাতার বাসা উঠিয়ে দিয়েছেন বিভূতিভূষণ। অসম্ভব নয় যে, নাটকটি হয়তো তাঁর না-দেখাই থেকে গেছে। তবু বাংলাব নাটক নিয়ে সভাপতির অভিভাষণে ওরকম মন্তব্যে দায়বোধের কিছুটা খামতি তো থাকেই। বিশেষত 'নবান্ন' থেকে বাংলা নাটকের একধরনের পালাবদল যখন এতখানিই স্বীকৃত। আর স্বাধীনতাব একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিভূতিভূষণ 'ইছামতী'র অতীত-অন্বেষণে পাড়ি দেন। শিল্পীর ক্ষেত্রে এরকম পাড়িকে অবশ্যই পলায়ন বলা চলে না। কিন্তু একধরনের নির্বাচন তো বটেই, যার বিচারটা বেশির ভাগই ভুলভাবে হয়ে থাকে; কিন্তু তা বলে বিচারের দরজা বন্ধ হয়ে যায় না।

সে খোলা দরজাকে বিভূতিভূষণ ভয় পেতেন না কখনও। সেখানেই শিল্পীর আত্মবিশ্বাসে তিনি বলীয়ান। "কলহান্তরিতা"র মতো একটি নিপুণ গল্প কেমন করে অনায়াসে লেখা হয়ে যেতে পারে, তাব বর্ণনা পাঠক বিভূতিভূষণের অনেক ভ্রমণের সঙ্গী যোগেন্দ্রনাথ সিন্‌হার কাছে জানতে পারেন। বিভূতিভূষণ তাঁকে বলেছিলেন, '...সারাদিন গোপালনগর স্কুলেই আমার সময় ফুরিয়ে যেত; শুধু সকাল ও সন্ধ্যার সময়টা গল্প লেখার জন্য মিলত। ঐ দিনও আমার স্কুলে যাবার দবকার ছিল। আমি খাওয়া দাওয়া করে স্কুলে যাবার জন্য তৈরি হয়েছি, পরে দেখলাম আরও আধঘণ্টা বাদে বেরুলেও চলতে পারে। তাই কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসে গেলাম। ভাবতে ভাবতে কীভাবে ও কোথা থেকে এক চণ্ডী মণ্ডপের দৃশ্য আমার চোখের সামনে এসে গেল আর আমিও লিখে ফেললাম— "খুব সকালে মণ্টুকাকা চণ্ডীমণ্ডপে গেলেন"...এইটুকু লিখবার পরেই চিন্তা করতে লাগলাম এত সকালে মণ্টুকাকা চণ্ডীমণ্ডপে গেলেনই বা কেন? এ তো চণ্ডীমণ্ডপে যাওয়ার সময় নয়! নিশ্চয়ই কাকীমার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে থাকবে। ব্যস্, এর উপরেই কাহিনীটির ভিত্তি রচিত হোল। আমি খুব খুশী মনে স্কুলে চলে গেলাম এবং স্কুল থেকে ফিরে গল্পটি পুরো লিখে ফেললাম ও ঠিক সময়েই লেখাটি ডাকে পাঠিয়ে দিলাম।' (সতীশচন্দ্র ঘোষাল, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮ ব: ৫২৫-২৬)। এই আলেখ্য থেকে বোঝা কঠিন নয় যে, বিভূতিভূষণের আসল ক্ষমতা ওই "খুশী

হওয়া" থেকে "ঠিক সময়েই···তাকে পাঠিয়ে" দেওয়ায় বিস্তৃত।

সেই ক্ষমতা নিয়েই যেমন তিনি 'অনুবর্ত্তন' লেখেন, 'অশনি-সংকেত' অসমাপ্ত রাখেন, তেমনি 'দেবযান' সম্পূর্ণ করেন, 'ইছামতী'তে প্রত্যাবর্তন করেন। তাই ১৯৫০-এর অক্টোবর মাসে, জীবনের একেবারে শেষপর্বে যখন বিভূতিভূষণের উদ্ধৃতির খাতায় লেখা হয় '···Between your fingers take this earth / Reshape this man, this beast of wars···', সে কবিতায় বিভূতিভূষণের অধিকারকে অস্বীকার করা যায় না। চারের দশকের, তাঁর জীবনের শেষ দশকের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত অনেকটাই বিভূতিভূষণের অজানা ছিল। যুদ্ধ-মন্বন্তর-রাজনৈতিক প্রতিরোধ-বিদেশী শাসকের বিরোধিতা-দাঙ্গা-স্বাধীনতা-দেশভাগের সেই সময়টার বিষয়ে বিভূতিভূষণের জানাচেনা, ধ্যানধারণা সবই ছিল অনেকখানি অসম্পূর্ণ, এমনকী কখনো বা শূন্য। কিন্তু সে অসম্পূর্ণতা তো সকলকেই বর্তায়, যে শিল্পী-সাহিত্যিক অথবা পাঠক-শ্রোতা সেদিন বিভূতিভূষণের থেকে অনেক বেশি মথিত হয়েছেন সমাজ-রাজনীতির সেই জটিল টানাপোড়েনে, তাঁরা কেই বা নিজের নিজের অসম্পূর্ণকে অসম্পূর্ণ বলে চিনতে চেয়েছেন অথবা চিনতে পেরেছেন? 'দেবযানে'র বিভূতিভূষণকে, 'ইছামতী'র বিভূতিভূষণকে, বারাকপুর-ঘাটশিলা-সারাণ্ডা-পুরী-আগ্রা-মুসৌরীর ভ্রমণপাগল বিভূতিভূষণকে, ছাপোষা সংসারী বিভূতিভূষণকে, সমালোচনা করতে তো কোনো বাধা নেই। কিন্তু তাঁর আনন্দ-উচ্ছ্বাস-যন্ত্রণা-বিরাগ-অনুভব-অজ্ঞতাকে সম্মান দিয়েই তা করা সম্ভব। ওর একটি বাদ গেলেই হয়তো ওই "খুশী হওয়া" আর "লিখে ফেলা"র মধ্যবর্তী সেতুটা ভেঙে যেত। সে তো পাঠকের পক্ষেও বিরাট বঞ্চনা! তাই বিভূতিভূষণের যুদ্ধ দেখায় আর সেই যুদ্ধ থেকে মুক্তি চাওয়ায় যেটুকু সত্য আছে, তাকে সঙ্গে নিয়েই তাঁর জীবনের পূর্ববর্তী বছরগুলিতে পাড়ি দেওয়া ভালো।

১৯৩১-৪০

পথের ঘর ঘরের পথ

সেই সব বছরে বিভূতিজীবনের তথ্য তাঁর জীবনের শেষ দশকটির তুলনায় আরো বেশি অনিশ্চিত, তাতে ফাঁকও বেশি। কারণ ১৯৩১-৪০-এর দশকটিকে যদি ভাবা যায়, একদিকে তা যেমন বিভূতিভূষণের সাহিত্যিকজীবনের সব থেকে ফলবান খণ্ড, অন্যদিকে সেই তিনের দশক যখন শুরু হচ্ছে, তখনও তো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালি পাঠকের কাছে খানিকটা চমকের মতো। জীবনের প্রথম উপন্যাসে বাংলার সংস্কৃতিজগৎকে তিনি বাধ্য করেছেন এক বিশিষ্ট সংযোজনের সরব স্বীকারোক্তিতে। বিশ শতকের তিনের দশকে যখন প্রবেশ করেছেন বিভূতিভূষণ, তখন লেখা হচ্ছে 'অপরাজিত', ১৯২৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'র পরবর্তী আখ্যান 'অপরাজিত'। 'প্রবাসী' পত্রিকায় তা ধারাবাহিক বেরোচ্ছে। তিনের দশকের সেই সূচনাকালে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামের বিপত্নীক, সংসারবিহীন, অথচ সাংসারিক দায়দায়িত্বে যথেষ্ট ভারাক্রান্ত মানুষটিকে নিয়ে, তাঁর জীবন নিয়ে, তাঁর ভ্রমণ নিয়ে আজগুবি গল্প বড় কম রটত না। 'অপরাজিত' উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার কয়েকমাস পরে, ১৯৩২ সালের শেষের দিকে অর্থাৎ ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ৬ই কার্তিক তারিখে বিভূতিভূষণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী সুপ্রভা দত্তকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমি রেঙ্গুণে ছিলাম কার কাছে শুনেছিলে ? রেঙ্গুণ কোনোদিন চক্ষেও দেখিনি। টম্‌সন্ সাহেব যে নতুন বইখানা লিখেচেন, "Letters from India", তাতে আধুনিক বাংলা সাহিত্য প্রসঙ্গে আমার সম্বন্ধে কিছু কথা আছে। আমি নাকি আফ্রিকা পর্য্যন্ত বেড়িয়ে এসেচি এবং সেখানে কিছুদিন ছিলামও। এত বাজে গুজবও রটে। তবে আফ্রিকা না গিয়ে আফ্রিকা ভ্রমণকারীর খ্যাতি অর্জ্জন করা মন্দ নয়।' (অপ্রকাশিত)।

'অপরাজিত', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'আরণ্যক', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'-এর মতো বিচিত্র নির্মাণ যতই ওই তিনের দশকব্যেপে বাঙালি পাঠককে মথিত করে, ততই হয়তো নির্মাতাকে নিয়ে জল্পনা-কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের দূরত্ব কমে। ক্রমশই বিভূতিভূষণ

বন্দ্যোপাধ্যায় আর চমক নন, বরং এমন একটি নাম, যার কাছে বাঙালি পাঠকের বিরাট প্রত্যাশা। ১৯৪০ সালের শেষে পথে পথে ধুলিমলিন, আপনভোলা এই সাহিত্যিক যখন বাইশ বছর বিপত্নীক থাকবার পরে আবার ঘর বাঁধলেন, তখন কি বিভূতিজীবন নিয়ে রহস্যের অবকাশ কমল? নাকি শুরু হল অন্য কোনো জল্পনার অন্যরকম অবকাশ? জীবনকাহিনী তো তেমন সব বাস্তব-জল্পনার, সত্য-অসত্যের ভিতর থেকেই বানিয়ে নিতে হয়। বিভূতিজীবনের শেষ দশকের পূর্ববর্তী দশটি বছরের কথামুখে যদি বলি, এই দশক শেষ হল বিভূতিভূষণের ঘর বাঁধার উপক্রমণিকায়, সেও একরকম শুরুই হবে। যে সূচনা থেকে আরো আগের কোনো সূচনায় ফিরে ফিরে আমরা চাইব গোটা দশকটিকে যথাসম্ভব বিন্যস্ত করতে, দেখব বিভূতিভূষণের জীবন আর কর্মের কোন্ কোন্ অনুষঙ্গে তাকে গাঁথা যায়। ১৯৪০ সালের ৩ ডিসেম্বর বিভূতিভূষণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন। পাত্রী বনগ্রামের এক্‌সাইজ ইনস্পেক্টর ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের মেজো মেয়ে রমা। বিভূতিভূষণ ডাকতেন কল্যাণী বলে। ১৯৪০ সালে কল্যাণীর কৈশোর তখনও যৌবনকে পুরোপুরি ধরতে পারেনি। বিভূতিভূষণের বয়স তখন ছেচল্লিশ।

'শনিবারের চিঠি'র পৌষ ১৩৪৭ সংখ্যায় "সংবাদ-সাহিত্য" বিভাগে বিভূতি-ভূষণের বিবাহের খবর বাদ পড়ল না: 'সাহিত্যিক বন্ধুরা অত্যধিক কিশোরী-প্রীতি দেখাইতে স্থরু করিয়াছেন। বন্ধুবর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের ঘাটশিলা-সংক্রান্ত পূর্ব্বকৃত ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিয়া গত ১৭ই অগ্রহায়ণ "ষোড়শী" বাবুর কন্যা রমা চট্টোপাধ্যায়কে বন্দ্যোপাধ্যায় করিয়াছেন। বন্ধুবর "বনফুল" "শনিবারের চিঠি"তে প্রকাশিত তাঁহার কৃষ্ণা ও শুক্লা "চতুর্দ্দশী"-কে এক করিয়া কাব্যগ্রন্থ "চতুর্দ্দশী" প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের বয়স হইয়াছে, শক্ত সমর্থ জিতেন্দ্রিয় বন্ধুদের এরূপ আকস্মিক পতনে ক্রমশঃ শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছি। বিশেষ কারণে, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সৎসাহস নাই।...ষোড়শীবাবুর কন্যা শুধু ষোড়শী নন, লেখিকাও; স্থতরাং বিভূতিবাবুর প্রশংসা করিতে আমরা বাধ্য।' (৪১১-১২)।

কল্যাণীর সঙ্গে বিভূতিভূষণের আলাপ ১৯৩৯ সালের ২৩ নভেম্বরে। দুদিন আগে বনগ্রামে সরকারি উকিল সত্য বসুদের ঘাটে স্নান করতে গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণের বোন জাহ্নবী। ইছামতী নদী তাঁকে ফিরিয়ে দিল না। জাহ্নবীর দুই সন্তান বারো-তেরো বছরের উমা আর সাত বছরের শান্তর সম্পূর্ণ দায়িত্ব বড়মামা বিভূতিভূষণের। ওদের বাবা পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মারা গেছেন

১৯৩২ সালের শেষের দিকে। কর্ণমূল হয়েছিল তাঁর। হাসপাতালে পাঠানোর ব্যাপারে জাহ্নবীর আপত্তি ছিল। বিভূতিভূষণই জোর করে ভগ্নীপতিকে নিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়, বোনকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, সুস্থ করে পঞ্চানন অর্থাৎ জ্ঞানকে ফিরিয়ে আনবেন বাড়িতে। কথা কিন্তু রাখতে পারেননি বিভূতিভূষণ, হাসপাতালেই পঞ্চাননের মৃত্যু হয়। কিছুদিনের মধ্যেই বিভূতিভূষণ দেখেন, বারাকপুরের সংলগ্ন চাল্‌কীগ্রামে নিজের শ্বশুরবাড়িতে জাহ্নবী নাবালক সন্তানদের নিয়ে নিতান্তই গলগ্রহ। বিশেষত জাহ্নবীর সদ্যোজাত মেয়েটা সকলেরই অসন্তোষের কারণ। (কিশলয় ঠাকুর, ১৯৭৮ : ১৭৭-৭৮ ; সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৭০ : ৮১-৮২, ১৩৬)। ১৯৩৩ সালের শুরুতে জাহ্নবীর সংসারের দায়িত্বে বিভূতিভূষণ জড়িয়েই ছিলেন। ভগ্নীপতির মৃত্যুর পরেই জাহ্নবীর হল দুরারোগ্য ব্যাধি। তার সেবাশুশ্রূষা, ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা সবই তাঁর দায়। যে শিশুটি আত্মীয়-পরিজন-প্রতিবেশী সকলেরই বিরাগের হেতু, তার মৃত্যুর প্রসঙ্গ আছে 'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপিতে।

'তৃণাঙ্কুরে' আছে, 'ছোট খুকী সম্প্রতি মারা গেছে। ও যে কেন এসেছিল তাই জানিনা। আট মাস বেঁচেছিল—কিন্তু এত দুঃখ পেয়ে গেল এই অল্পদিনের মধ্যে তা আর কাকে বলি ? ও আপন মনে হাসত—কিন্তু সবাই বলত "আহা কি হাসেন, আর হাসতে হবে না, কে তোমার হাসি দেখচে ?"—ওর অপরাধ—ও জন্মাবার পর ওর বাবা মারা গেল। সত্যিই ওর হাসি কেউ চাইত না। ওর বাবা তো মারা গেল ; ওর মারও সঙ্কটাপন্ন অসুখ হল—ওকে কেউ দেখত না—ওর খুড়িমা বললে—টাকা পাই তো ওকে মাইয়ের দুধ দি। ওকে নারকোলতলায় চট পেতে শুইয়ে রাখত উঠানে—আমার কষ্ট হত—কিন্তু আমি কি করব ? আমি তো আর স্তন্যদুগ্ধ দিতে পারি নে ? ওর রিকেট্‌স্ হল। দিন দিন শীর্ণ হয়ে গেল—তবুও মাঝে মাঝে বনগাঁয়ের বাসার বাইরের দালানে শুয়ে সেই অকারণ অর্থহীন হাসি হাসত—সেদিনও তেমনি হাসতে দেখে এসেছি—ও-শনিবারে যখন বাড়ি থেকে আসি। Unwanted smile ! কিন্তু সে হাসি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েচে গত মঙ্গলবার থেকে—খয়রামারির মাঠে ওর বালিশটা পড়ে আছে সেদিন দেখেচি—এ ছাড়া আর কোন চিহ্ন কোথাও রেখে যায় নি ও।' (বি র ২ : ২১৬)। ছোটখুকীর মৃত্যুসংবাদ বিভূতিভূষণ পেয়েছিলেন কলকাতায় বসে, ১৯৩৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি। আগের দিন শিবরাত্রি গিয়েছে, সেই উপলক্ষে সেদিন ছুটি। বিভূতিভূষণের যে দিনলিপি তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে পাঠকের হাতে

এসেছে, সেখানে আছে, 'ও যে মারা যাবে তা জানতাম। তবুও মনে পড়ে কেমন হাসত সম্পূর্ণ অকারণে—সবাই তার হাসির জন্যে বকতো। উপুড় হয়ে গড়িয়ে পড়ত একা একা বাইরের ঘরে থেকে। সবাই বলতো যাওগা।' (অ. দি. : ৬০-৬১)।

বিভূতিভূষণের 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাস ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা থেকে অর্থাৎ ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ নাগাদ 'প্রবাসী'-তে ধারাবাহিক বেরোতে শুরু করে। সে কাহিনীতে জিতুর দাদার মৃত্যুর বিন্যাসে, বৌদির মরণাপন্ন অসুস্থতায়, তাদের সদ্যোজাত শিশুকন্যাটির না-মেটা খিদেতে, অবোধ হাসিতে, শেষপর্যন্ত শিশুর অসহায় মরণে জাহ্নবীর পারিবারিক বিপর্যয়ের ছায়াকে পড়ে নেওয়া যায়। 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক অংশটি পড়তে পড়তে মনে হতে পারে, যেন 'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপি থেকে তা সটান উঠে এসেছে উপন্যাসে : 'ছোট্ট খুকী মোটে এই দশ মাসের···তার অযত্নের একশেষ হচ্ছে—উঠোনের নারকোল-তলায় চটের থলে পেতে তাকে রোদ্দুরে শুইয়ে রাখা হয়···কাঁদলে দেখবার লোক নেই, মাতৃস্তন্য বন্ধ···হর্লিক্স্ খাইয়ে অতি কষ্টে চলছে···পাড়ায় এত বৌ-ঝি আছে—দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম কেউ কোনদিন বললে না খুকীকে নিয়ে গিয়ে একবার মাইয়ের দুধ দিই···ও দিন-দিন আমার চোখের সামনে রোগা হয়ে যাচ্ছে, ওর অমন কাঁচা সোনা রঙের ননীর পুতুলের মত ক্ষুদে দেহটিকে যেন কালি মেড়ে দিচ্ছে দিন-দিন—কি করবো ভেবে পাইনে, আমি একেবারেই নিরুপায়। স্তন্যদুগ্ধ আমি ওকে দিতে তো পারি নে! ···এক জন গোয়ালার বাড়িতে দুধের বন্দোবস্ত করলাম—সে বেলা বারোটা-একটার এদিকে দুধ দিত না। খুকী ক্ষিদেতে ছট্‌ফট্‌ করত, কিন্তু চুপ করে থাকত—একটুও কাঁদত না। আমার বুড়ো-আঙুলটা তার মুখের কাছে সে সময় ধরলেই সে কচি অসহায় হাত দুটি দিয়ে আমার আঙুলটা ধরে তার মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে ব্যগ্র ক্ষুধার্ত্ত ভাবে চুষত—তা থেকেই বুঝতাম মাতৃস্তন্য-বঞ্চিত এই হতভাগ্য শিশুর স্তন্যক্ষুধার পরিমাণ। ···দু-একটি পাড়ার মেয়ে যারা বেড়াতে আসত, তারা ওকে দেখে নানা রকম মন্তব্য করত। ওর অপরাধ এই যে ও জন্মাতেই ওর বাবা মারা গেল, ওর মা শক্ত অসুখে পড়ল। খুকীর একটা অভ্যাস যখন-তখন হাসা—কেউ দেখুক আর না-ই দেখুক···সবাই বলত, আহা কি হাসেন, আর হাসতে হবে না, কে তোমার হাসি দেখছে! ···তার যে হাসি কেউ দেখতে চাইত না, একদিন শেষরাত্রি থেকে সে হাসি চিরকালের জন্য মিলিয়ে গেল। অল্পদিনের জন্যে এসেছিল কিন্তু বড় কষ্ট পেয়ে গেল।' (বি র ৪ : ১৫৮-৬১)।

'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপি 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসের অনেক পরে পাঠকের দরবারে পৌঁছেছে। দিনলিপি প্রকাশের আগে কিছু সম্পাদনার অবকাশ বিভূতিভূষণ পেয়েছিলেন, এমন অনুমানে খুব বড ভুল হবে না। তাই দিনলিপিতে জাহ্নবীর মেয়ের মরণের প্রস্থনা আর উপন্যাসে জিতুর ভাইঝির মৃত্যুর বিন্যাস, কে কার অনুগমন করেছিল শিল্পীর লেখনে, তার হদিস পাঠক খুব নিশ্চিত নির্ধারণ করতে পারেন না। বিশেষত, যে দিনলিপি বিভূতিভূষণের কোনোবকম সম্পাদনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত, সেখানে জাহ্নবীর খুকীর মৃত্যু শোকসংবাদের ভার পেরিয়ে সাহিত্যের ব্যঞ্জনায় তেমন মিশতে পারে না, যেমন পেরেছিল 'তৃণাঙ্কুরে'। লিপিসাহিত্য আর গল্প-উপন্যাসের অন্তর্বর্তী এই আড়ালকে বিভূতিজীবনের কিংবা বিভূতিসাহিত্যের তথ্যান্বেষী যদি আড়াল বলে না মানেন, তবে বিভূতিজীবনকথার অসম্পূর্ণতা আরো বেড়ে যাবে।

সেই যে ভগ্নীপতির মৃত্যুর কিছুদিন পরেই বোনকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বনগ্রামে এনে ডাকবাংলোর পাশে মাসিক বারোটাকা ভাড়ার বাসাবাড়িতে রেখেছিলেন, তখন থেকেই তো জাহ্নবী আর তার সন্তানদের দায়িত্ব বিভূতিভূষণের। সেই জাহ্নবীও চলে গেল দুটি নাবালক সন্তান ফেলে রেখে। এমন শূন্যতার মধ্যে কল্যাণীর সঙ্গে বিভূতিভূষণের প্রথম পরিচয়। বনগ্রামের মতো গঞ্জশহরে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল জাহ্নবীর মৃত্যুর করুণ কাহিনী। সেই সূত্রেই বনগ্রামের বীনাপাণি ভবনের বাসিন্দা ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের মেজো মেয়ে রমা জানতে পারল তার নির্মলাপিসির কাছে, ইছামতীতে তলিয়ে গেছেন যে মহিলা, তিনি নাকি 'পথের পাঁচালী'কার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপন বোন। বনগ্রামে আসা-যাওয়ার পাট বুঝি চুকল মানুষটার। আসতেন তো বোনের কাছেই, স্বগ্রাম বারাকপুরেও আত্মীয়স্বজন বলতে তেমন কেউ নেই। ১৯৩৯-এর ২৩ নভেম্বর কল্যাণীর দিদি মায়ার অটোগ্রাফের খাতায় বিভূতিভূষণ লিখে দিলেন, 'গতিই জীবন, গতির দৈন্যই মৃত্যু।' বনগ্রামের সঙ্গে সখ্য তাঁর কমল না। জীবনের সেই চরম শূন্যতার দিনে ষোড়শীকান্তর পরিবারটি বিভূতিভূষণকে আশ্রয়ের উষ্ণতাকে চেনাল। জীবনে যে নতুন দায়দায়িত্ব এসে পড়ল, তার কী হবে ? জাহ্নবীর মেয়ে উমা আর ছেলে শান্ত থাকবে ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণের ছোটভাই-ভায়ের বউ নুটুবিহারী-যমুনার কাছে। কারণ কলকাতায় নাবালকের নিশ্চিতি যোগানোর মতো কোনো বাসভূমি চল্লিশোর্ধ্ব বিভূতিভূষণের নেই। আছে খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশনের চাকরি, আছে বছরভর লেখার তাগাদা আর চাহিদা,

নানান পত্রিকার নানান আড্ডা, আছেন অসংখ্য পরিচিতজন, আছে ৪১ নম্বর মির্জাপুর স্ট্রিটের মেসবাড়ি প্যারাডাইস লজ। কিন্তু আসলে তো বিভূতিভূষণ তখনও গৃহহীন, স্থিতিহীন।

ষোড়শীকান্তর পরিবারে সাহিত্যের কদর ছিল। ভদ্রলোক নিজে 'দশের পূজা' নামের একটি ভক্তিমূলক বইয়ের রচয়িতা। তাছাড়া শ্যামাসংগীতের সংকলন 'অঞ্জলি', 'ইতিহাসের কথা' শীর্ষক ঐতিহাসিক কাহিনীও তাঁরই প্রণয়ন। উপরন্তু তিনি ভৈরবীর কাছে দীক্ষা নেওয়া তান্ত্রিক, পরলোকতত্ত্বে তাঁর অবিচল বিশ্বাস (কিশলয় ঠাকুর, ১৯৭৮: ১৮১-৮২)। এ ব্যাপারে বিভূতিভূষণেরও আগ্রহের শেষ নেই। প্রেততত্ত্বের আলোচনা, চক্রাধিবেশন সবই চলত ষোড়শীকান্তর বাড়িতে, বিভূতিভূষণ অংশগ্রহণ করতেন। তবে বিভূতিভূষণের পরলোকজিজ্ঞাসা, পরলোক-বিশ্বাস, অতিপ্রাকৃতে আস্থা, সবকিছুই কিন্তু কোনো না কোনোভাবে যুক্তির অবলম্বন খুঁজত। বিভূতিভূষণের বিশ্বাসে যে অন্ধতা ছিল না, তার প্রমাণ মেলে তিনের দশকেরই কোনো সময়ে সুপ্রভা দত্তকে লেখা তাঁর চিঠিতে। তখন সুপ্রভার দিদির অকালমৃত্যুতে সুপ্রভা একান্ত বিচলিত, চক্রাধিবেশনে আত্মাকে ডাকবার কথাও ভাবছেন, এ বিষয়ে সম্ভবত চিঠিতে কিছু জানতে চেয়েছিলেন বিভূতিভূষণের কাছে। জবাবে বিভূতিভূষণ লেখেন, 'তোমার মন এখন খুব খারাপ কাজেই প্ল্যানচেটের কথা লেখা তোমার পক্ষে স্বাভাবিক। ...প্ল্যানচেট করে spirit আনা বড় শক্ত। পৌনে ষোলো আনা case-এ প্ল্যান্‌চেটে আনীত তথাকথিত আত্মার বাণী চক্রে উপবিষ্ট কোনো এক বা একাধিক ব্যক্তির নিজের বা নিজেদের অজ্ঞাতসারে লিখিত অসার বাক্য মাত্র। আমি অনেক বার প্ল্যানচেট ধরেচি, V. D. Rishi-র মত নামজাদা মিডিয়মের কাছেও প্ল্যানচেটে আত্মা আনাতে দেখেচি—কিন্তু ঘটনার বাস্তবতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ দূর হয় নি। খুব trained spritualist কোনো কোনো সময় প্ল্যান্‌চেটে আত্মাকে আহ্বান করে কৃতকার্য্য হয়েছেন বইয়ে পড়েচি। আমাদের দেশে কখনো দেখিনি। Trained না হোলে প্ল্যানচেটের মত আত্মপ্রবঞ্চনায় সাহায্য করবার যন্ত্র আর নেই। ও চেষ্টা না করাই ভালো। আমি দেখেচি, জানে না শোনে না অথচ প্ল্যান্‌চেট ধরে বসেচে এবং যে কথা বা হিজিবিজি লেখা হচ্চে তাই কোনো মৃত আত্মীয়ের বাণী বলে ধরে নিচ্চে, তা যত অর্থহীনই কেন হোক্‌ না...এসব বৈজ্ঞানিক যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় বা সত্যিকার সত্যপিপাসু মনের পরিচয়ও নয়। ...আমি circleএ বসবার প্রক্রিয়া বলে দিতে পারতাম কিন্তু দিয়ে কোনো লাভ নেই। তোমাদের মনের

এখন যে অবস্থা, তাতে circleএ বসা সম্ভব নয়। ...তাছাড়া সদ্যোমৃত কোনো ব্যক্তির আত্মা আনাও সম্ভবপর নয়। মৃত্যুর পরে আত্মা কিছুদিন মরণমূর্চ্ছায় থাকে, হঠাৎ পরজগতের সূক্ষ্ম spirit matterএ কাজ করতে পারে না যেমন আমাদের জগতে নবজাত আত্মা কিছুদিন অসহায়, অর্দ্ধচেতন, অবোধ থাকে, তেমনি। সে অবস্থায় কোনো processএর সাহায্যেই তাকে আনা যায় না। আনবার চেষ্টা করা আত্মপ্রবঞ্চণা করা মাত্র...জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্ত্তী এই বিরাট নিঃশব্দ যবনিকা কি অত সহজে দূর করা যায়, সুপ্রভা?' (অপ্রকাশিত)।

সুপ্রভাকে লেখা এই চিঠির তারিখ জানা যায় না। তবু নিশ্চিতভাবেই ধরে নেওয়া যায় যে এই চিঠি লিখবার বেশ কিছুকাল পরে ষোড়শীকান্তর বনগ্রামের বাড়িতে বিভূতিভূষণের যাতায়াত শুরু হয়েছিল। কারণ দিদির মৃত্যুর সময় সুপ্রভা চৌধুরী (দত্ত) নির্দেশ করেছেন ১৯৩৭-৩৮-এ (সুপ্রভা চৌধুরী, ১৯৯৫ : ৭১)। সে বাড়িতে চক্রাধিবেশনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি এবং সত্যপিপাসার কোনো নিশ্চিত হদিস বিভূতিভূষণের কাছে পৌঁছত কিনা, তা জানবার কোনো উপায় সত্যিই আজ নেই। কিন্তু ষোড়শীকান্তর মেজো মেয়ে রমার সাহিত্যানুরাগ, তার সেবাযত্ন যে সেদিনের চল্লিশোর্দ্ধ্ব বিভূতিভূষণের কাছে পরম প্রাপ্তি, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ মেলে না। রমার কানুমামা অর্থাৎ নিরঞ্জন চক্রবর্তী সাহিত্যপ্রীতিতে মেজো ভাগ্নীর সহমর্মী। মামা-ভাগ্নীর হাতে লেখা পত্রিকার কাজে বিভূতিভূষণ উৎসাহ দিতেন। জীবনভর দুঃখ-শোক কম পাননি বিভূতি-ভূষণ। জীবন-মৃত্যুর অন্তর্বর্তী যবনিকার শীতল নিঃশব্দ না হয় অবিচলই রইল; কিন্তু জীবনজোড়া দায়িত্বের, ব্যস্ততার, কাজের, রচনার ফাঁকে ফাঁকে একাকিত্বের যে পর্দা মাঝে-মধ্যেই জানান দিয়ে যায়, তাকে কি এবার তবে খানিকটা সরানো যাবে? ১৯৪০-এর অগাস্ট মাসে, বিভূতিভূষণ কল্যাণীকে চিঠিতে লেখেন, 'নিশ্চয়ই যাবো তোমার জন্মদিনে। তোমাদের সাদর নিমন্ত্রণ কি উপেক্ষা করতে পারি, কল্যাণী? এই অল্পদিনের মধ্যে তোমাদের সঙ্গে যে আত্মীয়তা স্থাপিত হয়েচে—এখন মনে হয় যেন কতদিন থেকে...তোমাকে জানতাম; বেলুকে জানতাম, মায়াকে জানতাম, ষোড়শীবাবুকে জানতাম। কি জানি কেন এমন হয়!' (বি র ১০ : ৩৫৫)।

সেপ্টেম্বর মাস পড়ে। শারদীয় লেখার তাগাদায় বিভূতিভূষণের কাজের চাপ বাড়ে। সে বছর কোনো গল্পসংকলন বেরোয়নি বিভূতিভূষণের। কিন্তু বছরের শুরুতেই গ্রন্থাকারে বেরিয়েছিল 'মরণের ডঙ্কা বাজে', যে উপন্যাস 'মৌচাক'

পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়ে গেছে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের পৌষ থেকে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র পর্যন্ত। ১৯৪০-এর জুলাই মাসে বেরোলো 'অভিনব বাঙলা ব্যাকরণ'। ১৯৪০ সালেরই অগাস্ট মাস নাগাদ হেমেন্দ্রনাথ দত্তের 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় শেষ হয়েছে 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' উপন্যাস। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের মাঘ থেকে ১৩৪৭-এর ভাদ্র সংখ্যা পর্যন্ত 'মাতৃভূমি'-তে এই উপন্যাসেব প্রথম প্রকাশ। গ্রন্থাকারে বেরোলো সেইবছরই আশ্বিন মাসে (সুনীলকুমাব চট্টোপাধ্যায়, ১৯৭০ : ৩৮৭; বিশু মুখোপাধ্যায়, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ ব : ১৯৪; বি র ৬ : ৪৫৩)। এইসময় 'মাতৃভূমি' পত্রিকার সম্পাদক গোপাল ভৌমিক ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস থেকে 'মাতৃভূমি'-তে বিভূতিভূষণের 'কেদাব রাজা' উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশ কবেন (অ. দি. : ৩৩১)। এমন ব্যস্ততার কিনার ধবেই বিভূতিভূষণের ব্যক্তিজীবনে আসছে নতুন লগ্ন আসছে নতুন দায দায়িত্ব। ষোড়শীকান্তর বড় মেযে মায়া কলকাতায় কলেজে পড়েন, প্যারাডাইস লজেব বাসিন্দা বিভূতিভূষণ হলেন তার স্থানীয় অভিভাবক। মায়ার জীবনেব একটি কৌতুকময় অভিজ্ঞতা নিয়ে বিভূতিভূষণ লিখলেন "বাক্সবদল" গল্প। ৩রা আশ্বিন ১৩৪৭ তারিখে কল্যাণীকে চিঠিতে লিখছেন, 'সেদিনকার সেই প্লটটা নিয়ে "বাক্সবদল" নাম দিয়ে গল্পটা লিখেচি—কার্ত্তিক মাসেব শারদীয়া সংখ্যা "বঙ্গশ্রী"-তে বেরুবে। মায়ার সেই বাক্সবদলের কথা—মনে আছে তো?' (বি র ১০ : ৩৬০)।

১৯৪০-এর ১০ সেপ্টেম্বর কল্যাণীকে বিভূতিভূষণ চিঠিতে জানান যে, গোয়ালিয়রে ভারতবর্ষের কবি-সাহিত্যিক সম্মেলনে তাঁর নিমন্ত্রণ হয়েছে। পুজোর পরে পূর্ণিমা থেকে অনুষ্ঠান হবে। বাংলার সাহিত্যিকদের মধ্যে সজনীকান্ত দাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, মণীন্দ্রলাল বসু এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিমন্ত্রিত। গোয়ালিয়রের রাজ-দরবার থেকে আমন্ত্রণ এসেছে, যাতায়াতের খরচ স্টেট বহন করবে (বি র ১০ : ৩৫৭)। শেষপর্যন্ত অবশ্য গোয়ালিয়রে বিভূতিভূষণের যাওয়া হয়নি। গিয়ে-ছিলেন রাঁচিতে, সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করতে (বি র ১০ : ৩৬১)। ১০ সেপ্টেম্বরের চিঠিতেই বিভূতিভূষণ কল্যাণীকে লিখছেন, 'আমি বুঝি রাগ করতে জানিনে—না? আমার ভারি কষ্ট হয়েচে ও কথা কেন লিখেচ—"আমার মত সামান্য মেয়ে কি জন্যে আপনাকে তার কথা জানাবে" ইত্যাদি। কি কথা, বল তো? কিছুই বুঝলাম না···লক্ষীটি না যদি বলো, রাগ করবোই।' (বি র ১০ : ৩৫৮)। সেপ্টেম্বরেরই শেষে, অর্থাৎ ৩রা আশ্বিন কল্যাণীকে লেখা চিঠিতে

আছে, 'ধূমকেতু দেখার সুযোগ ঘটেনি। ছেলেবেলায় হ্যালির ধূমকেতু উঠেছিল শুনেচি মাত্র, কিন্তু তখন খুব ছেলেমানুষ, পাড়াগাঁয়ে থাকি—কেউ দেখায়নি। সে আজ ত্রিশ বছর আগের কথা। তোমার ভাল লাগবে বলে তোমার ফরমাশ মত তো ধূমকেতু উঠতে পারে না।…এখন তোমার বয়স ১৫ তো? ১৫+৪৫= ৬০ বছর যখন তোমার বয়েস হবে, তখন যদি ধূমকেতু দেখতে পাও—আমার কথা মনে হবে কি তখন? আমি তখন মরে ভূত হয়ে যাবো। তুমি তখন বৃদ্ধা, নাতিপুতি-বেষ্টিতা হয়ে গল্প করবে বসে সন্ধ্যাবেলায়। নাতনীকে আঙুল দেখিয়ে বলবে—ওই দ্যাখ রেখা, হ্যালির ধূমকেতু উঠেচে—বিভূতিবাবু বলে একজন লোক আমার ছেলেবেলায় আমায় বলেছিল, এ ধূমকেতু আমি দেখবো। আজ বিভূতিবাবুর কথা তাই মনে পড়চে।' (বি র ১০ : ৩৫৯)

এই অসম বয়সের বাধা পেরিয়ে কিশোরী কল্যাণী যে আর দুমাসের মধ্যেই চল্লিশ পেরনো বিভূতিভূষণের ঘরণী হয়ে উঠবেন, তার কোনো প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত সেই ১০ সেপ্টেম্বরের চিঠিতে নেই। বরং পরবর্তী প্রজন্মের কোনো এক সরল জিজ্ঞাসু প্রতিনিধির সঙ্গে স্নেহময় আদানপ্রদানের রেশই যেন চিঠিতে ছড়ানো আছে। কিন্তু ৩ ডিসেম্বর আসতে তো আর খুব বেশি দেরি নেই। আর ১৯৪০-এর ১১ ডিসেম্বর বিভূতিভূষণ সদ্য পরিণীতা কল্যাণীকে চিঠি দেন, 'প্রিয়তমাসু, উঃ কল্যাণী দেখে কি হাসিই হাসবে। "কল্যাণীয়াসু" পাঠ চলে গেল কি করে এ-ক'দিনের মধ্যে—হয়ে পড়লুম "প্রিয়তমাসু"! …তাই তো কল্যাণী, তুমি শেষকালে আমার স্ত্রী হয়ে পড়লে? আমার যে স্ত্রী আছে এখনও যেন সে-কথা আমার মনেই হয় না, যেন বিশ্বাস হয় না। …মনে মনে কতদিন থেকে তোমার মতই মেয়ে চেয়েছিলুম—স্নেহময়ী, ভাবোচ্ছ্বাসময়ী, সেবাপরায়ণা, সুরসাধিকা…হয়তো বা বহুদূর অতীতের কোন জীবনে মধুর অলস দিনগুলিতে, অজ্ঞাত পথতলে, ভুলে যাওয়া গ্রামসীমার বেষ্টনীর মধ্যে তুমি ছিলে আমার সঙ্গিনী…' (কিশলয় ঠাকুর, ১৯৭৮ : ১৯৭-৯৮)। কেমন মেয়ের স্বপ্ন দেখতেন বিভূতিভূষণ নিজের সহধর্মিণীর কল্পনায়? যে মেয়ে বারাকপুরের মতো গ্রামে সংসার করতে পারবে, যেমন করতেন বিভূতিভূষণের জননী মৃণালিনী? যাকে শীতের ভোরে উঠে নদীতে স্নান করে এসে বড়ি দিতে বলা যায়, যেমন দিতেন বিভূতিভূষণের জননী? যাকে কলসী কাঁখে গ্রামের পথে দেখে, বিভূতিসাহিত্যে ফিরে ফিরে আসা কত পল্লীবধূর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারবেন সেই সাহিত্যের নির্মাতা? যে মেয়ে পুরনো অভ্যাস ভুলে অবগাহন স্নানেও দিনের পর দিন স্বামীর

অনুগামিনী হবে হাসিমুখে? যে মেয়েকে এখনও ছেড়ে যায়নি সেই বয়স, যে বয়সে কিশোরী গৌরী ছেড়ে গিয়েছিল যুবক স্বামী বিভূতিভূষণকে? এমনি সেই মেয়ে, যে গৌণ থেকে গুরুতর কোনো কারণে তিরিশ বছরের বড় স্বামীর বকুনি খেয়ে, চোখের জল ফেলে, পরমুহূর্তেই স্বামীর গায়ে হাত দিয়ে বলে, 'শীগ্‌গির মরে যাবো—তোমার না হয় খুকু ছিল, সুপ্রভা ছিল···আমার সাধ মেটেনি। তুমি ছাড়া আর কে আছে বলো?' অথবা বলে, 'ও মানুকু, আমার একটা পুরুষ-মানুষ তুই। তুই কত মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেচিস্—আমার কে আছে তুই ছাড়া?' (অ. র. : ১২৯, ১৩২)।

কোথায় গেল সে'সব প্রেম? কেনই বা কিশোরী কল্যাণীতেই মধ্যবয়সী বিভূতিভূষণের পরম আশ্রয় মিলল? কল্যাণীর দাদামশায় সারদাকান্ত চক্রবর্তী একসময় খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামের মানুষটিকে। সারদাকান্ত যখন খেলাতচন্দ্র ঘোষ এস্টেটের ভাগলপুর জঙ্গলমহালে কাজ করেন, তখন, দুয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে সেই মহালের অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজার হয়ে গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। কিন্তু এ যোগাযোগ তো ধরা পড়ল সারদাকান্তর দৌহিত্রীর সঙ্গে বাংলার স্বনামধন্য সাহিত্যিকটির সম্পর্ক নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার সমসময়ে। সেই ১৯৩৯-৪০-এর অনেক আগে খুকু অর্থাৎ প্রীতিলতার সঙ্গে বিভূতিভূষণের আলাপ পরিচয়। ১৯৩২ সালে বর্ষামুখর গ্রীষ্মের ছুটিতে খুকুব সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ হয়েছিল (ঊর্মিমুখর, বি র ৩ : ৫২৯)। বারাকপুর গ্রামে বিভূতিভূষণের প্রতিবেশী যুগলপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়েব মেয়ে খুকু। খুকুর আন্তরিক যত্ন, তার সারল্য, তাকে লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা কিংবা গল্প বলা, খুকুর গান, গ্রাম্যজীবনের সংকীর্ণ আবর্তে খুকুর জীবনে যে তেমন আলো এসে পৌঁছল না, তা নিয়ে খেদ বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে কতবার ফিরে ফিরে আসে। 'উৎকর্ণ'-তে আছে, 'মনে হল আমাদের পাড়ার···মেয়েদের কথা। ওরা পরকে ভাবে শেয়াল-কুকুর, কিন্তু নিজেরা যে কিসের মত জীবন যাপন করে তা কি ভেবে দেখেচে? মাঝে পড়ে খুকুটা ওদের মধ্যে পড়ে মারা গেল, একঘেয়েমী ও সঙ্কীর্ণ জীবনের তিক্ততায়।' (বি র ৪ : ৩৬৬)। ১৯৩৪ সালের ১০ জুন বিভূতিভূষণ দিনলিপিতে লেখেন, 'খুকুর সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা কত কথা হোল। আমি বল্লুম, তুই বাঁড়ুয্যে না হোলে তোকে বিয়ে করতুম। ও হাসলে—বল্লে, আপনি চলে গেলে আমার মন পালাই পালাই হবে। ···মেয়েরা না হোলে সৃষ্টি মিথ্যে হোত—কথাটা ঠিক। তেমনি পুরুষ না হোলেই (হোলেও?) তাই।' (অ. দি. : ২৬২)।

সেই ১০ জুনের কিছুদিন আগে, ১৯৩৪-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ নাগাদ 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিক বেরোচ্ছে 'দৃষ্টিপ্রদীপ'। ১০ জুনের পরবর্তী কালে এই উপন্যাসের পাঠক দেখবেন, গ্রামের মুখরা বালিকা হিরণ আকুল অনুনয়ে পাঠশালার মাস্টারমশায় জিতুকে বলবে, 'আপনি বলুন, যাবেন না, মাস্টারমশায়। আমি তখন পাঠশালায় বলতে পারলাম না ওদের সামনে। ওরা হাসবে তাহলে …যাবেন না কেমন?' (বি র ৪ : ১৩৯)। ১৯৩৫-এর মার্চ-এপ্রিল নাগাদ 'প্রবাসী'তে যখন 'দৃষ্টিপ্রদীপ' শেষ হচ্ছে, তখন বিভূতিভূষণের জিতু হিরণের সঙ্গে সংসার পেতেছে। হিরণ স্বামীকে বলেছে, '…তুমি·· বললে—আমাদের গাঁ ছেড়ে চলে যাবে। সেদিন ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গেল। এত কান্না আসতে লাগল, কান্না চাপতে পারি নে, পাছে কেউ টের পায়, ছুটে পেছনের সজ্‌নেতলায় চলে গেলাম। সব যেন ফাঁকা হয়ে গেল মনের মধ্যে। উঃ মাগো, সে যে কি দিন গিয়েছে!' (বি র ৪ : ১৭৭)। আর ১৯৩৯ সালে জিতু-হিরণের স্রষ্টা তাঁর যুগলকাকার হাতে তুলে দিয়েছিলেন পাঁচশ টাকা, খুকুর বিয়ের জন্য। বিয়ে হয়েছিল ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে। (কিশলয় ঠাকুর, ১৯৭৮ : ১৭২)। বিয়ের দিন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত সদ্যপ্রকাশিত 'লিপিকা' পত্রিকাটি হাতে নিয়ে সম্পাদক যখন বারাকপুর গ্রামে পৌঁছলেন, তখন বিকেল পেরিয়ে গেছে। ১৩৪৪-এর ১ আশ্বিন 'চাঁদের পাহাড়'-এর উৎসর্গপত্রে বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন 'খুকুকে দিলাম'। দেওয়া-নেওয়ার একটি অধ্যায় হয়তো ১৯৩৯-এ শেষ, কিন্তু প্রাসঙ্গিক কাহিনীর শেষ সেখানে নয়।

বিয়ের পরে খুকু আর বিভূতিভূষণের অনেকবার দেখা হয়েছে। ১৯৪১-এর ১২ জানুয়ারির দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ লিখেছেন, '…খুকু ও দেবু এসে ডাকলো। বটতলা থেকে বার হবার সময় খুকু বল্লে—চলুন আমরা আলাদা যাই। ওকে দেখলে কষ্ট হয়—যেন একটুখানি মিষ্টিকথার কাঙাল হয়ে পড়েচে।' (অ. দি. : ৩৩৩)। সেই বছরই ২১ জানুয়ারির দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ লিখতেপ ারেন, 'সুপ্রভা—বিশেষ করে খুকুর সম্বন্ধে…কত কথাই ভেবেছিলুম। এবার কল্যাণী এসে সকল অভাব পূর্ণ করেচে। …পশুপতিবাবুর বাড়ী এলুম। …পশুপতিবাবু বল্লেন—যূথিকা দেবী খুকুর চেয়ে কল্যাণীর বেশী প্রশংসা করেচেন। উনি নিজেও কল্যাণীর খুব প্রশংসা করলেন…বল্লেন, খুকুর চেয়ে কল্যাণীকে ভাল লাগলো… কল্যাণী সরলা স্নেহময়ী। খুকুর সারল্য কম; একটু খেলোয়াড় ধরনের।' (অ. দি. : ৩৩৯)। তিনের দশকের শেষের দিকেই হবে, সুপ্রভা দত্তকে লেখা বিভূতি-

ভূষণের একটি তারিখবিহীন চিঠিতে আছে, 'চিঠি দেখানো অনেকদিন বন্ধ করেচি—তোমার এ চিঠিখানা এবার কাউকে দেখাইনি। কেবল খুকু আমার স্যুটকেস্ থেকে লুকিয়ে বার করে পড়েছিল আমি নদীতে মাছ ধরতে গেলে পরশু। আমি এসে ওকে বকেছি। কিন্তু ও কাউকে বলে না, খুব চাপা।' (অপ্রকাশিত)। সুপ্রভা খুকুকে চিনতেন, সুপ্রভাকে লেখা বিভূতিভূষণের চিঠিতে খুকুর প্রসঙ্গ ঘুরেফিরেই এসেছে। খুকুকে যখন কলকাতায় বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ, সুপ্রভার সঙ্গে খুকুর আলাপও হয়েছিল।

১৯৩৮-এর ১ জুন বারাকপুর গ্রামে গরমের ছুটি কাটাতে কাটাতে বিভূতি-ভূষণ সুপ্রভাকে চিঠি লেখেন, 'পাড়ায় এবার কেউ নেই ··খুকু আছে, তাই রক্ষে। খুকু আজকাল বড় হয়েচে, যখন তখন আগের মত আসতে পারে না, পাড়া-গাঁয়ের ব্যাপার তো জানো। তবুও সে সময় পেলেই আসে, গল্প করে, চা করে দেয়···নানা ছলছুতোয় সে আসে—তাও বুঝতে আমার দেরি হয় না। তাকে বই পড়ে শোনাই। আমার কাছ থেকে বই পত্রিকা নিয়ে গিয়ে পড়ে। তারও নিঃসঙ্গ জীবন, সে একটু অন্য ধরণের মেয়ে, পাড়াগাঁয়ের অন্য পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে তার তেমন মিশ খায় না। তাকে "অরন্ধনের নিমন্ত্রণে"র কুমু বলাতে সে তোমার ওপর রাগ করেচে—আজ সকালে বলছিল : সুপ্রভাদি বুঝি ভাবেন আমি ঐ কুমুর মত বাচাল ? (অথচ সত্যিই খুকু যখন বকতে সুরু করবে, তার মুখের বিরাম থাকে না, তবে আজকাল বয়েস হয়ে একটু যেন কমেচে) বলছিল, সুপ্রভাদি আমায় তো একখানা দুলাইনের পত্র দিলেও পারতেন, আমায় ভুলে গেলেন—ইত্যাদি।' (অপ্রকাশিত)। খুকু যে লেখাপড়া করতে চায়, গল্প শুনতে চায়, এমন উল্লেখ দিনলিপিতেও আছে, যখন বিভূতিভূষণ খুকুকে ক্লিওপেট্রা কি রিপ ভ্যান উইঙ্কলের গল্প শোনানোর কথা লিখতেন। আর একবার, সুপ্রভা বোধহয় বিভূতিভূষণকে শিলঙে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। খুকুর তখন খুব অসুখ। এই সূত্রে যে চিঠিটি প্রাসঙ্গিক, তার তারিখ নেই, এমনকী প্রথম অংশটিও পাওয়া যায়নি, দেখতে পেরেছি কেবল চিঠির মধ্যভাগ থেকে শেষ পর্যন্ত। সেখানে আছে, 'আমি না দেখলে ও ঠিক মরে যেত। আমাদের এই সব পাড়াগাঁয়ে এমনি অবস্থা। এখানে জ্বর হয়, খায় দায়, বেড়িয়ে বেড়ায়, অবশেষে যখন শয্যাগত হয়ে পড়ে, তখন ডাক্তার ডাকে। অনেকদিন রোগে ভুগে খুকুর শরীরে কিছু নেই। আমি না ব্যবস্থা করলে মানুষও দেখচি নে। এইসব নানা কারণে বড় গোলমালে পড়ে গিয়েচি, সুপ্রভা। নইলে তোমার বিষণ্ণ মুখের সময়ও আমার তো একটা কর্ত্তব্য

আছে, শুধু তোমার হাসিমুখ দেখবার সময় যেতে চাইবো আর বিষণ্ণ মুখের সময় দূরে থাকতে চেষ্টা করবো, সে রকম স্বার্থপর নই আমি। কি যে করি! তোমাদের কলেজ বন্ধ হওয়ার আগে আমার শিলং যাওয়া সম্ভব হয়ে উঠবে না। ···তোমাকেও কি আমার দেখতে ইচ্ছে হয় না? ···তোমাকে একটীবার দেখবার আগ্রহেই তো শিলং ছুটে গিয়েছিলুম। যদি তুমি ধরো রাণাঘাট কি বর্দ্ধমান কি কৃষ্ণনগর এম্‌নি কোনো জায়গায় থাকতে, আমি প্রতি সপ্তাহে তোমার সঙ্গে দেখা করতুম—কিন্তু শিলং কি এখানে?' (অপ্রকাশিত)।

১৯৩৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী সুপ্রভা দত্ত শিলং শহরে লেডি কীন কলেজে অধ্যাপিকার কাজ নিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৩২ সালে যখন সিলেটের মিরাশি গ্রামের রায়সাহেব মহেন্দ্রচন্দ্র দত্তের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান সুপ্রভা এম.এ. পড়তে কলকাতায় এসেছিলেন, তখন তাঁর স্থানীয় ঠিকানা ছিল বৌদির বাপের বাড়ি, থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী-আবাসে। কলকাতার বেথুন স্কুল এবং বেথুন কলেজ থেকে যথাক্রমে ম্যাট্রিক আর ইন্‌টারমিডিয়েট পাস করেছিলেন সুপ্রভা। ১৯৩২-এ সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে দর্শনে অনার্সসহ বি.এ. পাস করেছিলেন। সুপ্রভার হাতে লেখা পত্রিকা 'নির্ঝর'-এর সুবাদেই বিভূতিভূষণের সঙ্গে তাঁর আলাপ। ১৯৩২ সালে সুপ্রভার বৌদির এক ভাই এই যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। তার বন্ধু খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশনে বিভূতিভূষণের ছাত্র, তার মাধ্যমেই বিভূতিভূষণ-সুপ্রভার পরিচয় হল। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২৪শে আশ্বিন গোপালনগর-বারাকপুর থেকে বিভূতিভূষণ সুপ্রভাকে প্রথম চিঠি লেখেন, '···তোমার পত্রখানা একটু দেরীতে আমার হাতে এসেচে। ···সেদিন তোমাদের হোস্টেলে গিয়ে তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছিলাম···সেটা আমাকে জানানোর সুযোগ দেওয়াতে আমি বাস্তবিক কৃতজ্ঞ। ···আমি আজই কল্‌কাতা যাবো, সেখান থেকে এলাহাবাদ যাবো বড়-মামার কাছে, কিন্তু সপ্তাহখানেকের মধ্যেই কল্‌কাতায় ফিরবো এবং বাকী ছুটীটা সেখানেই কাটাবো। সেই অবসরে তোমার কাগজের জন্যে লিখ্‌বো।' (অপ্রকাশিত)।

সুপ্রভার সঙ্গে সখ্যের বাঁকে বাঁকে এই প্রথম আলাপের কথা ফিরে ফিরে আসে। যেমন, 'তুমি জানো, বীরেন বলে আমার একজন ছাত্র তোমার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবার মূলে ছিল। এখন সে কিছুই করে না। পাশ টাশ করতে পারে নি। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা হয়···তাকে দেখলেই আমার মনে হয় এ আমার

মস্ত উপকার করেচে, সুপ্রভার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েচে। ওর কাছে মনে মনে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো সেজন্যে।' (অপ্রকাশিত)। অথবা, '…কোথায় তোমার বাড়ী সিলেটে আর আমার বাড়ী যশোর জেলায়, কি করে এমন পরিচয় ঘট্‌ল তোমার সঙ্গে? …আমার এক ছাত্র এসে বল্লে ওমুক হোস্টেলে মেয়েরা আপনাকে একবার যেতে বলছিল—যাবেন? গেলাম। তোমায় তখন চিনি নে। আমার সঙ্গে কে যে এসে আলাপ করে দিল, তাও আমার এখন মনে হয় না। তারপর তুমি চিঠি লিখলে—সেই চিঠি খানা পড়েই আমার বড় ভাল লাগলো—মনে আছে তোমায় প্রথম পত্রেই "তুমি" সম্বোধন করে চিঠি দিয়েছিলুম। আমি কখনো অপরিচিতা বা অর্দ্ধপরিচিতা মেয়েদের "আপনি" ছাড়া বলি নে বা লিখি নে। তোমার চিঠি পেয়ে কি জানি কি মনে হোল তোমাকে "আপনি" লিখতে পারলাম না…হয়তো কোন্ দেশে কোন্ দূর জন্মান্তরে তুমি ছিলে অত্যন্ত পরিচিতা, অত্যন্ত আপন, এ জন্মে যোগাযোগের সহজ সূত্রের মধ্যে দিয়ে আমার মধ্যের যে মন দেশ, কাল ও মৃত্যুর অতীত, সে তোমায় চিনতে পেরেছিল।' (অপ্রকাশিত)।

এই উষ্ণতার আখ্যানকে সুপ্রভার কাছে লেখা বিভূতিভূষণের পত্রাবলীর ভিতর থেকে আরো ভালো পড়া যেত, যদি বিভূতিভূষণের চিঠিগুলিতে সন-তারিখ নিয়মিত থাকত। কিন্তু অনেক চিঠির মতো উপরের চিঠি দুটিও তারিখবিহীন। ১৯৩৮ সালের ৬ জানুয়ারি হঠাৎ বিভূতিভূষণের কী মনে হল, সুপ্রভাকে লিখলেন, 'একটা কথা, এখন থেকে চিঠিতে সন তারিখ দিও। আমিও দিলাম। শুধু "শনিবার" কি "রাত্রিকাল" এমন চিঠি থাকলে এর পরে চিঠির সন তারিখ বোঝা যাবে না—পুরোনো চিঠি পড়বার সময়।' (অপ্রকাশিত)। যে সম্পর্কের অনুষঙ্গে এমন বহু চিঠি লেখা হয়েছিল, যা নাকি বিভূতিভূষণের, নিশ্চয় সুপ্রভারও, বারবার পড়ে দেখবার সাধ হত, সেই বিনিময়ের প্রবাহে মিশে ছিল সুপ্রভার বিশিষ্ট গুণাবলী। তার গলার গান, 'যৌবনসরসী নীরে' কিংবা 'দ্বার খুলে আর রাখব না', তার হাতে তৈরি বালিশঢাকা, রুমালের নকশা কিংবা বিজয়ার চিঠির ফুলের কেয়ারি, যা দেখে বিস্মিত হত বারাকপুর গ্রামের ন'দি, পাঁচী কিংবা খুকু—তারা তো এমন জিনিস আগে দেখেনি কখনও। সুপ্রভা তো এমনি বন্ধু, যাকে লেখা যায় বৈজ্ঞানিক জেমস জিন্‌স-এর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়-বিনিময়ের কথা, কলকাতার বিজ্ঞান কংগ্রেস নিয়ে নিজের আগ্রহ, উত্তেজনার কথা। 'প্রবাসী'তে 'আরণ্যক' পড়ে সুপ্রভা যখন 'আরণ্যক'-এর স্রষ্টাকে তার কিছু কিছু অপছন্দের কথা জানায়, বিভূতিভূষণ উত্তরে লেখেন, '"আরণ্যক" সম্বন্ধে তুমি যা লিখেচ তা

আমি মনে রাখলুম। তোমার মতামতের ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে। ...কোথায় কোথায় একঘেয়ে মনে হয় আমায় লিখবে? কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, "আরণ্যক" ঠিক thriller শ্রেণীর বই নয়—আর একটা কথা, উপন্যাস একটু reposeful হওয়াটা আমি পছন্দ করি। অনেক নাম-করা উপন্যাসের অনেক dull pages আছে, সে তুমিও জানো।' (অপ্রকাশিত)।

যে বান্ধবীর সঙ্গে এমন ভাষায় বিনিময় সম্ভব, তাকে তো বিশিষ্ট, এমনকী অনন্য মনে হওয়া স্বাভাবিক সেই তিনের দশকে। বিশেষত বিভূতিভূষণের পক্ষে, যিনি বারাকপুর গ্রামে কথকব্রাহ্মণের উত্তরাধিকার থেকে কলকাতার সংস্কৃতি-জগতের এই ভাষা অর্জন করতে হেঁটেছেন অনেক দুর্গম পথ। আবার এরকম বিনিময়ে অংশ নেওয়ার ক্ষমতা যে বান্ধবীর আছে, যিনি নাচে-গানে-হাতের কাজে-কবিতায়-ব্রাউনিং-এর অনুবাদে-লেডি কীন কলেজের অধ্যাপনায় এত বেশি হয়ে উঠেছেন বিভূতিভূষণদের বহির্জগতের সহযাত্রিনী, তাকে তো বাঁধা যায় না বারাকপুর গ্রামে মৃণালিনীর উত্তরাধিকারে চিহ্নিত কোনো সাংসারিক দৈনন্দিনে। অবগাহন স্নান অথবা শীতের সকালে উঠে চান করে কাঁপতে কাঁপতে বড়ি দেওয়ার অনুরোধ করবার পক্ষে সুপ্রভা যে বড় বেশি আধুনিক, বড় বেশি সেই আলোর জগতের অংশীদার, যে আলোর স্বপ্ন নিয়ে বারাকপুরের বিভূতি একদিন বনগ্রামের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন। বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত' যে বছর প্রকাশিত হয়েছে, সেই ১৯৩২-এ সুপ্রভার সঙ্গে বিভূতিভূষণের আলাপ। ১৯৩৮ সালের ১০ অক্টোবর বিভূতিভূষণ বারাকপুর গ্রাম থেকে সুপ্রভাকে শিলঙে চিঠি লেখেন, 'কত লোকের অর্থাৎ কত মেয়ের সঙ্গে তো তারপর আলাপ হোল—কিন্তু তোমার সঙ্গে প্রথম আমলের যে ভালবাসা, এমনটি আর হোল কৈ আর কারো সঙ্গে? তা হয় না। একজায়গায় একবার হোলে দু'জায়গায় হয় না। আমি কথাটা এতদিন ভাল বুঝতাম না—আজকাল বুঝি।' (অপ্রকাশিত)।

এইসময়, ১৯৩৮-এর অক্টোবর মাস থেকে সজনীকান্ত দাস এবং পরিমল গোস্বামী সম্পাদিত 'অলকা' পত্রিকায় ছাপা হচ্ছিল বিভূতিভূষণের 'বিপিনের সংসার' উপন্যাস। আশ্বিন ১৩৪৫ থেকে ভাদ্র ১৩৪৬ উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ-কাল। (বি র ৬ : ৪৫৭)। 'বিপিনের সংসার'-এ মানীর ভালোবাসায় শুভেচ্ছায় উদ্বুদ্ধ বিপিন ভাবে, 'ভালবাসা এমন জিনিস, যাহা কখনও দু নৌকায় পা দেয় না। হয় এ নৌকা, নয় ও নৌকা। কত মেয়ে তো আছে জগতে, কত মেয়ে তো সে নিজেই দেখিল, কিন্তু মানীর মত মেয়ে সে কোথাও দেখে নাই। আর কাহারও

দিকে মন যায় না কেন?' (বি র ৬ : ২৮৫)। কিন্তু উপন্যাসের পাঠক জানেন যে, বিভূতিজীবনের সুপ্রভার তুল্য কোনো বাহিরের স্বাবলম্বন থেকে বিভূতি-সাহিত্যের মানী একেবারে রিক্ত। বিপিনও অপূর্বকুমারের অথবা বিভূতিভূষণের জ্ঞানপিপাসার প্রান্তদেশেও পৌঁছতে পারেনি।

তবে কি যে কারণে সুপ্রভাকে এত বেশি বিশিষ্ট মনে হয়, সেই একই কারণে বিভূতিভূষণ তাকে নিকটতর বন্ধনের বন্ধু করতে পারেন না? নাকি ১৯৪০-এর ২৯ এপ্রিল সুপ্রভার বিবাহের অনুষঙ্গে বিভূতিভূষণকে ছুঁয়ে গিয়েছিল কোনো চেয়ে না-পাওয়ার যন্ত্রণা? অথচ এতেও তো কোনো ভুল নেই যে মধ্যবয়সী বিভূতিভূষণ কিশোরী কল্যাণীকে নিয়ে ভরে উঠেছিলেন! দিনলিপিতে লিখে-ছিলেন, '...আজ আমার কি ভাগ্য যে এই সাতভেয়েতলায় বেড়াতে এসেচি—কল্যাণীও সঙ্গে আছে। এমন যে হবে কখনো ভেবেছিলুম? কল্যাণী হাসিতে গানে সমস্ত ভরিয়ে রেখেচে।' (অ. দি. : ৩৩৪)। অথবা 'বারাকপুরে কল্যাণী ও আমি রোজ নদীর ঘাটে নাইতে যাই দু'বেলা। ওপারে মাধবপুরের চরের দৃশ্য বড় সুন্দর। ...কল্যাণীর কাছে গৌরীর কথা বল্লুম...কাল ছিল সেই দিন, যেদিন বহু-কাল আগে আমি মাঝেরগাঁ থেকে হেঁটে এসেছিলুম, গৌরীকে প্রথম নিয়ে এসেছিলুম এই গাঁয়ে। ...অনেকদিন পরে আকাঙ্ক্ষিত বারাকপুরের জীবনকে আবার ফিরিয়ে পেয়েচি। ...নতুন সংসার নতুন ঘর-কন্না। এই চেয়ে এসেছিলুম বহুদিন থেকে।' (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৪৮৪-৮৫)।

একই দিনলিপিতে আছে সুপ্রভার বিবাহের সংবাদ, বিয়ের পরে লুকিয়ে সুপ্রভা চিঠি লিখছে, এই খবর (বি র ৪ : ৪৫৭)। ছিল আকুলতা, '...সুপ্রভার দুঃখ কে দূর করবে? তার মন তো সাধারণ মেয়ের মন নয়—সে যে চিরজীবন কাঁদবে, তার কি উপায় করব?' (বি র ৪ : ৪৫৯)। আবার আছে এমন কথাও যে, 'জন্মাষ্টমীর ছুটিতে ঘাটশিলার বাড়ীতে এসেচি। বাড়ী এসেই সুপ্রভার চিঠি পেলাম। কি ভাল মেয়ে ও, তাই ভাবি। Always a loyal friend...' (বি র ৪ : ৪৬৫)। অবশ্য 'উৎকর্ণ' দিনলিপি পাঠকের দরবারে এসেছিল বিভূতিভূষণের জীবনকালেই। সেখানে সম্পাদনার সুযোগ, প্রয়োজনমতো সার-সংক্ষেপ, বিস্তার, যোগ-বিয়োগ সবই তো দিনলিপিকারের আয়ত্তের ভিতরে। সুপ্রভাকে নিয়ে বিভূতিভূষণের মনে প্রসাদের কোনো ঘাটতি এই দিনলিপির অন্তর্গত নয়। সুপ্রভার বিয়ের পরে সুপ্রভার জন্য নাকি জীবনভর কান্নাই শুধু রইল, এমন অনুভবে বিভূতিভূষণের বেদনা কিংবা খেদ সেখানে প্রত্যক্ষ। কিন্তু

সুপ্রভার বিবাহে বিভূতিভূষণের নিজের জন্য কোনো দুঃখবোধ ছিল কি না, সে-বিষয়ে কোনো পরোক্ষ ইঙ্গিতও নেই। আবার যে অপ্রকাশিত দিনলিপি বিভূতি-ভূষণের মৃত্যুর অনেক পরে পাঠকের হাতে এসেছে, সেখানে ১৯৪১-এর ৬ জানুয়ারি হঠাৎ লেখা হয়েছে, 'সুপ্রভা যেন বাড়ীর মালিক, আমি ওর বাসাতে ওর ছেলে স্কুলে ভর্তি করতে অনুরোধ করতে এসেচি।' (অ. দি.: ৩৩০)।

১৯৪০-এ বিভূতিভূষণের দ্বিতীয় বিবাহের কথা নথিভুক্ত করতে গিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের বেশ কিছু উপকরণ সাজিয়ে ফেললাম। পাঠকের যেন মনে না হয় যে ১৯৩১-৪০-এর দশকটিকে আমরা বিভূতিজীবনের ব্যক্তিগত টানাপোড়েনের দশক হিসেবেই কেবল ভাবতে চাইছি। তেমন প্রচেষ্টা বিভূতিসাহিত্যের পাঠককে দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় চিহ্নিত করে, বিভূতিজীবনীকারের কর্তব্যও সেখানে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই দশকে সাংসারিক দায়দায়িত্ব যেমন ছিল বিভূতিভূষণের, ছিল জীবিকার একান্ত প্রয়োজন, তেমনি ছিল ভ্রমণের আনন্দ, বিভিন্ন সভা-সমিতি সম্মেলনে যোগদান, অভ্যর্থনা, সংবর্ধনার আড়ম্বর। পত্রিকার সম্পাদনা, অন্তত সম্পাদক হিসেবে নিজের নামটি ব্যবহার করতে দেওয়ার অনুমতি, কিশোর-সাহিত্যের আসরে বিভূতিভূষণের প্রবেশ এবং প্রতিষ্ঠা, এসবই তো এই দশকের ঘটনা। আর এই সবের সঙ্গে সাহিত্যসৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ। 'অপরাজিত' লিখতে লিখতে যে দশক শুরু হয়েছিল, তা শেষ হল 'বিপিনের সংসার', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'-এর সমাপ্তিতে, 'কেদার রাজা'র সূচনায়। 'দৃষ্টিপ্রদীপ' কিংবা 'আরণ্যক'-এর মতো উপন্যাস, অসংখ্য প্রথম সারির ছোটগল্প, সবই তো তৈরি হয়েছিল এই তিনের দশক ব্যেপে। এই অসামান্য স্বভাব-সাহিত্যিকের জীবনকে, তাঁর জীবন আর তাঁর নির্মাণের যোগাযোগকে, তার যুক্তিকে বুঝবার তাগিদেই আমরা ফেলে দিতে পারি না কিছু তথ্য; বারাকপুর গ্রামের প্রাণোচ্ছল কিশোরীকে চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই বিভূতিভূষণ বলতে পারেন যে বাঁড়ুয্যে না হলে সেই কিশোরীকে তিনি বিয়ে করতেন, আর সেই বলার কথা লিখেও রাখতে পারেন নিজের ডায়েরিতে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত, শিলঙের লেডি কীন কলেজের অধ্যাপনায় চিহ্নিত সুপ্রভা দত্তকে লেখা চিঠিগুলিতে বিভূতিভূষণের অন্তরঙ্গ আকুলতা মিশে থাকে; সুপ্রভাকে নিয়ে সেই উষ্ণতা দিনলিপিতে যেন সশ্রদ্ধ সম্ভ্রম আর প্রসাদের আড়ালে নিজের জন্য কোনো নিভৃতি খোঁজে।

১৯৩৪ সালের ১১ মে বিভূতিভূষণ দিনলিপিতে লিখেছিলেন, 'ট্রামে সুপ্রভাদের হোস্টেলে। সুপ্রভা বল্লে আপনাকে খাওয়াতে ভাল লাগে।' (অ. দি.:

২৫০)। আর শেষপর্যন্ত কিশোরী কল্যাণীর সারল্যে, নির্ভরতায়, গৃহস্থালীতে, প্রেমে, সেবায় জীবনের সব চাওয়ার বাড়তি পাওয়া। নৈহাটি ব্যারাকপুরে বাপের বাড়িতে কল্যাণীকে রেখে একবার বারাকপুর গ্রামে কয়েকদিন ছিলেন ১৯৫০-এর অগাস্ট মাসে ; বাবলুব তখন তিনবছব হয়নি। ২৭ আগস্ট ১৯৫০-এর দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ লিখছেন, 'কল্যাণীর কথা মনে হয় খেতে গিয়ে। এরা রাঁধতে পারে না। সে কত বেশি তরকারী দিত।' (অ. র. : ২৯৭)। এই পরিক্রমা তো সেই সাহিত্যিকেরই যিনি 'পথের পাঁচালী'তে শুরু করে শেষ করেছিলেন 'ইছামতী'তে! তবে কি জীবনের যুক্তিকে সাহিত্যের যুক্তির থেকে অনেকসময়ই আলাদা করা যায় না, অন্তত বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে?

সাহিত্যে সাফল্য দৈনন্দিনে অনিশ্চয়

তিনের দশক শুরু হওয়ার আগে থেকেই 'পথের পাঁচালী'র লেখক বঙ্গসংস্কৃতির বিশিষ্ট অংশীদারদের কাছে যথেষ্ট মনোযোগ আদায় করে নিয়েছেন। অমিয় চক্রবর্তী লিখেছেন শান্তিনিকেতন থেকে, 'বই পড়ে গ্রামখানি দেখতে ইচ্ছা হয়··· শিল্পীর সৃষ্ট গ্রামখানি শাশ্বতকালের, জানি না ভৌগোলিক গ্রামখানা কি রকম দেখবো।' (তৃণাঙ্কুর, বি র ২ : ১৯৯)। সেসময় 'অপরাজিত' লেখা হচ্ছে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস একদিন বিভূতিভূষণের সঙ্গে 'পথের পাঁচালী'র দেশ দেখতে গেলেন বারাকপুর গ্রামে (তৃণাঙ্কুর, বি র ২ : ১৯৩)। তখন লেখা হচ্ছে 'অপরাজিত' উপন্যাসের বনভ্রমণেব অধ্যায় (তৃণাঙ্কুর, বি র ২ : ১৯৬)। বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটে রমেশচন্দ্র সেনের সাহিত্য সেবক সমিতির আড্ডা, 'প্রবাসী'-'বিচিত্রা'র আড্ডা (সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকা শুরু হতে হতে অবশ্য ১৯৩৩ সাল পড়ে গেছে), খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশনের চাকরি, মাঝেমধ্যে বারাকপুর গ্রামের প্রকৃতি আর মানুষ, এইসব নিয়ে তখন বিভূতিভূষণের প্রাত্যহিক। 'অপরাজিত' উপন্যাস যে কেমন করে বিভূতিভূষণের মনে মনে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, তার আভাস ওই 'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপিতেই মিলে যায়।

সেখানে আছে, 'আজ অনেকদিন পরে দেশে ফিরেচি···এইমাত্র আমাদের ভিটাটাতে বেড়াতে গিয়েছিলাম—এক টুকরো রেশমী সবুজ চুড়ির টুকরো চোখে পড়ল···হয়তো মণির। মনে হল মায়ের স্মৃতি ভিটার সঙ্গে যেন মাখা। মা এই বৈকালে ঘাট থেকে গা ধুয়ে ফর্সা কাপড় পরে এসে আমাদের খাবার দিচ্চেন—

এই ছবিই বার বার মনে আসে। আজ সব জঙ্গল. নিবিড় বনভূমি হয়ে পড়ে আছে ! মায়ের সেই সজনে গাছটা আছে, সেই কড়াটা—আশ্চর্য, পাঁচিলের সেই কুলুঙ্গি দুটো চমৎকার আছে, এখনও নতুন।' (বি র ২ : ২০০-০১)। মণি তো বিভূতিভূষণের সেই বোন, যার অকালমৃত্যু হয়েছিল ; যাকে 'পথের পাঁচালী'র দুর্গার উৎসে মেলাতে চেয়েছেন বিভূতিগবেষক (সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৭০ : ৬২)। যদি পাঠক ফিরে দেখেন 'অপরাজিত' উপন্যাসে, আড়াই দশক বাদে নিশ্চিন্দিপুরে ফিরে অপূর্বকুমার পুরনো ভিটে দেখতে গেছে—'এইখানে খিড়কীদোরটা ছিল, চিহ্নও নাই কোনও। ...পাঁচিলের সেই ঘুলঘুলিটা আজও নতুন অবিকৃত অবস্থায়...বালিচুণ একটুও খসে নাই, যেন কালকের তৈরী—এই জঙ্গল ও ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কি হইবে ও কুলুঙ্গিতে ? ...মায়ের হাতে পোঁতা সজনে গাছ এখনও আছে। যাইবার বছরখানেক আগে মাত্র মা ডালটা পুঁতিয়াছিল...মনে হয় এ বন, এ স্তূপাকার ইটের রাশি, এ সব স্বপ্ন—এখনি মা ঘাট হইতে সন্ধ্যায় গা ধুইয়া ফিরিয়া ফরসা কাপড় পরিয়া ভিজা কাপড়খানা উঠানের বাঁশের আলনায় মেলিয়া দিবে, তারপর প্রদীপ হাতে সন্ধ্যা দিতে দিতে তাহাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিস্মিত অনুযোগের সুরে বলিয়া উঠিবে—এত সন্ধ্যে করে বাড়ি ফিরলি অপু ? ...উঠানের মাটির খোলামকুচির মধ্যে সবুজ কাচের চুড়ির একটা টুকরা পাওয়া গেল। হয়ত তার দিদির হাতের চুড়ির টুকরা। —এ ধরনের চুড়ি ছোট মেয়েরাই পরে...এক জায়গায় আধখানা বোতল ভাঙা—ছেলেবেলায় এ ধরনের বোতলে মা নারিকেল তৈল রাখিত—হয়ত সেটাই। ...রান্নাঘরের ভিটার ঠিক যে কোণে মা রাঁধিবার হাঁড়িকুঁড়ি রাখিত—সেখানে একখানা কড়া এখনও বসানো আছে, মরিচা ধরিয়া বিকৃত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মাটিতে বসিয়া যাওয়ার দরুন একটুও নড়ে নাই...চব্বিশ বৎসর পূর্বে, মা এঁটো কড়াখানাকে ওইখানে বসাইয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল—কে কোথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ওখানা ঠিক আছে এখনও।' (বি র ৩ : ১৭০-৭১)।

বিভূতিদিনলিপির আগ্রহী পাঠক জানেন, অপুর মায়ের, না হোক বিভূতির মায়ের এই কড়াই কল্যাণীর কাছে বিগ্রহের মর্যাদা পেয়েছিল। ১৯৪১-এর ২৪ এপ্রিল বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে কল্যাণীর লেখা আছে 'বাবার পুথি ও মায়ের কড়া ঝেড়ে মুছে সাজাই। প্রণাম করি।' (অ. দি. : ৩৪৭)। আজও সেই কড়া নৈহাটি-ব্যারাকপুরে বিভূতিভূষণের উত্তরপুরুষদের সংসারে সযত্নে রক্ষিত হচ্ছে। যদিও 'তৃণাঙ্কুর' পাঠকের কাছে এসেছে 'অপরাজিত'র অনেক পরে, এবং এই

দিনলিপি প্রকাশের আগে ইচ্ছেমতো যোগ-বিয়োগের সুযোগ বিভূতিভূষণ পেয়েছিলেন, এমন ভাবনায় কোনো ভুল নেই, তবু 'অপরাজিত'র গড়ে ওঠার একটা আলেখ্য দিনলিপির মধ্যে পড়ে নিতে তো একধরনের ভালো লাগা পাঠক-গবেষককে ছুঁয়ে যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের বিশিষ্টতার প্রসঙ্গে অনবদ্য বলেছিলেন, গাছ না চিনিয়ে যে সাহিত্য একেবারে বন চেনাতে চায়, বিভূতিসাহিত্য তার বিপরীত মেরুর শিল্প (আনন্দবাজার পত্রিকা, নভেম্বর ৩, ১৯৫০)। কিন্তু সেই তারাশঙ্করেরই খুব আপত্তি ছিল বিভূতিভূষণের দিনলিপি গ্রন্থাকারে প্রকাশ হওয়া নিয়ে। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যকে বলেছিলেন তারাশঙ্কর, 'বিভূতির ডাইরি ছাপচো কেন, বিভূতি কি রামকৃষ্ণ পরমহংস বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়েচে!' (গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, ১৯৮৯ : ৩৬)। ভাগ্যিস এমন মন্তব্যে পিছিয়ে যাননি মিত্রালয়ের তরুণ প্রকাশক! বিভূতিজীবনের ১৯৩১-৪০ দশকটি নিয়ে গবেষকের সমস্যা তবে আরও বাড়ত। এই দশকে সন-তারিখ সংবলিত দিনলিপি তো পাওয়া যায় মাত্র দু'বছরের, ১৯৩৩ আর ১৯৩৪।

'অপরাজিত' শেষ হল। বিভূতিভূষণ দিনলিপিতে লিখলেন, 'সাধনা চাই। আমি টুইশানি ছেড়ে দেব। অপরাজিত তো শেষ হয়েচে—এইবার ছাপা আরম্ভ হবে—কিন্তু এইসময় সাধনা চাই।

(১) ভাল ভাল উপন্যাসকার ও ছোটগল্প লেখকদের পুস্তক পাঠ।

(২) ইতিহাস, Biology ও Astronomy সম্বন্ধে আরও বই পড়া

(৩) Philosophy সম্বন্ধে আধুনিক চিন্তাবীরদের বই পড়া।

(৪) Sir Thomas Browne ও Anatole France-এর বই আরও ভাল করে পড়া।

(৫) চিন্তা, ভ্রমণ, গল্প ও আড্ডা—ভাল সম্প্রদায়ে।

(৬) পল্লীতে যাওয়া ও Quaint ধরনের লোকের সঙ্গে আলাপ। সাধনা ভিন্ন উচ্চ Outlook কি করে develop করবে? খানিকটা মাত্র আমার করেচে—আরও চাই—আরও অনেক চাই।' (তৃণাঙ্কুর, বি র ২ : ২০৩)। নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর বন্ধু বিভূতিবাবু সম্বন্ধে লিখেছেন, 'I acquired a great respect for his mind, which had a wide range of interests. But I certainly did not expect a young Bengali of his class and education to show interest in astrophysics and human palaeontology, which he did. He would talk to me of E. P. Hubble, the astro-

nomer at Mount Wilson Observatory, and his theories, although he had never been a student either of mathematics or physics... Bibhuti Babu also showed me Sir Arthur Keith's *Antiquity of Man,* which in spite of his want of means he had bought.' (Chaudhuri, 1987 : 88)

কিন্তু এ তো দুয়ের দশকের কথা, যখন 'পথের পাঁচালী'র প্রাথমিক নির্মাণ শুরু হয়েছে কি হয়নি, 'অপরাজিত' আরও সুদূর কোনো ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে আছে। আর 'অপরাজিত' শেষ করে বিভূতিভূষণ কেমন করে দেখতে চান নিজের মুখ? দিনলিপিতে দেখি, '১৯২৫ সালের, কি ১৯৩২ সালের আমি···বর্তমান আমি কি এক? অনেক বেড়েচি—সেটা বেশ বুঝতে পারি—এই দুঃখ, খাটুনি, কম মাইনে, ছেলে-পড়ানোর মধ্য দিয়েও বেড়ে উঠেচি। মানুষ কখন কিভাবে কোন্ অবস্থার মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠে—তা কেউ জানে না।' (তৃণাঙ্কুর, বি র ২ : ২০৪)। 'অপরাজিত' ছাপাও একদিন শেষ হয়। বিভূতিভূষণ ডায়েরিতে লেখেন, 'আজ একটা স্মরণীয় দিন···সকালে উঠে সজনী দাসের বাড়িতে চলে গেলাম··· "অপরাজিত"র শেষ ফর্মার প্রুফ দেখবার জন্যে। ···১৯২৪ সালের পূজার সময়টা থেকে এ পর্যন্ত প্রায় সব সময়ই এই বই-এর কথাই ভেবেচি। ১৯২৬ সাল থেকে শুরু করে ১৯৩২-এর ১০ই মার্চ পর্যন্ত এমন একটা দিনও যায় নি, যখন আমি এ বইখানির কথা না ভেবেচি···' (তৃণাঙ্কুর, বি র ২ : ২০৭)।

১৯৩২ সালের এপ্রিলের ২৩ তারিখে কলকাতার বাদুড়বাগানে বন্ধু নীরদচন্দ্রের বৌভাতের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ, দুই খণ্ড 'অপরাজিত' উপহার নিয়ে। নববধূ অমিয়ার হাতে উপহার দিয়ে বলেছিলেন, 'আসবো আরেকদিন শিগ্‌গিরই, তখন গল্পসল্প হবে।' নীরদচন্দ্র তখন 'প্রবাসী'তে কাজ করেন, থাকেন ভবনাথ সেন স্ট্রিটে। একতলায় দু-খানা ঘর নিয়ে থাকেন নীরদচন্দ্র আর তাঁর দুই ভাই, দোতলায় মা-বাবাকে নিয়ে থাকেন গোপাল হালদার। নীরদচন্দ্রের বিয়ের দু-দিনের মধ্যেই অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল ধরপাকড়ের মধ্যে পুলিশ গোপাল হালদারকে গ্রেপ্তার করে। সেই যে লবণ আন্দোলনের সূত্রে বিভূতিভূষণ এবং গোপাল হালদারের মতভেদ, যার উল্লেখ আগেই করেছি, তারই পরিণামে ১৯৩২-এ বিভূতিভূষণ যখন 'অপরাজিত'র স্রষ্টা, গোপাল হালদার তখন রাজবন্দী। কেমন ছিল সেই যশের প্রান্তে সদ্য উত্তীর্ণ সাহিত্যিকটির জীবনযাত্রা? অমিয়া চৌধুরাণীর স্মৃতিকথায় আছে, 'নিজের বেশভূষার দিকে কোনদিন

কোন লক্ষ্য ছিল না। কোনদিন জুতো পালিশ করাবার কথা ভাবতেন বলে সন্দেহ। পারতপক্ষে নিজের পয়সা দিয়ে কখনও সিগারেট কিনে খেতেন না। আমাদের বাড়ি বিড়ি খেতে খেতে এসে ঢুকতেন এবং দোরগোড়ায় জুতো খুলে রাখতেন। আসামাত্র আমি অ্যাশট্রে এগিয়ে দিয়ে বলতাম—"ওটা ফেলুন দেখি!" তারপর চাকরকে ডেকে বলতাম, "যা, বাবুর জন্যে সিগারেট নিয়ে আয়, আর জুতোটা ভাল করে পালিশ করে দে।" চাকর সিগারেট নিয়ে এলে দিব্যি আনন্দে সিগারেটটি তুলে নিয়ে দেশলাই জ্বেলে ধরাতেন এবং এরপর চা ও খাবারের সঙ্গে গল্পে মেতে যেতেন। এরকম প্রায়ই হত।' অবশ্য এ সিগারেট বিভূতিভূষণ তাড়াতাড়ি পুড়ে যাওয়ার ভয়ে পাখা বন্ধ করে খেতেন বলে অমিয়া চৌধুরী লেখেননি, কিন্তু তাঁর আপাতকার্পণ্যের তেমন বর্ণনা বিভূতিভূষণের বহু পরিচিতজনের স্মৃতিকথায় মিলে যায়। নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অমিয়া জানতেন, সাধারণত ভ্রমণের জন্য যে ছোট ব্যাগটি বিভূতিভূষণ নেন, তার ভিতরে একটি নোংরা লাল গামছা, একটা আধময়লা ধুতি ছাড়া আর বিশেষ কিছু থাকত না। সুপ্রভা দত্তকে অমিয়া জানতেন। সুপ্রভার কাছে শিলঙে যাওয়ার সময়, অথবা বিভূতিভূষণের অভ্যস্ত পল্লীভ্রমণ ঠিক নয়, এমন কোনো বাইরে যাওয়ার সময় অমিয়ার কাছে হোল্ড-অল আর অ্যাটাচিকেস ধার করতেন বিভূতিভূষণ, বলতেন, 'ভদ্রলোকের বাড়ি যাচ্ছি, একটু ভদ্রসভ্য হয়ে যেতে হবে তো।' (অমিয়া চৌধুরাণী, ১৯৯২ : ১২৪, ১৩৪, ১৪১, ১৪৩, ১৪৪-৪৫)।

সেই যে বিভূতিভূষণের মির্জাপুর স্ট্রিটের মেস নিয়ে লিখেছিলেন গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, 'এত অগোছালো পরিবেশও সম্ভব! পোড়া বিড়ির টুকরো, ছেঁড়াছোটা কাগজ—শুধু মেঝেতেই নয়, তক্তপোষের ওপর বিছানাতেও। ফাইবারের স্যুটকেশটাও ধুলোর মৌরসী পাট্টা। বালিশের তলা থেকে চশমার খাপ বার করবার জন্যে বালিশটা উল্টোতেই অপর দিকের ওয়াড়টার এ-পিঠ দেখলাম আশ্চর্য ধবধবে ফর্সা। এক ঝলকে এই মানুষটার আসল প্রকৃতি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। বোঝা গেল, বাইরের ব্যাপার নিয়ে সত্যিই মাথা ঘামানো এঁর ধাতে নেই। ভেতর দিকটাও চেনা গেল। ধব্‌ধবে শাদা।' সেদিনই এই তরুণ প্রকাশক-লেখকটিকে বিভূতিভূষণ বলেছিলেন, '...কলকাতার হাওয়াতে বড্ড ধুলো-ময়লা। তাছাড়া এই কাছেই শিয়ালদহ ইস্টিশন, রেলইঞ্জিনের ভুষো কালি উড়ে আসে, জিনিসপত্তর কিছুতেই পরিষ্কার থাকে না, এ আমি দেখিছি।' গৌরীশঙ্কর লিখেছেন, 'এরপর আর কি বলব! যেন পরিষ্কার থাকা বা না-থাকার মতো

দায় ওই আসবাবপত্রের, উনি কৈফিয়ৎ দিয়েই খালাস।' (গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, ১৯৮৯: ১০)। তিনের দশকের প্রায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অমিয়া চৌধুরাণী বিভূতিভূষণকে যেমন দেখেছিলেন, আর তিনের দশকের শেষে, চারের দশকের গোড়ায় গৌরীশঙ্কর যা দেখলেন, তাতে মনে হয় না সাহিত্যখ্যাতির প্রান্ত থেকে চূড়ায় পৌঁছতে পৌঁছতে বিভূতিভূষণের প্রাত্যহিক স্বভাবে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়েছিল।

অথচ জীবনকে উপভোগ করবার বাসনা এবং অবশ্যই ক্ষমতা বিভূতিভূষণের অমলিন। হগ্ মার্কেটে গিয়ে 'ওয়াইড ওয়ার্ল্ড' কেনা, থ্যাকার্সের দোকান থেকে হ্যারিস সিরিজের নভেলের বুকলেট সংগ্রহ করা, গ্লোব সিনেমায় রিচার্ড বোলে-লাউস্কির 'রাসপুটিন অ্যাণ্ড দ্য এমপ্রেস' কিংবা রূপবাণীতে মিলের 'সাইন অভ দ্য ক্রস' ছবি দেখা, জেন গ্রের 'টেলস অভ লোনলি ট্রায়ালস' থেকে অলিভার লজের 'মাই ফিলসফি' পড়া, হঠাৎ ১৯০৮ সালের পুরনো 'মডার্ন রিভিউ'তে যদুনাথ সরকারের লেখা "আওরঙ্গজেবস ডেইলি লাইফ", শরৎচন্দ্র শাস্ত্রীর 'দক্ষিণাপথ ভ্রমণ', আরও কত অজস্র এবং বিচিত্র পড়াশোনার অভিজ্ঞতায় ভরে থাকে বিভূতিভূষণের ১৯৩৩ সালের দিনলিপি। 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে প্রকাশিত হয়েছে "ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি আশ্চর্য বস্তু", যা পরে যুক্ত হয়েছিল বিভূতি-ভূষণের 'বিচিত্র জগৎ' গ্রন্থে। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে বেরিয়েছে "ভণ্ডুলমামার বাড়ি", একই পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় পাঠক পেয়েছেন "পেয়ালা" গল্পটি। 'বিচিত্রা'য় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে "যাত্রাবদল"। (অ. দি.: ৪১, ৪৫, ৫৩, ৬৯-৭০)। 'যাত্রাবদল' নামের অসামান্য গল্পসংকলনটির বেশ কিছু কাহিনী ১৯৩২-৩৩ সালে লেখা হচ্ছে। একদিকে বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর জগতের রোমাঞ্চে যাঁর আগ্রহের শেষ নেই, অন্যদিকে তিনি গেঁথে ফেলছেন ভণ্ডুল-মামার জীবনভর বাসভূমি গড়ে তুলতে না-পারার আখ্যান। আর বিভূতিভূষণের এই যাত্রাপথে অবশ্যই অবিচ্ছেদ্য মিশে আছে তাঁর আজীবনের নেশা—ভ্রমণ।

১৯৩৩ সালের ৩ মার্চ বিভূতিভূষণের বিক্রমখোল ভ্রমণের সূচনা; সঙ্গী ছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত, কিরণকুমার রায় এবং পরিমল গোস্বামী। বিক্রমখোলে নতুন শিলালিপি পাওয়া গেছে। কেউই তার পাঠোদ্ধার করতে পারছেন না। 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার খরচে বিভূতিভূষণ যাচ্ছেন সেই শিলালিপিবিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য। বিনিময়ে 'বঙ্গশ্রী'তে একটি লেখা দিতে হবে। ফটোগ্রাফিতে পরিমল গোস্বামীর নৈপুণ্য সুবিদিত। বিভূতিভূষণ তাঁকে বললেন, একদিনের মধ্যে

পরিমলবাবু তাঁকে ফটোগ্রাফি শিখিয়ে দিতে পারেন কি না। ছবি যদি না তোলা গেল, তবে আর ভ্রমণ অথবা সেই সংক্রান্ত লেখার সার্থকতা কী! অবশ্য প্রমোদ দাশগুপ্ত যে সঙ্গে যাবেন, এটা তখনই স্থির হয়ে গেছে। ক্যামেরা আর ছবি তোলার ক্ষমতা, দুটোই তাঁর আছে। কিন্তু বিভূতিভূষণ চান ক্যামেরাটি নিজে ব্যবহার করতে। ফল হল একটাই। ভ্রমণসঙ্গীর সংখ্যা বাড়ল—পরিমল গোস্বামী এবং কিরণকুমার রায়। ১৯৩৩-এর ৩ মার্চ চারজনে রাত্রি ন'টার নাগপুর প্যাসেঞ্জারে বেলপাহাড় রওনা হলেন। বেলপাহাড় স্টেশনে নেমে বিক্রমখোল-শিলা-চিত্রলিপি দেখতে হলে চার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ত্রিগোলা গ্রাম পড়বে। সেখান থেকে চার মাইল দূরে বিক্রমখোল পাহাড়, উড়িষ্যার সম্বলপুরে তিতলয়বহল গ্রামে অবস্থিত (অ. দি. : ৬৫)।

সঙ্গীদের বিভূতিভূষণ শুরুতেই বলে রেখেছিলেন যে, এই ধরনের ভ্রমণে পথের খাওয়া-দাওয়া এবং গন্তব্যে পৌঁছিয়ে থাকবার জায়গা ইত্যাদি তুচ্ছ বিষয়ে চিন্তাভাবনা অথবা অগ্রিম আয়োজন যথার্থ ভ্রমণরসিকের শোভা পায় না। ট্রেনে উঠে অবশ্য খিদের উদ্রেক বিভূতিভূষণেরই হয়েছিল সর্বাগ্রে। রুটি-মাখন, যা তাঁর অজান্তে সঙ্গীরা এনেছিলেন, তা খেতে খেতে সিনি স্টেশনে ট্রেনে বসে বিভূতিভূষণ বলতে লাগলেন, 'আমরা তো কেবল পাথর দেখতেই যাচ্ছি না, আমরা ভ্রমণ করছি শিক্ষার জন্য। শহরের বাইরে এলে আমরা উদার প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে মিলি, আর সেই সঙ্গে আমাদের মনের সমস্ত সঙ্কীর্ণতা দূর হয়ে যায়। এখানে এলে আমরা আমাদের জীবনের স্থূল বিভাগটা মুহূর্তে ভুলে যাই···এই বিরাট বিশ্বের সঙ্গে তখন হয় আমাদের আত্মীয়তা···পরিপূর্ণরূপে জীবনটাকে উপভোগ করতে হলে ছুটে আসতে হবে আমাদের ঘর ছেড়ে বিশ্বপ্রকৃতির এই উন্মুক্ত প্রান্তরে, মুহূর্তের জন্য খাওয়া ভুলতে হবে, শোয়া ভুলতে হবে, নিদ্রা ভুলতে হবে, এমনকি নিজেকেও সম্পূর্ণ ভুলতে হবে—প্রমোদবাবু আর রুটি আছে?' (পরিমল গোস্বামী, ১৩৬২ ব : ১২)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে পথে আহারের কোনোরকম আয়োজনের ঘোর বিরোধী বিভূতিভূষণ এই বিরাট সংলাপের আগে আধ পাউণ্ড পাউরুটি খেয়ে ফেলেছেন। এই ভ্রমণের প্রসঙ্গেই বিভূতিভূষণ দিনলিপিতে লিখেছেন, 'বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের গৈলকেরা স্টেশন থেকে মনোহরপুর পর্যন্ত দুধারের অরণ্য-পর্বতের দৃশ্য অতুলনীয়···বসন্তকাল, বনে বনে রক্তপলাশের সমারোহ, সারেঙ্গ টানেলের মুখে ধাতুপ ফুলের বন, শালবনে কচি সবুজপত্রের সম্ভার, প্রচুর সূর্যালোক, বনের মাথার ওপরে নীল আকাশ, মাঝে মাঝে বনের মধ্যে দিয়ে পার্বত্য নদী

শীর্ণধারায় সর্পিল গতিতে বয়ে চলেচে…' (অভিযাত্রিক, বি র ২ : ৪৮৫)।

বেলপাহাড় থেকে হালকা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছ'মাইল পথ আড়াই ঘণ্টায় হেঁটে ত্রিণ্ডোলা গ্রাম, তারপর আবার বিক্রমখোলের দিকে যাত্রা। পরিমল গোস্বামী লিখেছেন, 'অরণ্যে মানুষ চলার চিহ্ন বেশি নেই। চারিদিক নিস্তব্ধ—গভীর নির্জন—এবং তারই মাঝে মাঝে বাঘ মারবার জন্য পরিত্যক্ত মাচা কয়েকটা… যতদুর যাই গাছের পর গাছ, জনমানবের চিহ্ন নেই। কোথায়ও বাঘের তাড়া খেলে আশ্রয় নেব এমন জায়গা নেই। বন্য বরাহের, বাঘের এবং ভালুকের থাকবার জায়গা এবং পরিচিত চিহ্নসমূহ পথপ্রদর্শকেরা আমাদের দেখাতে লাগল। তাদের সঙ্গে লাঠি এবং ধারালো অস্ত্র ছিল।' (পরিমল গোস্বামী, ১৩৬২ ব : ৩২)। বিক্রমখোলে পৌঁছিয়ে শিলালিপি দেখা গেল। বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে আছে, 'গ্রানাইট crag এর নীচে খোদাই লিপি—চারিধারের জঙ্গলের দৃশ্য সত্যই অপূর্ব্ব। নীচে এক জায়গায় বসলুম গিয়ে। পিরিয়াল ফুল ফুটেচে—একটা ছোট পাহাড়ী শুষ্ক নদী। বিকেল [বিকেলে] ফিরে এসে পুকুরে স্নান কর্ল্লুম। কি বালি! তারপর নাচ দেখলুম। ওরা আগে চলে গেল। আমি এক জ্যোৎস্না-লোকিত বনপর্বতের পথে গরুর গাড়ীতে ৯ মাইল পথ ওদের জিনিসপত্র নিয়ে এলুম।' (অ. দি. : ৬৫৬-৭)। ওরা, অর্থাৎ পরিমল গোস্বামী, প্রমোদ দাশগুপ্ত আর কিরণকুমার রায় খানিকটা চিন্তিত হয়েছিলেন, বিভূতিভূষণ হাঁটার বদলে গরুর গাড়িতে ফিরতে চাওয়ায়। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার স্বাস্থ্য ভাল আছে তো? …হেঁটে না গিয়ে গাড়িতে যাচ্ছেন কেন? গাড়িতে যাওয়া তো আপনারই আপত্তি ছিল।' উত্তর পেলেন, 'এখনও আপত্তি আছে। হেঁটে না গেলে সত্যকার ভ্রমণ হয় না…আসবার সময় পা দুখানা দিয়ে এখানকার মাটির স্পর্শ এমন গভীর ভাবে টেনে নিয়েছি যে আপনারা যাতায়াতের দ্বিগুণ হাঁটাতেও ততখানি পারবেন না। আমার পক্ষে সে জন্য এখন আর হাঁটবার প্রয়োজন নেই। এখন আমি সমস্ত মন দিয়ে প্রকৃতির রস টানতে থাকব।' (পরিমল গোস্বামী, ১৩৬২ ব : ৩৯)।

বেলপাহাড়ের আকাশে যখন সূর্যাস্তের রঙে মাখা মেঘ, ভ্রমণসঙ্গীরা হঠাৎ বিভূতিভূষণকে আবিষ্কার করলেন, মাঠের উপরে হামাগুড়ি দেওয়া অবস্থায়—নাকসুদ্ধ মাথা মাটি স্পর্শ করে আছে। পরিমল গোস্বামীর মনে হয়েছিল ঠিক যেন একটি মেষশাবক ঘাস খাচ্ছে। সঙ্গীদের কৌতূহলের জবাবে বিভূতিভূষণ জানালেন, 'অদ্ভুত গন্ধ এখানকার মাটির, শুঁকছি। আপনারাও শুঁকুন।'

পরিমল গোস্বামীর ভাষায়, 'আমরা চারজন তখন সারবন্দীভাবে বেলপাহাড়ের মাটি শুঁকতে লাগলাম।' (পরিমল গোস্বামী, ১৩৬২ ব : ২৬)। মানুষ খেপানোর অদ্ভুত ক্ষমতা সত্যিই বিভূতিভূষণের ছিল। প্রসঙ্গত মনে পড়ে নীরদচন্দ্রের দাদা চারুচন্দ্র চৌধুরীর গালুডি ভ্রমণের গল্প। বিভূতিভূষণই তাঁকে গালুডিতে বেড়াতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, থাকবার জন্য 'ভালো' বাড়িও ঠিক করে দিয়েছিলেন। গালুডি থেকে চারুচন্দ্রের চিঠি এল, 'এটা আবার একটা বাড়ি নাকি? একটা মাঠকোটা, তার দরজা বন্ধ করা যায় না, কোন হুড়কো নেই, ছিটকানি নেই, রাত্রে ট্রাঙ্ক-বাক্স দিয়ে ঠেকা দিয়ে রাখতে হয়। মাঝরাতে হায়না বাড়ির ভেতর উঠোনে এসে হাঃ! হাঃ! করে ডাকে।' বিভূতিভূষণ এসব অভিযোগ শুনে কোনো পাত্তা না দিয়ে বললেন, 'ওসব ঠিক হয়ে যাবে।' অমিয়া চৌধুরানী লিখছেন, 'আমি…বললাম, "ব্যাপারটা কি? ওঁরা লিখছেন বাড়ি কদর্য, আর এই ভদ্রলোক কোন কেয়ারই করছেন না!" …আসলে খুবই "কন্‌ফিডেন্ট" ছিলেন যে ওঁদের জায়গাটা ভাল লাগবেই। আর সত্যি হলোও তাই। কয়দিন থাকার পর আমার ভাসুর ও জায়ের গালুডি জায়গাটা এতই ভাল লেগে গেল আর মাঠ-কোঠার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করলেন না, উল্টে, আরও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে লিখে নিয়ে গিয়ে খুব হৈ-চৈ করে পুজোর ছুটি কাটিয়ে এলেন।' (অমিয়া চৌধুরাণী, ১৯৯২ : ১৪৭-৪৮)।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে সেই অসামান্য তালিকাটির কথা, যা চারুচন্দ্র চৌধুরীকে বিভূতিভূষণ তৈরি করে দিয়েছিলেন গালুডি ভ্রমণের প্রস্তুতিপর্বে :

'সকালে—নেকড়াডুংরি পাহাড় থেকে সূর্যোদয় দর্শন।

দুপুরে—বলরাম সায়রে স্নান। বিকেলে ৪॥ / ৫—Beauty Spots

১) সুবর্ণরেখার ধারে;

২) ন-দীয় নোলা—a hillock;

৩) উলদডুংরির পথে চন্দ্ররেখাগ্রাম পর্যন্ত যাওয়া;

৪) সুবর্ণাচলে ভ্রমণ (ask চৌধুরীবাবু Asst. Station Master)

৫) মোহিনীবাবু নার্সারির সর্বোচ্চ স্থান অর্থাৎ তাঁহার আপিসঘর হইতে সুবর্ণরেখার ওপারের দৃশ্যদর্শন (বৈকালে);

৬) সাঁওতালদিগের সমাধিস্থান দর্শন, স্টেশন হইতে সুবর্ণরেখার পথে বামদিকে কিছু দূরে শালবনের ভিতর;

৭) বড়বিল অথবা সম্ভব হইলে শতগুড়ুম ভ্রমণ। গুঁইরাম গাড়োয়ানের

গাড়িতে। কৃষ্ণ আনিয়া দিবে।

৮) ধারাগিরি বাসাডেরা waterfall—4 miles.

সকালে—

৯) রাখামাইনস্ ভ্রমণ (নীলঝর্ণা);

১০) রানীঝর্ণা ভ্রমণ ;

১১) বসাক ভিলার শালের রাস্তা দিয়ে প্রথম Railway level crossing পর্যন্ত ভ্রমণ।

Provisions

হাট

সোমবার—৩টা / ৪টা

চাল সকাল সকাল গিয়া ক্রয় করিতে হইবে।-

সরিষাতেল—বিনোদমার্কা ১ টিন

ভাল ঘৃত—প্রয়োজন মত

মাখন—

চা—

সোনামুগের ডাল—

তেঁতুল—

মাছ ও মাংসওয়ালাকে কৃষ্ণ বলিয়া দিবে ;

মুর্গী ও ডিম হাটে কিনিতে হইবে।

হাটে পেঁপে কিনিয়া প্রতিদিন খাইতে হইবে।

মাছের সের ছয় আনা মাত্র।

available

আলু — মাড়োয়ারীর দোকানে জিনিসপত্র

বেগুন — ক্রয় করিতে হইবে। অর্ডার দিলে

পেঁপে — টাটানগর হইতে ভাল জিনিস

টোমাটো — আনাইয়া দিবে।

দুধ কৃষ্ণ ব্যবস্থা করিবে।

লোকজন

গিয়াই চন্দ্রমোহন পাণ্ডে পোষ্টমাষ্টারের সঙ্গে আলাপ,

বাদলবাবু ও বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে আলাপ,

চৌধুরীবাবুর সঙ্গে আলাপ,

কলসীবাংলার বৌদিদির সঙ্গে আলাপ

জল

কলসীবাংলা হইতে জল আনাইতে হইবে।

মেথরের বন্দোবস্ত স্টেশন হইতে কৃষ্ণের দ্বারা অথবা

পোষ্টমাষ্টারের দ্বারা—

মশারি লইয়া যাইতে হইবে—

হ্যারিকেন লণ্ঠন—৪টা

ষ্টোভ

দা। বালতি। দড়ি।

খানিকটা তার আলনার জন্য, অন্ততঃ দশ হাত ;

টিংচার আইডিন—১ শিশি। কুইনাইন—১ শিশি।

Imp

Deck Chair

পেয়ারা গাছের তলায় ছায়ায় অথবা বাংলোর সম্মুখে হরিতকী গাছের তলে ডেক্‌চেয়ার পাতিয়া চিন্তা ও অধ্যয়ন।

৯-৩৩ মিঃ—২৷৷০ (পড়া যায় না)

১৭/১৮ই অক্টোবর নাগাদ আমরা একসঙ্গে ধারাগিরি যাইব। আমরা বেলা একটার গাড়িতে রাখামাইনস্‌ হইতে আসিব।' (অমিয়া চৌধুরাণী, ১৯৯২ : ১৪৫-৪৭)।

এমন তালিকা হয়ত সেই বিভূতিভূষণই বানিয়ে দিতে পারেন যিনি সম্বলপুরের পথে পাহাড়, জঙ্গল, ধাতুপফুল, শালবন, পাহাড়ি নদী দেখতে দেখতে হঠাৎ একেবারে বদলে যান ; পরিমল গোস্বামীর বর্ণনায়, 'চক্রধরপুর স্টেশনেই বিভূতিবাবুর দৃষ্টি সম্পূর্ণ ঘুরে গেল। বাইরের দৃশ্যে তাঁর মানসিক সোডার বোতল থেকে আর বুদ্‌বুদ উঠছে না, তিনি কেমন যেন দমে গেছেন। তাঁর যে চোখ ছিল এতক্ষণ বাইরের ফুলের দিকে, সেই চোখ ফিরল ফেরিওয়ালাদের ফলের দিকে। লজিক

ঠিক আছে ; ফুল থেকেই ফল ! বিভূতিবাবু নৈসর্গিক অভিব্যক্তিধারা অনুসরণ করে বললেন, "পেঁপে খাব।"' (পরিমল গোস্বামী, ১৩৬২ ব : ২১)। ১৯৩৩-এর ভ্রমণকাহিনী অবশ্য বিক্রমখোলের শিলালিপি দর্শনেই শেষ নয়। সে বছর পুজোর ছুটিতে বিভূতিভূষণ নাগপুরে বেড়াতে যান। সঙ্গে ছিলেন নীরদ দাশগুপ্ত, তাঁর ভাই প্রমোদ দাশগুপ্ত (যিনি বিক্রমখোলের পথেও বিভূতিভূষণের সঙ্গী ছিলেন) এবং বিভূতিভূষণের ভাই নুটুবিহারী। বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে এ ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ মেলে (অ. দি. : ১৪৮-৫৭)। সীতাবল্ডিপাহাড়, যেখানে সীতাবল্ডির যুদ্ধ হয়েছিল, মহারাজবাগ, নাগপুরের চতুর্দিকের মালভূমি, গৌরীরাও হ্রদ, আম্বেঝরী হ্রদ, রামটেক পাহাড় আর কিন্দ্রী হ্রদ, মনসারে ম্যাঙ্গানীজ পাহাড় দেখেন বিভূতিভূষণ। নাগপুর সিভিল লাইনস থেকে ১৩৪০ বঙ্গাব্দের ১২ আশ্বিন সুপ্রভা দত্তকে চিঠি লিখলেন তিনি।

'...এত বিরাট সমতলভূমি আমি এর আগে কখনও দেখিচি বলে মনে হয় না—এক চক্রবালরেখা থেকে অন্য চক্রবালরেখা পর্য্যন্ত বিস্তৃত দিগন্তপ্রসারী ধূ ধূ এত বিরাট প্রান্তরের কল্পনা না চোখে দেখলে মনে আনা কঠিন।...নাগপুরে সাইনট্রী অধিবাসীদের সংখ্যাই বেশী। মেয়েদের পরদা নেই, পথে রঙীন শাড়ী-পরা গৌরবর্ণ সাইনট্রী মেয়েরা বাইকে চেপে স্কুল কলেজে যাচ্চে—এদেশে পুজোর ছুটী নেই, স্কুল কলেজ আপিস আদালত সব খোলা। সাইনট্রী মেয়েরা দেখ্‌তে বেশ সুশ্রী, বেশ একটা স্বাধীন সতেজ ভাব, একা বাজার করচে, স্কুলে যাচ্চে, পার্কে বেড়াচ্চে, খুব ভাল লাগে।...কলেজের অনেক মেয়ে খোপায় ফুলের মালা জড়িয়ে রঙীন্ শাড়ী পরে সাইকেলে চেপে কলেজে চলেচে। আমাদের বাংলোর কাছেই ইউনিভার্সিটী বিল্ডিংস ও সায়েন্স কলেজ, কত ছাত্রীকে এরকম অদ্ভুত সাজে দেখ্‌লাম। ভারী সুন্দর লাগ্‌লো। কিন্তু কল্‌কাতায় এম্. এ. ক্লাসের কোনো ছাত্রী যদি ধরো এ সাজে ক্লাসে যায় ?' একই চিঠিতে আছে নাগপুরের সংলগ্ন বিস্তীর্ণ মালভূমির বর্ণনা, 'বাংলাদেশও দেখ্‌তে সুন্দর বটে কিন্তু তার মধ্যে বিরাটতা সহনীয়তা নেই। ব্যাস বাল্মীকির সঙ্গে চণ্ডীদাসের যা তফাৎ। Poetry of life বাংলাদেশের ভূমিশ্রীর সঙ্গে মিশে আছে, এখানে আছে immensity, majesty -- অবশ্য স্বীকার করি বাংলার মাঠে নদীর ধারে প্রকৃতি মুক্তিরূপা, যেমনি লীলাময়ী, তেমনি রূপসী, সেখানেও মেঘ-চাপা গোধূলির আলো অপূর্ব্ব—কিন্তু এখানকার immensityর সঙ্গে তার তুলনা হয় না। একটা বাল্মীকির অরণ্যকাণ্ডের বনবর্ণনা, আর একটা বৈষ্ণব কবিদের বৃন্দাবনের নিকুঞ্জশোভার লিরিক কবিতা।'

(অপ্রকাশিত)। নাগপুর ভ্রমণের আনন্দে খানিকটা ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল একজন যোধপুরী ছাত্র অনবরত বক্‌বক্‌ করে ; 'বেচারীর একটা ভুল ধারণা হয়েছিল যে আমাদের সঙ্গে অনবরত কথা না বল্লে তার দিক থেকে ঠিক আতিথেয়তা ও ভদ্রতা দেখানো হবে না', সুপ্রভাকে চিঠিতে কিছুটা কৌতুক করে লিখেছিলেন বিভূতিভূষণ। আর এই যুবক বিভূতিসাহিত্যের উপাদানে উপমা পেয়ে যায় বেশ কয়েক-বছর বাদে। ১৯৪২-এর শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় বিভূতিভূষণ লেখেন "মূলো র‍্যাডিশ-হর্স র‍্যাডিশ" গল্পটি।

১৯৩৩ সালের ৫ এপ্রিল বিভূতিভূষণের জীবনে একটি মনে রাখবার মতো দিন। রবীন্দ্রনাথ ডেকে পাঠিয়েছেন, বরানগরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের বাড়িতে দেখা করতে যেতে হবে। রবীন্দ্রনাথ সেদিন বলেছিলেন যে 'পথের পাঁচালী' সম্পর্কে লিখেছেন তিনি 'পরিচয়' পত্রিকায়, সামনের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। এর আগে বিভূতিভূষণ 'পথের পাঁচালী' এবং 'মেঘমল্লার' বইদুটি পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে, যদি সময়-সুবিধামতো তাঁর মতামত জানান। 'পরিচয়'-এর বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৪০ সংখ্যায় বেরিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের লেখা, সেখানে ছিল বিভূতিভূষণ আর তাঁর 'পথের পাঁচালী'র পক্ষে একান্ত মূল্যবান সেই মন্তব্য ; রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে।' (সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৯১ : ৬২)। সেই বছরই ১ মে নতুন নাটক 'বাঁশরি' পড়বেন রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ খবর পেলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর খোঁজ করেছেন, চেয়েছেন, শ্রোতাদের মধ্যে যদি থাকেন বিভূতিভূষণ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেন, তাঁর নাটক-পাঠের আসরে বিভূতিকে আনা চাই। কেদার চট্টোপাধ্যায়ের মতো সম্পাদকেরা বলেন, বিভূতিভূষণের উপন্যাস পেলে আর কারও লেখার প্রয়োজন নেই সে পত্রিকার। কালিদাস রায়ের সাহিত্যসভা ১৫ রাজা বসন্ত রায় রোডের রসচক্র সংসদ থেকে বিভূতিভূষণের আমন্ত্রণ আসে সেখান যাওয়ার জন্য। (অ. দি. : ৭৬-৭৭, ৮৪, ৮৮, ১৩৮)। তবে কি বাংলাসাহিত্যের আসরে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় চমক থেকে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন পূর্ণপ্রতিষ্ঠায় ? অথচ এই ১৯৩৪ সালটি ব্যক্তিগত দায়দায়িত্ব, শোকদুঃখের ভার নিয়েই বিভূতিজীবনে শুরু হয়েছিল।

ভগিনীপতি পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ১৯৩২ সালের শেষে মারা যাওয়ার পরে বোন জাহ্নবীর সংসারের দায়িত্ব এসে পড়েছে বিভূতিভূষণের উপরে। জাহ্নবীর দুরারোগ্য ব্যাধি, তার ছোটমেয়েটির করুণ মৃত্যু, এসবই ১৯৩৩-এর প্রথমদিকের

ঘটনা। কর্মক্ষেত্র খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশনেও ১৯৩৩-এর সূচনায়, অথবা ১৯৩২-এর শেষে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। স্কুল থেকে চলে গেছেন পুরনো হেড-মাস্টার হেনরি ক্লিফোর্ড ক্লারিজ, যিনি একদশকের ব্যবধানে বিভূতিসাহিত্যের অনুষঙ্গে ফিরে আসেন—'অনুবর্ত্তন' উপন্যাসে ক্লার্কওয়েল সাহেবের প্রস্থনায়। ইউনিভার্সিটির খাতা দেখা, রামকৃষ্ণ আশ্রমের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব, চাংড়িপোতার মিটিঙে সভাপতিত্বের অনুরোধ, বাগবাজারে চন্দ্রনাথ পরিষদের সভায় আমন্ত্রণ-রক্ষা, সুকুমার সেনের মন্তব্য যে বাংলাসাহিত্যে নতুন ধারা বিভূতিভূষণই এনেছেন, সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী মেডেল তাঁরই প্রাপ্য, কালিদাস নাগের সঙ্গে আলোচনা যে 'পথের পাঁচালী' অনুবাদ করবার লোক নেই, কারণ শুধু 'Philosophy' অনুবাদ করলে তো চলবে না (অ. দি. : ৭১, ৭২, ৮০, ৮২, ৮৩, ১২২, ১২৪-২৫), সব মিলে বিভূতিভূষণের দিন কাটে।

১৯৩৩ সালের ৩১ অগাস্ট বিভূতিভূষণ খবর পেলেন, রিপন কলেজের সাহিত্য ইউনিয়ন থেকে তাকে নাকি অভিনন্দন দেবে। (অ. দি. : ১৪৭)। রিপন কলেজ ম্যাগাজিনের ১৪/৩ খণ্ডে, এপ্রিল ১৯৩৪ সংখ্যায় এই অভিনন্দন-সভার বিবরণ আছে। ১৯৩৩ সালের ১২ সেপ্টেম্বর রিপন কলেজের কমনরুমে কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, বিখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংবর্দ্ধনা দেওয়া হয়। সভাপতি ছিলেন প্রমথনাথ চৌধুরী। নরেন্দ্র দেব, কবিশেখর কালিদাস রায়, গোলাম মুস্তাফা, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, চারুচন্দ্র বিশ্বাস, প্রিয়রঞ্জন সেন প্রমুখ সাহিত্যিক, কবি, শিক্ষাবিদেরা সেদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সুধীরকুমার ঘোষ বিভূতিসাহিত্যের সপ্রশংস আলোচনা করেন। অহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং করুণাময় মুখোপাধ্যায় নামক আরো দুজন ছাত্র বিভূতিভূষণের লেখার বিষয়ে নিবন্ধপাঠ করেন। রিপন কলেজের অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য অভিনন্দন প্রস্তাব পড়েন এবং ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের বক্তব্যের মধ্যে ছিল, 'সচরাচর উক্ত হয়—বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষায় প্রতিভা খর্ব্ব করে—সৃজনীশক্তি নষ্ট করিয়া দেয়। আজিকার দিনের সুযোগ লইয়া অন্ততঃ বলা যায় যে রিপন কলেজের বিরুদ্ধে সে অভিযোগ সঙ্গত নহে। কারণ এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিদ্যালাভের ফলে না হউক—অন্ততঃ তৎসত্ত্বেও যে শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের মনীষা ও কল্পনা অবাধে স্ফূর্তি পাইয়াছে—ইহা দেশের পাঠকসমাজ আজ উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন।...আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর যখন এই কলেজের অধ্যক্ষপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন সে সময়ে এখানে সত্যই একটি সাহিত্যচর্চ্চার

এবং বহুমুখী জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি শিক্ষক ও ছাত্র সকলের মধ্যেই উদ্দীপিত হয়। তখন অনেকেই সাহিত্যসেবার প্রেরণা এখান হইতে লাভ করিয়াছিলেন এবং পরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। সেই পরিবেশের—সেই ক্ষেত্র ও বীজের একটা পরিণত ফল—ঔপন্যাসিক শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ।'

সেদিনের সভায় বিভূতিভূষণের ভূমিকা কী ছিল, তার হদিস মেলে কবিশেখর কালিদাস রায়ের স্মৃতিচারণে; 'বিভূতিকে শেষে দুকথা বলতে হল। তাতে কলেজে পড়ার সময় কিরূপ ক্লাস ফাঁকি দিত তার সতীর্থদের সঙ্গে কি সব ছেলে-মানুষি করত, তারই কয়েকটা টুকরো টুকরো স্মৃতিকথা বলে বক্তব্য শেষ করল। সভার পর বিভূতিকে বললাম "তুমি কি পাগলের মতো বললে। কলেজের অধ্যাপকদের লেকচার শুনে যে কতটা তুমি উপকৃত হয়েছ, তোমার সাহিত্যিক প্রতিভায় কলেজের দান কতখানি তার সম্বন্ধে তুমি একটা কথাও বললে না।" বিভূতি বললে, "দাদা মিথ্যে কথা ত' অনেক লিখি, কিন্তু একটা গণ্যমান্য লোকের সভায় দাঁড়িয়ে গলগলে মিথ্যে কথাটা কি করে বলব? যে জন্যে এঁরা আমাকে অভিনন্দন দিলেন তার সঙ্গে কলেজের কি সম্বন্ধ আছে বলুন। এই কলেজ থেকে পাশ করা একজন পি. এইচ.-ডি. কি আই. সি. এস.কে এঁরা অভিনন্দন করলে তিনি যা বলতেন আমি কি করে তা বলব? আমি কি ছাই কলেজের কোন লেকচার মন দিয়ে শুনেছি? আমার এডুকেশন সম্বন্ধে বীরবল যা বললেন তাই, এ এডু-কেশন ঐ যশোর জেলার সেই পল্লীর কলেজে। আর এই কলেজ হতে পাশ করে আমি একটা মাস্টারি পেয়েছি তার জন্য ধন্যবাদ ত' দিয়েছি।"' (তারকনাথ ঘোষ, ১৩৭৬ ব : ২৬)।

তবে কি জীবনের যাত্রপথের বাঁকে বাঁকে বিভূতিভূষণ নিজের সূচনার মুহূর্তকে, ইছামতীর ছন্দ আর বারাকপুরের বর্ণগন্ধকে বারবার নিকটতমের উপমাতে লালন করতে চাইতেন? সেই লালনের ভিতরে কি লালনের নিয়ম-বেনিয়মের হিসেব মেনেই ঢুকে পড়ে 'এডুকেশন'-এর মতো পরদেশী শব্দ? অন্যদিকে বোঝা যায় না যে, রিপন কলেজ ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির আহ্বান যদি এতখানি আগ্রহে বারাকপুরের বিভূতিকে উদ্বুদ্ধ না করত, তবে কেমন হত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'-'অপরাজিত'! আদৌ কি তৈরি হত সেসব উপন্যাস? সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার রেশ বিভূতিভূষণের দৈনন্দিনে মিশে থাকে। ১৯৩৩-এর ২৫ নভেম্বর আশুতোষ বিল্‌ডিংে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট হোস্টেলের ছাত্ররা মেসের প্রাক্তন আবাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যো-

পাধ্যায়কে সংবর্ধনা দিলেন। সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী (অ. দি. : ১৭৪)। তবে স্কুলশিক্ষকের যে রুজি রিপন কলেজের প্রাক্তন ছাত্রটির অবলম্বন, তাকে বাদ দিয়েও বিভূতিভূষণের প্রাত্যহিকের তল মেলে না। এমন-কী জীবিকার প্রয়োজন হয়ত স্কুলশিক্ষকের সামান্য বেতনে পুরো মিটত না। বোন জাহ্নবীর সংসারের দায়িত্ব আছে, আছে ছোটভাই নুটুবিহারীর দায়িত্ব। ১৯৩৪-৩৫ সালে বিভূতিভূষণ ভারত ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানির এজেণ্টের কাজও করতে চেয়েছিলেন। ১৯৩৮ সালের ২২ জানুয়ারি সুপ্রভা দত্তকে লেখা চিঠিতে আছে, '···১৯৩৪-৩৫ সালে আমি ভারত ইন্‌সিওরেন্স্ কোম্পানীর জনৈক এজেণ্ট্ ছিলাম অশোক চাটুয্যে করে দিয়েছিল, case একটাও জোটাতে না পেরে ছেড়ে দিয়েচি। আচ্ছা, সুপ্রভা একটা case করবে ? করো না ? তোমার একটা ইন্‌সিওরেন্স্ করা দরকার। তাহোলে আমার চাকুরী আবার বজায় হয়। খুব ভালো বোনাস্ দেয়।' (অপ্রকাশিত)

কত কাজ কত অর্জন কত অসংগতি

১৯৩৩ সাল থেকেই বিভূতিভূষণ 'আরণ্যক' উপন্যাসের কথা ভাবছেন। ১ নভেম্বর দিনলিপিতে লিখেছেন, 'বাসায় এসে "জঙ্গল ["] সম্বন্ধে বইটার sketch করলুম' (অ. দি. : ১৬৬)। ১৩৪০ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত হয় 'বিচিত্র জগৎ' ফিচারের লেখা "সমুদ্রতলে নূতন জগৎ" (অ. দি. : ১৩৬), 'প্রবাসী'র ফাল্গুন সংখ্যায় বেরলো "উইলের খেয়াল" আর 'উদয়ন' পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় "বৈদ্যনাথ" (অ. দি. : ১৮৮)। সেই বছরই, অর্থাৎ ১৯৩৪-এই প্রকাশিত হল আর একটি বিখ্যাত ছোটগল্প "ডানপিটে", 'উদয়ন' পত্রিকার ১৩৪১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় (অ. দি. : ২৮৭) অর্থাৎ ১৯৩২ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত 'যাত্রাবদল' গল্পসংকলনটি তৈরি হয়ে গেল, যার প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৩৪১-এ (বি র ৩ : ৫৫৩)। ১৯৩৪ সালে 'প্রবাসী'র পুস্তকপরিচয় বিভাগে বিভূতিভূষণের একাধিক লেখা চোখে পড়ে। আষাঢ় ১৩৪১ সংখ্যায় বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন রেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'মাতৃমূর্ত্তি' নাটক, অমৃতলাল গুপ্তের 'সোনার খনির সন্ধানে' এবং মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর 'মৃত্যু ও পরলোকতত্ত্ব' নিয়ে। এই আলোচনাগুলি চলিত ভাষায় লেখা।

যেমন, 'রেবতীবাবু নতুন লেখক নন ; তাঁর "একটি ফুল", "প্রতিমা বিসর্জ্জন", "প্রহ্লাদ" প্রভৃতি বই পূর্ব্বেই পড়েছি। তাঁর বর্ত্তমান গ্রন্থখানি নাটক। রেবতীবাবুর

ভাষার মাধুর্য্য আছে। অমিয় ও স্নেহলতার চরিত্র মনের ওপর ছাপ ফেলে যায়। …বইয়ের কাগজ ও ছাপা ভাল।' কিংবা 'সোনার খনির সন্ধানে' নিয়ে 'ছোট-ছেলেদের জন্য লেখা গল্পের বই। লেখক ইতিপূর্ব্বে বালকপাঠ্য অনেক গল্পের বই লিখেচেন। শিশুদের নিকট তাদের উপযোগী ভাষায় গল্প বলতে তিনি অভ্যস্ত। তাঁর "তাপসী", "পুণ্যবতী নাবী", "ছোটদেব বই", "ছোটদের গল্প" প্রভৃতি বই শিশু-সাহিত্যের আসরে প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান গল্পেব বইখানিতেও লেখকেব কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণ আছে। গল্পাংশ অতীব চিত্তাকর্ষক। অনেকগুলি ছবিও আছে। আমাদের বিশ্বাস ছেলেমেয়েবা আগ্রহের সঙ্গে বইখানা পডবে।' একেবারে ভিন্ন-ধরনের বই 'মৃত্যু ও পরলোকতত্ত্ব' সম্বন্ধে বিভূতিভূষণ লিখেছেন, 'বাংলা ভাষায় Spiritualism সম্বন্ধে বই বেশী নেই। মহেন্দ্রবাবু অনেক দিন ধবে পরলোক-তত্ত্বের চর্চ্চা করচেন। তিনি এ বিষয়ে বলবাব অধিকারী। Spiritualism সম্বন্ধে বহু কৌতূহলপ্রদ ঘটনা এতে লিপিবদ্ধ আছে, গল্প হিসেবেও সেগুলো পডলে পাঠক আনন্দ পাবেন। লেখক পবলোক সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচাব কবতে চেযেছেন বইয়ের প্রথম অধ্যাযে, অনেকে হয়ত সে-মতবাদ গ্রহণ না করতেও পাবেন, কিন্তু বইয়ের গল্পগুলি সকলেবই ভাল লাগবে আশা কবা যায়।' (পৃ ৩৬৬)।

আশ্বিন ১৩৪১ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে সীতা দেবীব 'মাতৃঋণ' উপন্যাসের আলোচনা করেছিলেন বিভূতিভূষণ। সেটি অবশ্য সাধুভাষায় লেখা, 'আলোচ্য উপন্যাসখানি "প্রবাসী"তে ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাব গল্পাংশটি পাঠকের মনে এমন কৌতূহল জাগায় যে পডিতে আরম্ভ কবিলে শেষ না কবিয়া বই রাখিয়া দেওয়া অসম্ভব হইয়া পডে। লেখিকাব নিপুণ তুলিতে প্রতাপেব দারিদ্র্যময় মেসের জীবন অতি সুন্দর ফুটিয়াছে, আর ফুটিয়াছে ভবানীপুবে প্রতাপের পিসিমার গৃহস্থালীব ছবি। সমস্ত বইখানিতে প্রতাপ ও পিসিমার বাডির ছবি সত্যই যেন জীবন্ত। সামান্য দু-পাঁচটা কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া পিসিমা একেবারে রক্ত-মাংসের জীব হইয়া আমাদের চোখের সামনে দেখা দেন; আব এ-জাতীয় পিসিমার কাছে পাঠকেরা যতটুকু আশা কবে, তিনি তার বেশীও নন, কমও নন। যামিনীর চরিত্র মধুর ও সরল বটে, কিন্তু বৈশিষ্ট্যহীন। মনে বিশেষ দাগ রাখিয়া যায় না। এদের সংসারের মধ্যে জ্ঞানদার ছবি ফুটিয়াছে ভাল। জ্ঞানদা ধনগর্ব্বিতা ও মুখরা, কিন্তু সত্যিকারের মা। সুরেশ্বর একেবারেই অস্পষ্ট। …বইখানিতে লেখিকার নিপুণ বর্ণনাভঙ্গী ভাষার সজীবতা ও সংযম, ঘটনাবলীর স্বাভাবিকতা আমাদিগকে অত্যন্ত আনন্দ দান করিয়াছে। প্রচ্ছদপটখানি

সুদৃশ্য।' (পৃ ৪৮৫)। (দ্র. পরিশিষ্ট খ)।

১৯৩৪-এর শুরুতেই বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে আছে, 'ছুটির পরে এলাম প্রবাসীতে। একশো টাকা আদায় করে নিয়ে আবার গেলুম পি. সি. সরকারের সঙ্গে কথা বল্‌তে বঙ্গশ্রীতে।' (অ. দি. : ১৯১)। 'প্রবাসী'তে 'দৃষ্টিপ্রদীপ' ধারাবাহিক শুরু হল ফাল্গুন ১৩৪০ সংখ্যা থেকে। ১৯৩৪-এর নভেম্বরে 'যাত্রা-বদল' গল্পসংকলন এবং ১৯৩৫-এর অগাস্টে 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাস বেরিয়েছিল পি. সি. সরকারের দোকান থেকে, যার ঠিকানা ১৮ নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট (অ. দি : ১৯০)। ১৯৩৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে লেখা হচ্ছে 'দৃষ্টিপ্রদীপ' (অ. দি.: ১৯৭); এইসময়, ১৯৩৪-এর ১৭ ফেব্রুয়ারির দিনলিপিতে সারাণ্ডার বনপাহাড়ের কথা প্রথম পাওয়া গেল (অ. দি. : ২০৩)। সিনি, নেকৃড়াডুংরী, মহাদেবডুংরীর শোভার সঙ্গে, চন্দ্ররেখা গ্রাম-বুরুডিগ্রামের সঙ্গে এই প্রথম বিভূতিভূষণের চেনাজানা। তারপরে তো বারবারই বিভূতি-ভূষণের ভ্রমণের আনন্দে ফিরে ফিরে মিশেছে সারাণ্ডা। সিংভূম থেকে ময়ূরভঞ্জ পর্যন্ত চল্লিশ মাইলব্যাপী পথের অরণ্যপ্রকৃতির রোমাঞ্চ থেকে সেই ১৯৩৪-এই মনের মধ্যে তৈরি হতে থাকে "রঙ্কিণী দেবীর খড়্গ"র মতো কাহিনী (অ. দি. : ২০৯), যা লেখা হতে হতে অবশ্য শেষ হয়ে যাবে তিনের দশক। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা 'মৌচাকে' ওই গল্পের প্রথম প্রকাশ।

এইসময় সিংভূম অঞ্চলে ঘুরতে ঘুরতে বিভূতিভূষণ যে ভ্রমণ-দিনলিপি লেখেন (অ. দি. : ২০৭-১৬), সেখানে 'আরণ্যক' উপন্যাসের প্রস্তুতিপর্বকে চিনে নেওয়া যায়। ফেব্রুয়ারি মাসে সিংভূমের অরণ্যে বেড়াতে বেড়াতে তিনি লেখেন, 'A novel on forest...ওতে নির্জ্জনতার কথা থাক্‌বে। গাছপালার কথা থাকবে। অরণ্যানী—খাড়া উঁচু পাথরের স্তর / ধাতু প্রস্তর। রঙীন ঝর্ণা যা ঘন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে নেবে আসচে···চীহড় ফলের গাছ···কেঁদ। আমলকী। বিরাট দৃশ্য। বিরাট জাতি। টাঁড়বারো।' (অ. দি. : ২১৫)। অথচ সেসময় যে উপন্যাস বিভূতিভূষণ লিখছেন, তা হল 'দৃষ্টিপ্রদীপ'। কে জানে, হয়ত দুয়ের দশকে ভাগলপুর জঙ্গলমহালের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তিনের দশকে এই সিংভূম-ভ্রমণের সঞ্চয় যোগ না হলে, 'আরণ্যক' আমাদের পরিচিত 'আরণ্যক' হয়ে উঠত কিনা। শুধু কি সিংভূম? ১৯৩৩ সালে বিক্রমখোল থেকে ফেরার পথে গ্রিণ্ডোলা-গ্রামে সেই যে নাচ দেখার অভিজ্ঞতা! গাঁউটিয়ার কথামতো মাত্র তিনআনা পয়সা দেওয়া হল নাচিয়ের দলকে, তাতেই তারা কী খুশি! (পরিমল গোস্বামী,

১৩৬২ ব : ৩৮)। নিশ্চিত করে কি বলা যায় যে 'আরণ্যকে'র নাটুয়া বালক ধাতুরিয়ার মুহূর্ত ওই গ্রিণ্ডোলা গ্রামেই বিভূতিভূষণের কাছে ধরা দেয়নি? ১৯৩৩ সালে পুজোর সময় যখন কিন্‌সী হ্রদ, রামটেক পর্বত দেখতে যাচ্ছেন নাগপুর থেকে, তখনি বিভূতিভূষণ পথে দেখেছিলেন বৃদ্ধ গনু মাহারকে; বুনো গাছ নিয়ে চলেছে পাঞ্চালা গ্রামে (অ. দি. : ১৫৩)। ভাগলপুর-ইসমাইলপুরের অরণ্যবাস থেকে ফিরবার পরে কলকাতার স্কুলে চাকরি, বিভিন্ন পত্রপত্রিকার আড্ডা, কত সাহিত্যসমিতির কত সংবর্ধনা-অভিনন্দন; এসবের মধ্যেও বিভূতিভূষণের এক ভ্রমণ থেকে আর এক ভ্রমণের পরতে পরতে 'আরণ্যক' বুঝি অবিরাম তৈরি হয়, বাড়ে, তাতে ভাঙা-গড়া চলে। তারই মধ্যে রুজি আছে, কলকাতায় মেস-ধোঁয়া-হট্টগোলের জীবন আছে। ১৯৩৪-এর এপ্রিলের ১৮/১৯ তারিখে ডায়েরিতে লেখা হয়, 'কাগজ দেখে স্কুল। ওখান থেকে বঙ্গশ্রী। সজনী নেই। ৫টার সময় চলে এলুম ও আবার ৫ খানা কাগজ দেখি···প্রবাসীর জন্য "দৃষ্টি-প্রদীপে"র কপি তৈরী করি।' (অ. দি. : ২৪৩)। খাতা দেখাকে 'কাগজ' দেখা ছাড়া আর কোনোভাবে কখনোই দিনলিপিতে উল্লেখ করতেন না বিভূতিভূষণ। ১৯৩৪-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক বিভূতিভূষণের হেড একসামিনর ছিলেন অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। সেই পল্লীগ্রামের এডুকেশন আর রিপন কলেজের শিক্ষা—একটার থেকে অন্যটাকে যে আলাদা করে নেবেন, সে সুযোগ বিভূতিভূষণের ব্যক্তিগত জীবন-জীবিকার দ্বন্দ্ব, তাঁর দেশকাল সমাজ-ইতিহাস-অর্থনীতি তাঁকে দেয়নি।

১৯৩৪ সালে 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাস ছাড়া আর যা যা লিখছেন বিভূতিভূষণ, তার মধ্যে আছে 'বিচিত্র জগৎ'-এর ফিচার। ওয়াল্টার স্কটের 'আইভান হো'র অনুবাদের কাজও এই বছরই শুরু হয়, যে অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৮ সালে জগত্তারণ দাসের বাণীভবন থেকে (অ. দি. : ২৯৫)। ১৯৩৪-এর ২৫ অক্টোবরের ডায়েরিতে আছে, 'সকালে উঠে লিখি আইভ্যান্‌-হো। কবে শেষ হবে কে জানে।' (অ. দি. : ৩০১)। বারাকপুরে গরমের ছুটিতে, আষাঢ় মাসের নির্জন দুপুরে কুঠীর মাঠে ব্যায়াম করা যে মানুষের দৈনন্দিনের অংশ (অ. দি. : ২৬৬), তিনিই শীতের মুখে স্কুলের ছুটি হলে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে গিয়ে Nature Mysticism সংক্রান্ত বই পড়েন (অ. দি. : ৩১৩)। U. P. Teachers' Conference থেকে Sunday's Debating Club, সর্বত্রই বিভূতিভূষণের গতি অবারিত (অ. দি. : ৩১০, ৩১৩)। বই পড়ারও বিরাম

নেই—মৃণালকান্তি ঘোষের 'পরলোকের কথা', সংস্কৃত গীতগোবিন্দ উত্তররাম-চরিত থেকে শ্লোক, আবার Louis Golding-এর উপন্যাস *Magnolia Street*। এপ্রিল মাসে Perry Allen-এর *Stewart's Handbook of the Pacific Islands* কেনেন, 'কাগজ' দেখার ফাঁকে ফাঁকে Axel Martin Munthe-এর স্মৃতিকথা *The Story of San Michele* পড়ে মুগ্ধ হন (অ. দি. : ২৪০), ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে ছুটে যান Abyssinia আর Maya Civilization সংক্রান্ত বইয়ের টানে (অ. দি. : ২৪৫); আবার John Middleton Murry-র *The Life of Jesus*-এও (অ. দি. : ২৮৯) বিভূতিভূষণের সমান আগ্রহ। টলস্টয়ের *What Men Live By*, বার্নার্ড শ'য়ের *John Bull's Other Island*, আইভান বুনিনের *A Gentleman from San Francisco and other Stories*, তারই মধ্যে সুকুমার রায়ের 'খাই খাই', এইসব পড়ার উল্লেখ মেলে বিভূতিভূষণের ১৯৩৪ সালের দিনলিপি জুড়ে।

সেই যে ১৯৩২-এ 'অপরাজিত' শেষ করবার সময় ভেবেছিলেন, 'সাধনা ভিন্ন উচ্চ outlook কি করে develop করবে? খানিকটা মাত্র আমার করেচে—আরও চাই—আরও অনেক চাই', সেই অঙ্গীকার যেন বিভূতিজীবনের প্রাত্যহিকে মিশে থাকে। তারই মধ্যে বাদ পড়ে না Alexnder Hall-এর *Torch Singer* অথবা James Whale-এর *Frankenstein*-এর মতো ছবি দেখা (অ. দি. : ২০৬, ২৩৫)। সেকালের নামকরা বাংলা ছবি 'রূপলেখা'ও দেখেন, দেখান খুকুকে (অ. দি. : ২৭৬)। সে সময় খুকুকে তিনি কলকাতা দেখাচ্ছিলেন। 'রূপলেখা', ছবি দেখার সঙ্গী ছিলেন সস্ত্রীক নীরদচন্দ্র চৌধুরীও। সাহিত্যিকের অঙ্গীকারেই বিভূতিজীবনে ১৯৩৪ সালটি শেষ হয়, ১৯৩৪ সালে ৩১ ডিসেম্বর দিনলিপির শেষ লেখা হয় 'Notes for 1935' শিরোনামে 'দৃষ্টিপ্রদীপ উপন্যাসখানি জ্যৈষ্ঠের মধ্যে শেষ করবো। জঙ্গলের বই আরম্ভ করবো। ছোটগল্পের একখানা বই বার করবো। ছোট একখানা উপন্যাস লিখবো।' (অ. দি. : ৩২৫)।

কিশোর সাহিত্যের আসরে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হদিস প্রথম পাওয়া যায় ১৯৩৩ সালে। 'মৌচাক' পত্রিকার শ্রাবণ ১৩৪০ সংখ্যায় "অতিথি" নামে যে গল্পটি লিখেছিলেন, বৈশাখ ১৩৫১তে অর্থাৎ ১৯৪৪-এ প্রথম প্রকাশিত 'তাল-নবমী' সংকলনে সেই কাহিনীরই নাম হল "রাজপুত্র" (বি. র. ৯ : ৩৭০-৭১)। "গঙ্গাধরের বিপদ" গল্পটি বেরিয়েছিল 'মৌচাকে'র কার্তিক ১৩৪১ সংখ্যায়, অর্থাৎ

১৯৩৪ সালে। সুধীরচন্দ্র সরকারের সম্পাদকীয় আগ্রহ তখনকার অনেক সাহিত্যিকের মতো বিভূতিভূষণকেও পৌঁছিয়ে দিল বালক-বালিকাদের জগতে। আষাঢ় ১৩৪২ থেকে 'মৌচাকে' ধারাবাহিক বেরোতে শুরু করে 'চাঁদের পাহাড়', চলেছিল ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র পর্যন্ত (বি র ৯ : ৩৬০, ৩৭১)। বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন, 'মৌচাকের লেখা যখন লিখতে বসি, তখন, কল্পনানেত্রে দেখি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও তাদের কর্মক্লান্ত পিতাঠাকুরদের উৎসুক দৃষ্টি; সবাই যেন লেখার দিকে চেয়ে আছে এক দৃষ্টে, তবে অক্ষমতার জন্য তাদের সে ঔৎসুক্য চরিতার্থ হয়ত সবসময় করে উঠতে পারি না, সে কথা আলাদা।' (বিশু মুখোপাধ্যায়, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ ব : ১৯৪ ; বি র ৯ : ৩৫৯)। সেই ১৯৩৫-এ 'চাঁদের পাহাড়' দিয়ে কিশোর-সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফল্যের সূচনা, তারপর 'মরণের ডঙ্কা বাজে' ধারাবাহিক প্রকাশিত হল ১৯৩৭ সালের শেষ থেকে। পৌষ ১৩৪৪ থেকে আশ্বিন ১৩৪৬ পর্যন্ত সুধীরচন্দ্র সরকারের বিখ্যাত 'মৌচাক' পত্রিকায় বিভূতিভূষণের দ্বিতীয় কিশোর-উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ (বি র ৯ : ৩৬৬)। 'হীরামাণিক জ্বলে' অবশ্য চারের দশকের কথা, 'মৌচাক' যা ছেপেছিল বৈশাখ ১৩৪৮ থেকে চৈত্র ১৩৪৯ পর্যন্ত (বি র ৯ : ৩৬৫); তার আগে বিভূতিভূষণের তৃতীয় কিশোর-উপন্যাস 'মিস্‌মীদের কবচ' গ্রন্থাকারে বেরিয়ে গেছে ১৯৪২-এর ১ এপ্রিল (বি র ৯ : ৩৬৯)।

১৯৩৫ অর্থাৎ যে বছরে কিশোরসাহিত্যে বিভূতিভূষণের শঙ্কর তার চাঁদের পাহাড় অভিযানের সূত্রে দেশজোড়া কিশোর-কিশোরী আর তাদের অভিভাবক-দের মাতিয়ে দিল, সেই বছর 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৪২ সংখ্যায় প্রকাশিত হল বিভূতিভূষণের বিখ্যাত ছোটগল্প "যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ" (বি র ৫ : ৪৮৫)। অর্থাৎ যে বছর 'দৃষ্টিপ্রদীপ' গ্রন্থাকারে বেরচ্ছে, "যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ" গল্পের ব্যঞ্জনা বাঙালি পাঠককে মুগ্ধ করছে, সে বছরেই বাংলার সংস্কৃতিজগৎ 'পথের পাঁচালী'-'অপরাজিত'র স্রষ্টার অন্য যাদুর সন্ধানও পেতে শুরু করছেন 'চাঁদের পাহাড়'-এর ধারাবাহিকতায়। ১৯৩৭ সালে সেপ্টেম্বর নাগাদ, বাংলা ১৩৪৪-এর পয়লা আশ্বিন মেসার্স এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স-এর প্রকাশনায় গ্রন্থাকারে 'চাঁদের পাহাড়'-এর প্রথম প্রকাশ। সুপ্রভাকে লেখা বিভূতিভূষণের চিঠিতে আছে (চিঠির তারিখে শুধুই লেখা ১৪ই কার্ত্তিক রবিবার) 'তোমার বাবার "চাঁদের পাহাড়" সম্বন্ধে অভিমত পড়ে খুসি হয়েচি। তিনি অনেক বই পড়েন, তাঁর মত খুব মূল্যবান মনে করি।' (অপ্রকাশিত)। ১৯৩৮-এর ৬ জানুয়ারি সুপ্রভাকে

বিভূতিভূষণ লিখছেন, '"চাঁদের পাহাড়" সম্বন্ধে তুমি ঠিকই বলেচে (চো?) ডিস্কোনেকের ছবিটা ওখানে দেওয়া উচিত হয়নি। ছবিটা ভালও হয় নি, কিন্তু ওরা বলে ছেলেদের কাছে ও ছবি নাকি একটা আকর্ষণ সৃষ্টি করবে, তাতে করে বইয়ের কাটতি হবে বেশী। হয়তো এদের কথাটা একেবারে অযৌক্তিক নয়, সেই ভেবেই মত দিয়েছিলুম।' (অপ্রকাশিত)। আরও পরে, ১৯৪০-এর ১০ সেপ্টেম্বর কল্যাণীকে লেখা বিভূতিভূষণের চিঠিতে দেখছি, '"চাঁদের পাহাড়" ভাল লেগেচে মায়ের, খুব আনন্দের কথা। বেশ, ও ধরণের adventure আরও লিখবো—আমারও ইচ্ছে রয়েচে লিখবার। তুমি তো আগেই পড়েছিলে, না? কিরকম লেগেচে, লিখো।' (বি র ১০ : ৩৫৮)।

খুকুকে উপহার দিয়েছিলেন যে বই, বাংলার নাবালক পাঠকদের জন্য প্রথম লিখেছিলেন যে উপন্যাস, যে বই দশকের পর দশক বাংলার নতুন নতুন বাল্য-কৈশোরের পরম আকাঙ্ক্ষিত সঙ্গী হয়ে উঠেছে, সেই 'চাঁদের পাহাড়' নিয়ে বিভূতিভূষণের একটা প্রসন্নতা বোধ একান্ত স্বাভাবিক; সেই স্বাভাবিকই এইসব পত্রাংশে ধরা পড়ে। 'চাঁদের পাহাড'-পরবর্তী কিশোর উপন্যাসটির সূচনাপর্বে বিভূতিভূষণ সুপ্রভাকে চিঠিতে লিখছেন, '"মৌচাক"এর নতুন উপন্যাস বড় তাড়াতাড়ি আরম্ভ করতে অনুরুদ্ধ হই। তোমায় তখন জানাবার সময় ছিল না। উপন্যাসটা কি নিয়ে তা এখন বলবো কেন? এ তোমার নিতান্ত ছেলেমানুষি··· না—কক্ষনো বলবো না কিসের উপন্যাস। সে দেখতেই পাবে। বল্লে, তোমার আর কোনো আগ্রহ থাকবে না পড়বার।' (অপ্রকাশিত)। যা নিয়ে সুপ্রভার এত ছেলেমানুষি (আর বিভূতিভূষণ নিজে ছেলেমানুষি কাকে বলে জানেন না মোটে, কেবল অন্যের ছেলেমানুষি ধরিয়ে দেন), সেই 'মরণের ডঙ্কা বাজে' লেখার সময় সাহিত্যিকের তথ্যসংগ্রহের একটি কাহিনী এই সূত্রে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। অমিয়া চৌধুরাণীর স্মৃতিচারণে আছে, 'তিনি (বিভূতিভূষণ) ছোট ছেলেদের জন্য একটা গল্পের বই লিখছিলেন···বইএ বিমান যুদ্ধের বর্ণনা দেবার সঙ্কল্প করে একদিন আমাদের বাড়ি এসে হাজির। এসেই আমার বড় ছেলেকে ডেকে বললেন "ওরে ভোঁদো, কোথায় তুই, শিগ্‌গির আয় বাবা! কতগুলি 'বমার'-এর নাম আমায় বলে দে।" যুদ্ধের সময় যে সব "বমার" ইত্যাদি ব্যবহার হত ছেলেরা তাদের বাবার কাছ থেকে সব ছবি দেখে তাদের নাম খুব রপ্ত করেছিল, সেটা উনি জানতেন। বড় ছেলে তখন মাত্র ছয় বছরের। সে বিভূতিবাবুর কথা কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে খেলে বেড়াচ্ছে, তিনি তার

পিছুপিছু দৌড়চ্ছেন আর বলছেন, "আয় না রে, তোর বাবা আসবার আগে আমায় বলে দে, তা না হলে তোর বাবা এসে গেলে আমায় জেরা করে মারবে।" ওদিকে আবার বন্ধুকে ভয় আছে, যদি তাঁর কাছে অজ্ঞতার জন্য লাঞ্ছিত হতে হয়।' (অমিয়া চৌধুরাণী, ১৯৯২ : ১৪২)।

এরকম অজ্ঞতা অসংগতি থেকে বিভূতিভূষণ মুক্ত ছিলেন না। যে বমারের বিষয়ে একটি ছ'বছরের বালকের কাছে পাঠ নিতে হয়, সেই বমারকে নিজের সাহিত্যের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করবার তাগিদ তিনি বোধ করেন। এই একই অসংগতির ভিন্নতর প্রকাশই কি বিভূতিভূষণের আচরণে, যখন তিনি নীরদচন্দ্রকে বিভিন্ন মেয়ের গল্প বলতেন, যারা কোনো-না-কোনোভাবে বিভূতিভূষণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে? নীরদচন্দ্র লিখেছেন, মেয়েদের আকর্ষণ করবার একটা ক্ষমতা বিভূতিভূষণের ছিল। তখনকার বাঙালি মেয়েদের নাকি খানিকটা লেখাপড়া শিখে একটা অভ্যাসই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সাহিত্যিক-কবি-শিল্পীদের চোখে না দেখেই তাদের প্রেমে পড়ে যাওয়া। বিভূতিভূষণের এসব গল্প শুনে নীরদ চৌধুরী তাঁকে তিরস্কার করতেন। তবে অমিয়ার সঙ্গে নীরদচন্দ্রের বিয়ের পর থেকে বিভূতিভূষণের এইসব প্রাণের কথা অমিয়াকেই শুনতে হত, সামলাতে হত বেশ কিছু কাণ্ডকারখানাও। যেমন, একদিন বছর বারোর একটি কিশোরীকে নিয়ে এসে বিভূতিভূষণ সোজা উঠে বসলেন অমিয়া চৌধুরাণীর খাটের উপরে, মেয়েটির ছোট ছোট হাতদুখানি বিভূতিভূষণের বড়সড় হাতের মধ্যে ধরা। নীরদ চৌধুরী লিখেছেন, If I had read Trollope then, I would have compared him to Johnny Emmes.' (Chaudhuri, 1987 : 92 93) বছর বারোর এই কিশোরী যে বারাকপুরের খুকু, তা বলাই বাহুল্য। আর সুপ্রভার সঙ্গে নৈকট্যের ব্যাপারে, শুধু নীরদচন্দ্র নন, অমিয়াও বেশ বিরক্ত হয়েছিলেন বিভূতিভূষণের উপরে।

এই বিভূতিভূষণই কিন্তু চরম অর্থাভাবের মধ্যেও Keith-এর *Antiquity of Man* না-কিনে থাকতে পারেন না, Hubble-এর বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলে বন্ধু নীরদচন্দ্রকে চমকে দেন। এই বিভূতিভূষণেরই জীবনের প্রথম উপন্যাস কয়েক পৃষ্ঠা মাত্র পড়েই নীরদচন্দ্র পরম মুগ্ধতায় উপলব্ধি করেন যে, এই উপন্যাসের যথাযোগ্য প্রকাশ একান্ত জরুরি। কিন্তু নীরদচন্দ্রের এই খাতিরের জায়গাটায় পৌঁছতে বিভূতিভূষণকে যতখানি দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল, তার অনেকটাই নীরদ চৌধুরীর অজানা। যেমন, নীরদ চৌধুরীর পথের হদিসও

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ আয়ত্তে নেই। কিন্তু যে স্বপ্ন নিয়ে যশোরের বারাকপুর গ্রাম থেকে কথকব্রাহ্মণের একান্ত অসচ্ছল পরিবারের বড় ছেলে পরিক্রমা শুরু করেছিল, সেই স্বপ্নের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সংস্কৃতি, আদব-কায়দা, প্রথা-বিধির আলোকিত বিশ্বে নীরদচন্দ্র চৌধুরী নিঃসন্দেহে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্রাধিকারী। তাই কি নীরদচন্দ্রের যা কিছু অজানা, সেই অজানা যেন অধিকারসম্মত, সংগত? আর বিভূতিভূষণের অজানাগুলো বার-বারই কেবলই বেমানান, শুধুই কৌতুককর?

নীরদচন্দ্র লেখেন, 'ইংরেজ যুগের আগে বাঙালীর মন "তদ্ভব" মাত্র ছিল। ...বহু বৎসর পতিত রাখিলে জমি যেমন উর্বরতা ফিরিয়া পায় বাঙালী সরল গ্রাম্য জীবনে নামিয়া তেমনি মানসিক উর্বরতা ফিরিয়া পাইয়াছিল। তাই ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের জীবন সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল। ...বানভট্টের কাদম্বরী পড়িয়া আমার বন্ধু বিভূতিভূষণের "পথের পাঁচালী" পড়িলে একদিকে যেমন বৈদগ্ধ্যের আকাশ পাতাল প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম হইবে, তেমনি আর এক দিকে বাঙালীর সহজ স্বাভাবিক জীবনের রসও দেখা যাইবে। বিভূতিবাবু উপন্যাসটির কয়েকটি পাতা লিখিয়াই আমাকে দেখান, তখনই মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বইটা শেষ করিতে আমি বলি। তখন যদি বাঙালীর প্রথাগত জীবনের গ্রাম্যতা সত্ত্বেও উহার মধ্যে নবজীবনের বীজ উপ্ত রহিয়াছে, এই আবিষ্কার আমি না করিতাম, তাহা হইলে "পথের পাঁচালী"তে বাঙালী জীবনের যে-দৈন্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে অসহনীয় পীড়া অনুভব করিতাম, হয়ত বইখানা না লিখিতেই বলিতাম, উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক। আরও আশ্চর্যের কথা এই, অপুর চরিত্রে বিভূতিবাবু নিজেকে চিত্রিত করিলেও নিজের সম্বন্ধে তিনি একবারে অন্যরকমের ধারণাও করিতে পারিতেন। টলস্টয়ের "ওয়ার অ্যাণ্ড পীস" তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় উপন্যাস ছিল। একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে তিনি বলিলেন "জানো, নীরদ, আমি কিন্তু পিটার বেজুখভের মত।" বিভূতি-বাবুকে আমি সর্বদাই অত্যন্ত "তদ্ভব" বলিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতাম। তাঁহার মুখের এই উক্তি শুনিয়া হতভম্ব হইয়া গেলাম। যাঁহারা টলস্টয়ের উপন্যাসখানা পড়িয়াছেন তাঁহারা আমার বিস্ময়ের কারণ বুঝিতে পারিবেন। দরিদ্র কথক-ব্রাহ্মণের সন্তান নিজেকে রুশীয় অভিজাত কাউন্ট বেজুখভের সমকক্ষ মনে করিতে পারিয়াছিল। উহা ইংরেজী শিক্ষার ফল।' (নীরদচন্দ্র চৌধুরী, ১৯৮৮ : ২৬)।

প্রবাসী-মডার্ন রিভিউর নীরদচন্দ্র চৌধুরী, পাশ্চাত্য সংগীতের সমঝদার

অনুরাগী নীরদচন্দ্র চৌধুরী কি তবে ইংরেজি শিক্ষায়, ইঙ্গবঙ্গ সংস্কৃতিতে এমন কোনো অধিকার নিয়ে জন্মেছিলেন, যার অনুষঙ্গে পরাধীন উপনিবেশের আবর্ত থেকে তিনি একেবারে মুক্ত? নাকি বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে শিক্ষিত বাঙালির যে অসহায় অসংগতি বিভূতিজীবনের এবং বিভূতিসাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেই অসংগতির অন্য এক স্তর নীরদচন্দ্রেও বর্তায়? যাকে নীরদচন্দ্র নব-জীবন বলেন, সে জীবন যে কতখানি নিরালম্ব, তা কি নীরদ চৌধুরীর বোধচৈতন্যে ধরা পড়ে? তবু সেই নিরালম্বের অর্জনে তিনি কথকব্রাহ্মণের পুত্রের অগ্রাধিকারী। এই আচ্ছন্নতায় তিনি বুঝে উঠতে পারেন না যে অপুর বিভূতিভূষণ আর রুশীয় অভিজাত কাউন্ট বেজুখভের উপমায় নিজেকে চিহ্নিত করতে চাওয়া বিভূতিভূষণ আসলে একে অপরের থেকে 'একেবারে অন্যরকমের' নন। বরং একজনের মধ্যে অন্যজনকে খুঁজে নেওয়া চলে। নিশ্চিন্দিপুরের অপু পুঁথি-পাঁচালীর আবর্ত পেরিয়ে যেতে চায় বিলাত যাত্রীর চিঠির পৃথিবীতে, ভূচিত্র-বীজগণিতের বিশ্বে; বারাকপুরের বিভূতি পৌঁছিয়ে যান টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' পড়বার অধিকারে। তখন তিনি নিজেকে ভাবতে পারেন কাউন্ট বেজুখভের মতো। নিশ্চিন্দিপুরের অপু আর বারাকপুরের বিভূতি কিংবা নীরদচন্দ্রের বন্ধু বিভূতিভূষণ—এদের দুজনের স্বপ্ন, দুজনের অগ্রগমন, দুজনের অসংগতি আসলে বাঙালির সেই সভ্যতারই চিহ্ন, নীরদচন্দ্ররা যাকে বলেন নবজীবন। যে তৎসমের জোরে নীরদচন্দ্র বন্ধুর লেখায় বাঙালির প্রথাগত জীবনের গ্রাম্যতা-দৈন্যকে ক্ষমা করে দেন, রচনার মধ্যে নবজীবনের রেশ খুঁজে পেয়ে, সেই তৎসমের স্বরূপ তবে কেমন? তার হদিস তদ্ভব বিভূতিভূষণের চিঠিপত্রের ভিতরে খানিকটা মিললেও মিলে যেতে পারে।

সুপ্রভা দত্তের বোনঝি রেবার সঙ্গে নীরদ চৌধুরীর কোনো এক নিকট আত্মীয়ের বিয়ের কথা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে সুপ্রভাকে লেখা বিভূতিভূষণের একটি তারিখবিহীন চিঠিতে আছে, 'তোমাকে একটা কথা লিখি। রেবার বিবাহ সম্বন্ধে এই কথাটা রবিকে লিখে দিও। নীরদ চৌধুরী ও তার দাদা সেদিন আমায় ডাকিয়ে বলেচেন—ওঁরা হাজার টাকার গহনা ও ছ'শো টাকা বিবাহের খরচ চেয়েচেন। এ বাদে দানসামগ্রী, খাট একখানা, ড্রেসিং টেবিল একখানা, বরভরণ আংটি, ঘড়ি, গরদের জোড়।...এই নিয়ে ওদের সঙ্গে সেদিন একঘণ্টা ধরে তুমুল তর্কবিতর্ক চালিয়েচি। সে এক diplomatic conference-এর ব্যাপার। আমায় দুপুরে সেদিন নীরদ খেতে নিমন্ত্রণ করেছিল এই কথাবার্তা

বলবার জন্যে। নীরদের দাদা চারুবাবুও ছিলেন।' (অপ্রকাশিত)। এও তবে নবজীবনেরই আরাধনা, যেখানে গ্রাম্যতা নেই, দৈন্য নেই, অসংগতি নেই। অসংগত তো শুধুই বিভূতিভূষণ, যিনি 'মৌচাক' পত্রিকায় কিশোর উপন্যাস বানাতে বানাতে ছ'বছরের বালকের কাছে বমারের নাম জানতে চান ; যিনি বারোবছরের গ্রাম্য কিশোরীর হাত ধরে কলকাতায় বন্ধুর বাড়িতে এসে বন্ধুপত্নীর খাটের উপরে উঠে বসেন ; যিনি নিজের চোখে 'ইউরেশীয়ান প্রস্টিটিউট' দেখবেন বলে, কোন্ এক পরিচিতের কথায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নভেম্বরের শীতে সন্ধ্যা ন'টা থেকে ঘণ্টাদুয়েক অপেক্ষা করেন ; পরিচিত জন অথবা তাঁর সেই 'প্রস্টিটিউট' কারোই পাত্তা মিলল না যখন, তখন নীরদ চৌধুরীকে পুরো ঘটনাটি যিনি বলতে পারেন, এবং বন্ধুর কাছে তিরস্কৃত হতে পারেন (Chaudhuri, 1987 : 94) ; দরিদ্র কথকব্রাহ্মণের সন্তান হয়েও যিনি রুশীয় অভিজাত কাউন্ট বেজুখভের সঙ্গে নিজের মিল খুঁজে পান।

কোলাহলে নিভৃতে এবং সাহিত্যে

নীরদচন্দ্র চৌধুরীর অনুপ্রেরণা যে বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' নির্মাণের সহায় ছিল, এ কোনো নতুন তথ্য নয়। বিভূতিভূষণ নীরদচন্দ্রকে চিঠিতে লিখেছেন, 'যখন আর কেউ আমাকে উৎসাহ দেয় নি, একমাত্র তুমি দিয়েছিলে।' দুয়ের দশকে নিজেদের মেসবাসের দিনগুলোতে অনেকের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সহ্য করেছেন নীরদচন্দ্র এবং বিভূতিভূষণ—দুজনের কেউই তখন বিশেষ কিছু করেন না, পড়াশুনো নিয়ে থাকেন। পরবর্তীকালে, যখন দুজনের জীবনেই খানিকটা প্রতিষ্ঠা এসেছে, বিভূতিভূষণ বন্ধুকে লিখেছিলেন, '…যারা নাকি তোমাকে ও আমাকে বিদ্রূপ করে বেড়াতো, তারা আজ কোথায়?' (অমিয়া চৌধুরাণী, '৯২ : ১৪৯)। সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি, ব্যস্ততা সেই 'অপরাজিত' প্রকাশের আমল থেকে, কি তারও আগে থেকে বিভূতিভূষণের চেনা জিনিস। 'অপরাজিত' দ্বিতীয় খণ্ড যখন প্রকাশিত হচ্ছে, তখন থেকেই সভাসমিতিতে আমন্ত্রণের বিরাম নেই। ১৯৩২ সালের ১ মে শ্রীরামপুরে আনন্দপরিষদের অধিবেশনে সভাপতি হয়ে গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। সভায় যাওয়ার আগে বিশ্রামের ব্যবস্থা ছিল 'কল্লোল' আর 'উপাসনা' পত্রিকার লেখিকা লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে। সেখানে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা, সঙ্গে বেশ স্নিগ্ধ জলযোগ। আগের দিন ৩০ এপ্রিল কলকাতায় রমেশচন্দ্র সেনের সাহিত্যসেবকসমিতির সভার সভাপতিত্ব করেছেন

বিভূতিভূষণ ; সেখানে গল্প পড়েছিলেন অচিন্ত্য সেনগুপ্ত (তৃণাঙ্কুর, বি র ২ : ২০৯-১০)। এইসব সভাসমিতি, নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ খুব খারাপ বোধহয় লাগত না বিভূতিভূষণের। কারণ পরবর্তী বছরগুলিতে এইসব সভার, সম্মেলনের সংখ্যা বিভূতিভূষণের প্রাত্যহিকে যেভাবে বেড়েছিল, তাতে খ্যাতির বিড়ম্বনাবোধ তাঁর হত বলে অন্তত দিনলিপিতে মনে হয় না। আসলে বিভূতিভূষণ সম্ভবত তেমনি মানুষ, যিনি নির্জন পরিবেশে থাকলে কোলাহল-কলরবের জন্য আর ভিড়ের ভিতরে পড়লে নির্জনতার জন্য আকুল হতেন। একে হয়তো তাঁর জীবনানুরাগের অংশই ভাবা যায়।

'উৎকর্ণ' দিনলিপি লেখা নাকি শুরু হয়েছিল ১৯৩৬ সালের ১১ অক্টোবর (বি র ৪ : ৪৯৪)। এই দিনলিপির শুরুতেই আছে, 'ক'মাস ধরে কি ছুটোছুটিটাই করে বেড়াচ্চি কলকাতায়। এখানে মিটিং, ওখানে engagement, এখানে পার্টি, হয়তো আসলে দেখচি যে টাকাকড়ি নিতান্ত মন্দ আসচে না, কিন্তু অনুভূতির বৈচিত্র্য ও গভীরতা ওখানে কৈ? উত্তেজনা থাকে বটে কিন্তু সত্যিকার আনন্দ নেই।' (বি র ৪ : ৩৪৮)। সত্যিই 'উৎকর্ণ' দিনলিপিতে বিভূতিভূষণের ব্যস্ততার অন্ত নেই। আজ মুড়াগাছায় লাইব্রেরির বার্ষিক উৎসব তো কাল চন্দননগরে সভাপতিত্বের আমন্ত্রণ। আবার চন্দননগরের সভা আর কলকাতার শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের বার্ষিক উৎসব একই দিনে পড়ে যায়। তাই চন্দননগরে সভার কাজ শেষ হওয়ার আগেই সভাপতির আসনে সুরেন গোস্বামীকে বসিয়ে চলে আসেন হাওড়া; সেখান থেকে বাসে দেশবন্ধু পার্ক। পার্কস্কুলের প্রাঙ্গণে শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের অভিনয় হচ্ছে। (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৩৫৭, ৩৬১)। নৃত্যগোপাল পাঠাগারের এই সভার বর্ণনা সুপ্রভা দত্তকে লেখা বিভূতিভূষণের একটি চিঠিতে মেলে। যদিও চিঠিটি তারিখবিহীন, তবু সময়ের হিসেবে ওই চিঠি আর এই সভাকে মেলানো যায়। প্রসঙ্গত বলে নেওয়া ভালো যে ১৯৩৬-এর অক্টোবরের কাছাকাছি সময়ে, অর্থাৎ 'উৎকর্ণ' দিনলিপির সূচনাপর্বেই শিলঙে সুপ্রভার কাছে গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ, যার সুখস্মৃতি, আবার সামান্য ভুল বোঝাবুঝিতে সিলেটের পথে সুপ্রভার সঙ্গে যেতে না-পারা, সবই 'উৎকর্ণ', দিনলিপির অংশ (বি র ৪ : ৩৪৮-৫৭)।

যে চিঠিতে চন্দননগরের সভার কথা আছে, তাতে দেখি, 'কলকাতা থেকে সুরেন মৈত্র, সুরেন গোস্বামী, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়…গিয়েছিলেন। সুরেন মৈত্র ব্রাউনিংয়ের পঞ্চাশটী বাছা বাছা কবিতা অনুবাদ করেছেন, বই বার হবে

শীগগির, নাম দিয়েচেন "ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা"। তুমি যে কবিতাটা অনুবাদ করেছ, সেটাও উনি করেছেন। সভায় উনি চারটা অনুবাদ পড়লেন, তার মধ্যে এটাও ছিল, alternative অনুবাদ হিসেবে ওটাও "বিচিত্রা" থেকে পড়া হোল সভায়। আমি ছিলুম সভাপতি। ছন্দের দিক থেকে তোমার অনুবাদ ভাল হয়েচে আমার মনে হোল। বল্লুম সে কথা। তবে উনি মূলের কিছু বাদ দেন নি —তুমি কিছু কিছু বাদ দিয়েচ। হরিহর শেঠ ও বিজয়লালবাবু বল্লেন তোমার অনুবাদ ওঁদের বেশী ভাল লেগেছে। অবিশ্যি এঁরা কেউ জানেন না যে আমি তোমায় জানি। আমি কিন্তু বলিও নি—কালই ওঁদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। হরিহর শেঠ চন্দননগরের একজন বিশিষ্ট নাগরিক, চন্দননগরের ও কলকাতার ঐতিহ্য সম্বন্ধে "প্রবাসী'তে অনেক প্রবন্ধ লিখেচেন। খুব পড়াশোনা আছে। উনি জিগ্যেস করছিলেন—এ মেয়েটীর কবিতা "বিচিত্রা"তে মাঝে মাঝে পড়ি, আমার বেশ ভাল লাগে। ইনি কল্‌কাতায় থাকেন? সুরেন মৈত্র তোমার পরিচয় সামান্যই জানেন, যা জানেন বল্লেন। তুমি শিলংয়ে থাকো, কলেজে কাজ করো—এইটুকুই মাত্র জানেন দেখলুম। আমি কিছু বলিনি।···তোমার কথা অত হোল তাই তোমাকে চিঠি না দিয়ে পারলুম না।' (অপ্রকাশিত)

১৯৩৭ সালে চন্দননগরে যে সাহিত্যসম্মেলনের সভা উদ্বোধন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সেখানেও গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। বিলেত থেকে সদ্য প্রত্যাগত নীহাররঞ্জন রায়, তাছাড়া সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং অমল হোমের সঙ্গে সেই সভায় বিভূতিভূষণের দেখা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বোটেও গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। সেখানে সুনীতিকুমারের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আলোচনার বিষয় ছিল বাগান (উৎকর্ণ বি র : ৩৭১-৭২)। ১৯৩৭-এর গোড়ায় পাটনার প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী, সঙ্গে সজনীকান্ত দাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিমল গোস্বামীদের যাওয়ার কথা। শেষমুহূর্তে বিভূতিভূষণ যোগ দিলেন। নীরদ চৌধুরীর যা গরম জামাকাপড় ছিল, তা পাটনার শীতের পক্ষে যথেষ্ট নয়। অমল হোমের কাছে চেয়ে অমিয়া স্বামীর জন্য কিছু গরম জামা জোগাড় করেছেন। কিন্তু বিভূতিভূষণের তো কিছুই নেই! শেষপর্যন্ত নীরদচন্দ্রের ভাই বিনুর ওভারকোট ইত্যাদি পরে বন্ধুপত্নীর ওয়ার্ডরোবের আয়নায় নিজেকে দেখে দেখে আর কূল পান না বিভূতিভূষণ, 'বাঃ! খাসা হয়েচে।' তারপর বন্ধুর হোল্ডঅলে ধোপদুরস্ত বিছানাপত্র ভরা হচ্ছে দেখে বললেন, 'নীরদ যাচ্ছে যেন রাজাটা, আমি সঙ্গে

যাচ্ছি চাকরটা।' পথের পাঁচালী-অপরাজিত-দৃষ্টিপ্রদীপ-মেঘমল্লার-যাত্রাবদল-মৌরীফুল-চাঁদের পাহাড়-এর যিনি নির্মাতা, তাঁর ব্যাগ খুলে নোংরা একটা লাল গামছা আর আধময়লা ধুতি ছাড়া কিছুই পেলেন না অমিয়া। তাড়াতাড়িতে যতটা সম্ভব তাঁকেও গুছিয়ে দিলেন। কিন্তু বিভূতিভূষণের যেন ওই ছেঁড়া-আস্ত কি নোংরা-পরিষ্কারে কিছুই যায় আসে না (অমিয়া চৌধুরাণী, ১৯৯২ : ১৪২-৪৩)। পাটনায় যাওয়ার পথে বিভূতিভূষণ একাদশীর রাত্রে জ্যোৎস্নালোকিত প্রকৃতিকে উপভোগ করেছিলেন। দিনলিপিতে আছে, '···পাটনা এলুম বহুকাল পরে। ১৯২৭ সালের পরে আজ ৯/১০ বছর পাটনা আসিনি। আমি, নীরদ, ব্রজেনদা, সজনী সবাই একসঙ্গে এলুম, কাল রাত্রে একাদশীর পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় বর্দ্ধমানের বড় বড় মাঠের দিকে চেয়ে আমার মনে আসছিল একটি প্রবহমান জীবনধারার কথা, যা চিরপুরাতন অথচ প্রতিদিন নিজেকে নতুন করে খুঁজে পায় —সৃষ্টির মধ্যে, রসের মধ্যে যার সার্থকতা। কত সুপ্ত গ্রাম তো এই জ্যোৎস্নায় স্নাত হচ্চে, কিন্তু বহু দূরে এক ক্ষুদ্র পল্লীনদীর তীরবর্ত্তী এমন একটি গ্রামের ছবি বার বার মনে আসে কেন?' (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৩৬৪)। সেদিন সন্ধ্যায় বি.-এন্. কলেজের হলে বিরাট সভায় নীরদচন্দ্র চৌধুরীর অভিভাষণ বিভূতিভূষণের কাছে খুবই চিন্তাপূর্ণ মনে হল। (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৩৬৫)।

১৯৩৭ সালে পুজোর ঠিক আগে বিভূতিভূষণ বক্তৃতা দিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজে; পুজোর মধ্যে আমন্ত্রণ ছিল মজিলপুরে দত্তদের বাড়িতে—সাহিত্য-সেবক সমিতির নিমন্ত্রণ। আর পুজোর ছুটির শেষদিনটিতে শ্রীরামপুরের টাউন হলে সভায় কথাসাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন বিভূতিভূষণ। তাঁর অভিভাষণ দিয়েই সেদিনের সভা শুরু হল। (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৩৮৯-৯০, ৩৯২, ৪০১-২) বেড়ানোও কিন্তু থেমে নেই। সুপ্রভার কাছে শিলঙে বেড়াতে গেছেন এই বছরে দু-দুবার। প্রথমবার সুপ্রভার সঙ্গে দেখা হয়নি, দ্বিতীয়বার হয়েছে। লুম-শিলঙের পাইনবনে মেঘ জমা, পাইনবনের মধ্যে পরীতলা ভ্যালি, ওয়ার্ড লেক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, চেরাপুঞ্জি, সর্বোপরি সুপ্রভার সঙ্গ; এসব সুখস্মৃতি ছড়িয়ে আছে বিভূতিভূষণের 'উৎকর্ণ' দিনলিপির ছত্রে ছত্রে। ১৯৩৭-এর পুজোর ছুটিতে রওনা হলেন চাটগাঁয়ে। একবার মনে হয়েছিল, এবার ছুটিতে কোথাওই বুঝি যাওয়া হল না; অসময়ে পা মচকে গিয়ে এমন বেকায়দায় পড়েছিলেন। শেষ-পর্যন্ত চাটগাঁ, বিভূতিভূষণের রেণু-মার বাড়ি। রেণুর সঙ্গে বিভূতিভূষণের যোগাযোগ অনেকদিন ছিল। যোগাযোগের সূচনা ১৯২২ সালে, যখন গোরক্ষণী

সভার প্রচারকের কাজে বিভূতিভূষণ চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন। অন্নদা দত্ত নামক এক ভদ্রলোকের নামে সমিতির চিঠি ছিল, তাঁর বাড়িতে বিভূতিভূষণ ওঠেন। প্রায় অপরিচিত একটি পরিবারের কাছে আন্তরিক যত্ন পাওয়ার অভিজ্ঞতা বিভূতিভূষণের জীবনে তখন খুব বেশি ঘটেনি। সেই বাড়ির যে ছোট মেয়েটি বিভূতিভূষণের মুখে গল্প শুনতে ভালোবাসত, তেরোবছর বাদে কলকাতার বালিগঞ্জে তার সঙ্গে বিভূতিভূষণের আবার দেখা হয়। তার নাম তখন মণিকুন্তলা সেন। এই মণিকুন্তলার ছোটবোন রেণু (উর্মিমুখর, বি র ৩ : ৫০৯-১০)। সম্ভবত ১৯৩৬-এ বিভূতিভূষণ মণিকুন্তলাদের সঙ্গে রাজপুরে যান পিকনিক করতে।

সেই পিকনিকেই মণির বোন রেণুর সঙ্গে আলাপ। রেণু বড় ভালো গায়, চমৎকার নাচে খুব বুদ্ধিমতী। বিভূতিভূষণকে সে বলে, 'এক একজনকে কেমন হঠাৎ বড় ভাল লাগে, আপনাকে যেমন লেগেচে। দেখচেন না সব সময় আপনার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি—আর-জন্মে আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল।' বিভূতিভূষণ বলেছিলেন, 'আমি তোর বাবা হব, তুই আমার মেয়ে হবি?' 'তাহলে মেয়ের মতই দেখুন', বলে বিভূতিভূষণের কাঁধে মাথা রাখে রেণু। বিভূতিভূষণ লিখেছেন, বাবার শোকে রেণু নাকি পূর্বজন্মে আত্মহত্যা করেছিল, ওকে কে বলেচে নাকি। অদ্ভুত মেয়ে।...সারা পথ টেনে দু-বোনে গান গাইলে। বালিগঞ্জে জোর করে আমায় নামিয়ে নিলে। একটা গন্ধরাজ ফুল কোথা থেকে তুলে নিয়ে এসে আমায় দিলে...বললে—ঠিকানা দেবেন, বাড়ি গিয়ে পত্র দেব। দুঃখ এই যে শীগ্‌গির চলে যাচ্চি। আগে কেন ভাব হল না...ভারী ভাল লাগে ওকে, সব সময়ে "বাবা" বলে ডাকবে আমাকে।' (উর্মিমুখর, বি র ৩ : ৫২২-২৩)। এই উষ্ণতার বিনিময় যে কত দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল, তার প্রমাণ আছে রমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায়, 'উনি নিজে আমাকে বহুদিন বলেছেন, এক সময়ে নাকি উনি সন্তান-সন্তান করে ক্ষেপে গিয়েছিলেন। বহু লোকের কাছে শুনেছি, অনেককে উনি নাকি বলতেন—আমাকে বাবা ডাকবি?—ডাক না।...উনি নাকি পিতৃ-সম্বোধন শুনবার জন্য নানা প্রকার ঘুসও দিতেন কাউকে কাউকে।...ওঁর ধর্ম-মেয়ে, নাম তার রেণু...আমার বিয়ের পরে রেণু এসে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে।...আমাকে ডাকত রেণু মা-মণি বলে, ওঁকে বলত বাবা। রেণুর সঙ্গে ওঁর মাঝে মাঝে দেখা হত কলকাতায়। রেণু তখন কলকাতাতেই ছিল।...বাবলু যখন এক বছরের, সে সময় একদিন একটি নিরেট-লোহার সুন্দর মোটরগাড়ী

এনে বাবলুকে দেন। উনি বলেন, তোর দিদি দিয়েছে—রেণুদিদি।' (রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৭৭ ব: কাজল ৩-৪)।

১৯৩৬ এর ওই পিকনিকের কথা সুপ্রভাকে চিঠিতে লিখেছিলেন বিভূতিভূষণ, 'সেদিন বেলা, নীরদবাবু, পশুপতিবাবু আমরা সবাই মোটরে যশোর রোড ধরে মছলন্দপুর বলে একটা ছোট গ্রামের ধারে মাঠে বিকেলে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে গল্পগুজব করে এলাম।...সোনারপুব স্টেশনের একটা মান্থলি টিকিট কিনেচি। স্কুলের ছুটীর পরে রোজই ট্রেণে সোনারপুব স্টেশনে গিয়ে নামি। তারপর রেল থেকে দূরে একটা মজাপুকুর আছে মাঠের মধ্যে, সেখানটাতে বসি চুপ করে। ভারী চমৎকার জায়গা, পুকুর নয় তাকে দিঘী বলা যায়—কিন্তু এখন জল কম, পুকুরপাড়ে একটা বটগাছ, চারিধারে ধূ ধূ মাঠ, শান্ত, নির্জ্জন। চৈত্র জ্যোৎস্না বড় সুন্দর খোলে...গত রবিবারে কালবৈশাখীর ঝড়ে মাঠের মধ্যে একটু বিপদে পড়েছিলাম—ঝড় তো ছিলই, তারপর যেমন বৃষ্টি, তেমনি শিল—ভিজে একসা হয়ে গেলাম...পরশু ঐ পুকুরের ধারে মণিকুন্তলা ও ওদের প্রতিবেশিনী কয়েকটি মেয়ে, ওর বোন রেণু আরও অনেকে বালিগঞ্জ থেকে পিক্‌নিক্ করতে গিয়েছিল। আমায় ওরা যেতে বলেছিল...মণি বল্লে সে খুব সাঁতার দিতে পাবে, কিন্তু কাজের সময়ে ডাঙা থেকে বেশী দূর জলে তাকে দেখা গেল না।...কলাব পাতা পেতে সবাই একসঙ্গে খেতে বসলাম—বেণুন বলে একটী ছেলে, মণির ভাই বুদ্ধু, মণি, ওর ছোট বোন রেণু বেণুনের এক বৃদ্ধ জ্যাঠামশায়, মণির দুটি ছোট মেয়ে, যমুনা ও অন্নপূর্ণা বলে আরও দুটী বড় মেয়ে। তারপর মণি গান শোনালে —বেশ গাইতে পারতো একসময়ে...ওর বোন রেণু চমৎকার নাচলে ..মণির সঙ্গে তোমার সম্বন্ধে কত কথা হোল...তোমাকে খুব ভালবাসে দেখলুম...ভারী সজীব মেয়ে...ওর ছোট বোন রেণু স্কিপিং করতে লাগলো, তো মণিও আরম্ভ করে দিলে...গড়িয়ার জলায় জ্যোৎস্না পডেচে—ওরা দুই বোনে সারাক্ষণ গান গাইতে গাইতে এলো।' (অপ্রকাশিত)।

এই রেণুদের বাড়িতে চাটগাঁয়ে গেলেন বিভূতিভূষণ ১৯৩৭ এর পুজোর ছুটিতে। 'উৎকর্ণ' দিনলিপিতে আছে 'চাটগাঁয়ে এসে নীরদবাবুর বাসা খুঁজে না পেয়ে রেণুদের বাড়ীতে এলুম। রেণু তো অপ্রত্যাশিতভাবে আমায় দেখে খুব খুশি। ওপরের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে তুললে। রেণুর দাদা এল, মা এলেন। সবাই খুশি আমায় দেখে। রেণু বাক্স থেকে কাপড় বের করে কুঁচিয়ে নীচে নিয়ে গেল স্নানের জায়গায়...দুপুরে খাওয়ার পরে একটু ঘুমুব বলে শুয়েছি—রেণু

এসে গল্প করতে লাগল, ঘুম চটে গেল। ও চলে গেলে ঘুমুবার চেষ্টা করতেই ঘুম এল। ও কখন চা এনে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু আমায় ডাকে নি। সেই সময় আমায় একটু নড়তে দেখে বল্লে—উঠবেন না? চা এনেছি, কিন্তু আপনি ঘুমিয়ে আছেন দেখে আমি আর ডাকিনি। চা খাবেন আসুন উঠে।' (বি র ৪ : ৩৯২-৯৩)। পরদিন রেণুর দাদা বুদ্ধুর সঙ্গে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া। দিনলিপিতে আছে, 'সমুদ্রকে সামনে করে একটা আমলকী গাছে ঠেস্ দিয়ে পড়ন্ত বেলায় অনেকক্ষণ বসে রইলুম। চন্দ্রনাথ পাহাড়কে কতভাবে যে দেখলুম আজ।' (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৩৯৪)। সুপ্রভাকে লেখা চিঠিতে আছে, '...চন্দ্রনাথ পাহাড়ে গিয়েছিলুম পুজোর সময়। আমার ভাই বারণ করেছিল ও পা নিয়ে কোথাও যাবেন না। আমি না শুনেই চলে গেলুম ষষ্ঠীর দিন সকালে। সপ্তমীর দিন সকালে গিয়ে পৌঁছুই...চাটগাঁয়ে রেণুদের বাড়ী গিয়েছিলুম একদিন, তারা কিছুতেই ছাড়ে না, আসতে দেয় না, তিনদিন বাংলোই। একদিন বিকেলে (প্রথম অষ্টমীর দিন) চন্দ্রনাথ পাহাড়ের ওপরে একা একটা আমলকী গাছ ঠেস্ দিয়ে ঘন জঙ্গলের মধ্যে বসে আছি, বিকেলের ছায়া নিবিড় হয়ে উঠেচে, পেছনে উঁচু পাহাড়ের দেওয়াল, একটা ঝরণার আওয়াজ বনের মধ্যে দিয়ে পাচ্চি, আমার সামনে মাইল দুই দূরে সমুদ্র—তখন মনে হোল বনের মধ্যে ঠিক যেন কাঁসর বাজচে—ঠিক একখানা ভাঙা কাঁসরের আওয়াজ।...একদিন পাহাড়ের জঙ্গলে রাস্তা হারিয়ে গেলুম। দুপুর বেলা, ভয়ানক রোদের তাত, একটা বনকলার পাতা হাতে নিয়েছি, সেখানা পেতে যেখানে বেশ ভাল লাগচে একটু বসচি—জঙ্গলের মধ্যে একটা সরু রাস্তা গিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল, কিছুতেই পথ খুঁজে পাইনে...একজায়গায় একটা ছোট্ট গুহা—গুহাটী ভারী চমৎকার দেখতে। জল চুঁইয়ে পড়চে, গুহার ছাদে জল ফেটে পড়ার দরুণ...অসংখ্য শিবলিঙ্গের সৃষ্টি করেচে...জায়গাটা অন্ততঃ সমতলভূমি থেকে হাজার খানেক ফুট ওপরে—কি বড় বড় বনের গাছ সেখানে আর কি ঘোর নির্জ্জন! গাছ-পালার ফাঁক দিয়ে যখন তখন চোখে পড়ে দূরের সমুদ্র। ভারী সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য চন্দ্রনাথের...শিলং-গৌহাটি রোডে নীচের দিকে যেমন ঘন অরণ্য ও বিশাল বনস্পতির দল, ঠিক অমনি চন্দ্রনাথ পাহাড়ের দৃশ্যটা। একই প্রকৃতির জঙ্গল, কেবল flora স্বতন্ত্র।' (অপ্রকাশিত)।

এই নির্জনতায় প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকা যে বিভূতিভূষণের পরম কাম্য, সে তো জানা কথা, বিশেষত সেই ১৯৩৭ সালে, যখন 'আরণ্যক' উপন্যাসের নির্মাণ

বিভূতিজীবন ব্যেপে আছে। কিন্তু সুপ্রভাকে লেখা ওই চিঠির পরবর্তী অংশে আবার হদিস মেলে সেই প্রকৃতিপ্রেমিকের, যিনি নির্জনতার মধ্যে মানুষের গলার স্বরের জন্য, বিশাল ধূ ধূ প্রান্তরের মধ্যে দাঁড়িয়ে বারাকপুর গ্রামের স্নিগ্ধতার জন্য, ভ্রমণের বাঁকে বাঁকে অন্দরের উষ্ণতার জন্য আকুল হতেন। বিভূতিভূষণ লিখছেন, 'অষ্টমীর সন্ধিপূজোর দিন দেখি একটা ছোট গ্রামে ছোট্ট একখানা মেটে বাড়ীতে পূজো হচ্চে। সন্ধ্যাবেলা, অনেক লোক জড় হয়েচে আরতি দেখতে। প্রতিমাখানাও ছোট, গ্রামের অনেক মেয়ে এসেচে, গ্রামের নাম সীতাকুণ্ড, চন্দ্রনাথ পাহাড়ের নীচেই। আমি এদিকে দাঁড়িয়ে আছি ওদিকে মেয়েরা দাঁড়িয়ে আরতি দেখচে – আমার মনে হোল আজ ঠিক এইসময় সুপ্রভাও হয়তো ওদের বাড়ীতে দাঁড়িয়ে এমনি আরতি দেখচে। মনটা খুব খুসি হোল ভেবে যে এখান থেকে সুপ্রভার বাড়ী বেশী দূর নয়। এই দেশেই। চাটগাঁয়ে ফিরে এসে ভাবলুম কুলাউড়া স্টেশনে যাবার সময় সুপ্রভাকে আসতে লিখবো, ওর সঙ্গে দেখা করে যাবো। রেণুদের বাড়ী একটা টাইম টেব্ল ছিল, তাতে দেখলুম সিলেট থেকে কুলাউড়া ৬৭ মাইল, অনেক দূর। ভাবলুম পূজোর সময় আর তাকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। অষ্টমীর দিন চাটগাঁ থেকে রওনা হই, নবমীর দিন রাত্রে কলকাতায় আসি। বিজয়ার দিন সকালে বনগাঁয়ে এসে বিকেলে নৌকা করে বারাকপুর আসি আমাদের এখানে বাঁওড়ের ধারে বিজয়ার মেলা দেখতে। আবার সন্ধ্যার পরেই ফিরে যাই বনগাঁয়ে।' (অপ্রকাশিত)।

১৯৩৭ সালে পুজোর আগে বেরিয়ে গেছে 'বিচিত্র জগৎ' (সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৭০ : ৩৮৫)। এ বই বিভূতিভূষণ উৎসর্গ করেছেন তাঁর রেণু-মাকে। যে চিঠিতে চন্দ্রনাথ ভ্রমণের গল্প বলেছেন সুপ্রভাকে, সেখানেই বিভূতিভূষণ লিখেছেন, 'রেবাকে বোলো "বিচিত্র জগৎ" ভাল করে পড়তে— তার বাইরের জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান কিছু কম। দেশলাইয়ের ম্যাজিকের কি খবর?' (অপ্রকাশিত)। ১৯৩৭ সালে বিভূতিভূষণ যখন সুপ্রভার কাছে গিয়েছিলেন শিলঙে, তখন সুপ্রভার বোনঝি রেবা আর সেবার সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়। সম্ভবত 'চাঁদের পাহাড়'-'বিচিত্র জগৎ'-এর লেখক তাদের সঙ্গে বেশ জমিয়েছিলেন; হয়ত তখনি শিখিয়েছিলেন দেশলাইয়ের ম্যাজিক! নাকি রেবা-সেবাই সে

ম্যাজিকটা দেখিয়ে বাক্সটা দিয়ে দিলুম।' (বি র ৪ : ৩২৯)। ১৯৩৭ সালের শারদীয় 'পরিচয়' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল বিভূতিভূষণের বিখ্যাত ছোটগল্প "কিন্নর দল"। সেই বছরেই অর্থাৎ 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার আশ্বিন ১৩৪৪ সংখ্যায় বেরিয়েছে "মণি ডাক্তার" (বি র ৪ : ৪৯১)। আগের বছর অর্থাৎ ১৯৩৬-এ নীরদচন্দ্র চৌধুরী সম্পাদিত 'নূতন পত্রিকা'র প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (৩১ জানুয়ারি ১৯৩৬) বেরিয়ে গেছে "সই" গল্পটি। ১৯৩৬ এই 'বঙ্গশ্রী'র আশ্বিন ১৩৪৩ সংখ্যায় বিভূতিভূষণ লিখেছেন "অন্নপ্রাশন" (বি র ৫ : ৪৮৫)। 'প্রবাসী'র কার্তিক ১৩৪৩ এবং পৌষ ১৩৪৩ সংখ্যায় যথাক্রমে বেরিয়েছিল "খুড়ীমা" এবং "তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প"। ১৯৩৭-এই অর্থাৎ আশ্বিন ১৩৪৪ এ বিভূতিভূষণের 'জন্ম ও মৃত্যু' গল্পসংকলনটি প্রকাশিত হয় (বি র ৫ : ৪৮৫)।

এ সংকলনে আছে "অরন্ধনের নিমন্ত্রণ", যে কাহিনীর কুমুর সঙ্গে সুপ্রভা খুকুর মিল খুঁজে পেয়েছিলেন বলে খুকু রাগ করেছিল তার সুপ্রভাদির উপরে। আছে "ডাকগাড়ী" গল্পটি, যার উল্লেখ মেলে সুপ্রভার কাছে লেখা বিভূতিভূষণের চিঠিতে। তবে, খুবই সম্ভব ভুলবশত গল্পটিকে সেই চিঠিতে "ডাকগাড়ী"র বদলে "ডাকঘর" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভূতিভূষণ লিখেছেন, "ডাকঘর" গল্পটা এখানেও অনেকেই ভাল বলেচে। তোমার মতের প্রতি আমার এই জন্যে যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, জানো? কিন্তু কোন মেয়েটা তোমার মত? "ঐ মেয়েটী যেন আমি এমনি মনে হয়" এ কথার মানে কি? তুমি না সুষি, না রাধা। তুমি ওদের মত হতে যাবে কেন? বালাই-ষাট্।' (অপ্রকাশিত)। জন্ম ও মৃত্যু' সংকলনটি বিভূতিভূষণ সুপ্রভাকে উৎসর্গ করেছিলেন।

"ডাকগাড়ী" গল্পটি কেমন করে বিভূতিভূষণের কাছে ধরা দিল, তার বর্ণনা আছে লেখকের বহু ভ্রমণের সঙ্গী যোগেন্দ্রনাথ সিনহার স্মৃতিচারণে। বিভূতিভূষণ নাকি যোগেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, 'এক গ্রামে…একটি সুন্দরী যুবতীকে আমি ডোবায় বাসন মাজতে দেখেছিলাম। মনে মনে ভাবলাম যে যুবতীটি এ গ্রাম ছাড়া বাইরের কোন কিছুই তো জানে না; এখন যদি এর কাছে কলকাতার বর্ণনা দেওয়া যায়, তাহলে তাকে রূপ দিতে এর কল্পনা কতদূর সমর্থ হবে, আর রূপদানের পর এর মনোভাব কেমন হবে? বাস্, এই *পর্য্যন্তই বাস্তবিকতা,*

'আমি একবার এলাহাবাদে এক সঙ্গীত সম্মেলনে গিয়েছিলাম। রাত্রিতে বৈঠক বসেছিল, ওস্তাদ ফৈযাজ খাঁ প্রমুখ গায়কবৃন্দ ছিলেন। প্রায় রাত বাবোটার সময়—ভৈববী গান শুরু হোল। এতে ভারী সোব গোল আরম্ভ হল এবং একটী শ্রোতা টিপ্পনিও করলেন—"ওস্তাদজী, ভৈরবী ত ভোরের বাগিনী, আপনি এখন মধ্যরাত্রে ভৈরবী গান আরম্ভ করলেন ?" এ কথায় ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ একটু মুচকি হেসে বল্লেন—"নিয়মের কথা আপনি যা বললেন তা সম্পূর্ণ ঠিক, কিন্তু নিয়ম সব জায়গার নয়। মামুলী গাইয়েরা রাগরাগিনীর সময় অনুসারেই গান করে থাকেন। আর আমরা ওস্তাদবা সময়কে বাগ বাগিনীর অনুবর্ত্তী কবি। যদি মধ্য রাত্রে ভৈববী গেয়ে শ্রোতাদেব মনে সকাল বেলাব ছবি এঁকে দিতে না পারি, তাহলে আর ওস্তাদি কিসের ?"

'এই কথা বলে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সেই ভৈববী আবাব গাইতে লাগলেন। সত্য বলছি শ্রোতাদেব উপব যেন মেস্‌মেবিজম্ ছাইল। সমস্ত জেনে শুনেও আমাদেব একপ বোধ হতে লাগলো যেন ভোর হয়ে গেছে, আমাদেব ঘড়িই যেন আমাদের ফাঁকি দিচ্ছে। ভোরবেলাব মুবগীব ডাকও কাবো কাবো কানে আসতে লাগলো। আশ্চর্য্য সেই বৈঠক। সকলেরই হৃদয়-মন গায়কেব কাছে বন্দী হয়ে গেল এবং আধ্যাত্মিক স্তবে উন্নীত হতে লাগলো। তখন আমাব হৃদয়ঙ্গম হল যে সঙ্গীত সত্যসত্যই মানুষেব মন থেকে দূষিত যা কিছু সব দূব কবে নির্ম্মল ও পবিত্র ভাব এনে দিতে পাবে। আব কী ? এই হল আমার কাহিনীব মোমেণ্ট। পাত্র আর ঘটনা সবই কল্পনা।' (সতীশচন্দ্র ঘোষাল, আশ্বিন ১৩৭৭ ব : ১০০-১)। বেশ কয়েক বছর বাদে প্রথম প্রকাশিত 'উপলখণ্ড' গল্পসংকলনের "আহ্বান" গল্পটির উৎসকে খানিকটা পড়া যায় বিভূতিভূষণেব ১৯৩৭ সালেব দিনলিপি থেকে, '...সকলের চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা মুসলমান বুড়ী মাবা গেল. আমি তখন ওখানে। তার কবর দেওয়ার সময়ে আমি কতক্ষণ আমতলায় বসে কালু মুসলমানের সঙ্গে গল্প করলুম। আর রাধাবল্লভ বোষ্টমের বাড়ীব পাশের পথটা দিয়ে এলুম কতকাল পবে এক সন্ধ্যায় বুড়ীকে দেখতে। তখনো সে বেঁচে ছিল—পরদিন সকালে মারা গেল।' (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৪০৪)। বারাকপুর গ্রামের এই দীনহীন অনাত্মীয় মুসলমান বৃদ্ধাটি বিভূতিভূষণকে বড স্নেহ করতেন। "আহ্বান"-এব স্রষ্টা বুড়ির কববে একমুঠো মাটি দিয়েছিলেন।

চন্দ্রনাথ পাহাড় থেকে ফিরে ১৯৩৭-এ 'আরণ্যক' উপন্যাসে আবার হাত দিয়েছেন বিভূতিভূষণ। 'উৎকর্ণ' দিনলিপিতে আছে, 'আজ বিকেলে কুঠীর মাঠে

গিয়ে…ঘন অপরাহ্নের ছায়ায় ঘাসের ওপর একটা মোটা চাদর পেতে বসে, "কেঁয়োঝাঁকা" ফুলের সুঘ্রাণের মধ্যে "আরণ্যক"-এর একটা অধ্যায়ের খসড়া করছিলুম', অথবা 'আজও বিকেল তিনটার সময় কুঠীব মাঠের জলার ধারে সেই ঝোপটাতে এসে বসে "আরণ্যক"-এর একটা অধ্যায় লিখছি।' (বি র ৪ : ৩৯৮-৯৯)। কার্তিক ১৩৪৪ সংখ্যা থেকে 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'আরণ্যক' ধারাবাহিক বেরোনো শুরু হয়। (বি র ৫ : ৪৭৮)। P.E.N. ক্লাবে বিভূতিভূষণের যাতায়াত ছিল। ১৯৩৭ সালের শেষের দিকে এই ক্লাবেব একটি বিশেষ অধিবেশনে সরোজিনী নাইডু ছিলেন প্রধান অতিথি। তিনি বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলেন বলেই এই বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৪০২)। সুপ্রভাকে লেখা একটি তারিখবিহীন চিঠিতে এই অধিবেশনের কথা আছে ; 'মধ্যে একদিন PEN club থেকে আমরা সরোজিনী নাইডুকে চাএ নিমন্ত্রণ করি, কারণ তিনি বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। চৌরঙ্গীতে একটা হোটেলে আমাদেব পার্টি ছিল। সরোজিনী নাইডু বেশ মজলিসী গল্পগুজব করলেন ও সবাইকে খুব হাসালেন।' (অপ্রকাশিত)। এই একই সময়ে বিভূতিভূষণকে 'বিচিত্রা' পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হয়। 'উৎকর্ণ' দিনলিপিতে আছে, 'আমি রাজী হইনি। সুশীলবাবু আজ বিশেষ পীড়াপীড়ি করলেন। আমাব তো ইচ্ছে নয়।' (বি র ৪ : ৪০৩)।

১৯৩৭-এর অনেক আগে ১৯৩০ সালে চলচ্চিত্র সাপ্তাহিক 'চিত্রলেখা'য় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম থাকত সম্পাদক হিসেবে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ২৯ কার্তিক, অর্থাৎ ১৯৩০-এর ১৫ নভেম্বর। পত্রিকার প্রচ্ছদকাহিনী সাধারণত হত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্র-পরিচালক, চিত্রাভিনেতা বা চিত্রাভিনেত্রীকে নিয়ে। দেশের এবং বিশেষ করে বিদেশের ছবির বেশ বিস্তারিত খবর 'চিত্রলেখা'য় থাকত। ১৯৩০-এর ১৫ নভেম্বর থেকে ১৯৩১-এর ১৪ মার্চ পর্যন্ত যে আঠারোটি সংখ্যা কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে, তার প্রত্যেকটির প্রিণ্টলাইনের নিচে লেখা থাকত, 'Edited by Bibhutibhusan Banerji, Printed at the PRABASI PRESS, 120-2 Upper Circular Road, Calcutta by B N Sen and published by him from 14 Clive Street, Calcutta'। শুধু প্রথম দুটি অর্থাৎ ১৯৩০-এর ১৫, নভেম্বর এবং ২২ নভেম্বরের সংখ্যায়

Bibhutibhusan Banerji-র পরিবর্তে ছাপা হয়েছে B. B. Banerji.

বিভূতিভূষণের দেশী-বিদেশী চলচ্চিত্র দেখবার আগ্রহকে হয়ত এর সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়। অবশ্য 'চিত্রলেখা'র আঠারোটি সংখ্যায় বিভূতিভূষণের নিজের কোনো লেখা ছিল না বলেই মনে হয়। আর সজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি'তে মিলে যায় 'চিত্রলেখা'র প্রকাশ এবং তার সম্পাদক নির্বাচনের কাহিনী। সজনীকান্ত দাস লিখেছেন, '...এই সময়ে শ্যামবাজারে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের উপর "চিত্রা" চলচ্চিত্রগৃহের প্রতিষ্ঠা হইল; মালিক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকার। তখনও চিত্রনির্মাণ প্রতিষ্ঠান নিউ থিয়েটার্সের পত্তন হয় নাই, তবে তোড়জোড় চলিতেছে। সরকার মহাশয় শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট একটি চলচ্চিত্র-সাপ্তাহিক প্রকাশের প্রস্তাব করিলেন—সম্ভবত উভয়েরই মালিকানা স্বত্বে। কেদারনাথ তাহার ইচ্ছা আমাকে জ্ঞাপন করিয়া যথাবিহিত করিতে আদেশ করিলেন। চড়ুকের পিঠ ঢাকের বাদ্য শুনিয়াই সড়সড় করে, আমি হাতে স্বর্গ পাইলাম। হুকুম হইল প্রবাসী প্রেস সংক্রান্ত কাহারও সম্পাদক হওয়া চলিবে না। আর একজনের নাম চাই। হাতের কাছেই ছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহাকে মাসিক দশ টাকা সেলামী কবলাইয়া সম্পাদক-পদের নাম ধার দিতে রাজী করাইলাম, লেখার দক্ষিণা স্বতন্ত্র। আসলে সম্পাদনা পরিচালনা মুদ্রণের যাবতীয় ভার আমার উপরেই পড়িল। ১৯৩০ সনে ১৫ই নভেম্বর চলচ্চিত্র-বিষয়ক সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা "চিত্রলেখা" বাহির হইল। ১৮ সংখ্যা বাহির হইয়া অর্থনৈতিক কারণে ইহার প্রচার বন্ধ হয়। পত্রিকাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল বলিয়াই আমার ধারণা।' (সজনীকান্ত দাস, ১৩৮৪ ব: ৩১১)।

সাতবছর পরে, ১৯৩৭ সালে 'বিচিত্রা'র সম্পাদক হওয়ার ব্যাপারটা আর ঠিক 'সম্পাদক-পদের নাম ধার' দেওয়ার মতো নয়। বিভূতিভূষণও শেষ পর্যন্ত রাজি হননি, তবে ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছিলেন। যে চিঠিতে সুপ্রভাকে PEN ক্লাবের বিশেষ অধিবেশনে সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে আলাপ আলোচনার কথা লিখছেন, সেখানেই আছে, 'দেখ একটা কথা লিখি! অনেকদিন থেকে অর্থাৎ পুজোর আগে থেকে "বিচিত্রা"র সম্পাদক হবার জন্যে আমায় সুশীলবাবু ও নীরদবাবু বলছিলেন। মাঝে মাঝে প্রায়ই একথা ওঠে! আমি কথা চাপা দিয়ে আসচি। মধ্যে একদিন...সুশীলবাবু প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে "বিচিত্রা"র সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা...উপেনবাবুকে জিগ্যেস্ করলাম তিনি "বিচিত্রা" কেন ছাড়ছেন।

তিনি বল্লেন ব্লাড্ প্রেসারের কষ্ট পাচ্ছেনও বটে, তাছাড়া কোন সিনেমা কোম্পানী তাঁকে ডিরেক্টার করে নেবে বলেচে। তাতে বেশী পয়সা, তাতেই যাবেন। উপেনবাবুর ও সুশীলবাবুর বিশেষ ইচ্ছা যে আমিই "বিচিত্রা"র সম্পাদকীয় ভার নিই।...আমায় এ বিষয়ে একটা পরামর্শ দিতে পারো?... একটা বড কাগজের সম্পাদক হতে গেলে আমাকে অনেক বাজে খাটুনি খাটতে হবে, অনেক প্রুফ্ দেখতে হবে রোজ! ছুটী ও অবকাশ খুবই কম পাবো। আমার নিজের লেখা suffer করবে। চেয়ারে বসে বসে কাজ করতে হবে চব্বিশ ঘণ্টা, তা আমার পোষায় না। আমি চঞ্চল স্বভাবের মানুষ, এক জায়গায় বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারিনে। সারা সময় "বিচিত্রা" নিয়ে থাকতে হবে...সুবিধে এই যে মাইনে অনেক বেশী স্কুলের তুলনায়। ফ্রি কোয়ার্টারই পাওয়া যাবে, সম্পাদকের একটা নামও তো বটে। তুমি কি বল?' (অপ্রকাশিত)।

সুপ্রভা যাই বলে থাকুন, স্কুলের চাকরি ছেড়ে 'বিচিত্রা'র সম্পাদকীয় দায়িত্ব বিভূতিভূষণ গ্রহণ করেননি। কিন্তু স্কুলশিক্ষকের সামান্য বেতনে যে বিভূতিভূষণের খেদ ছিল, তার প্রমাণ আছে সুপ্রভার স্মৃতিকথায়। বিভূতিভূষণ একবার বললেন, '...ভারি তো ৪০্ টাকা মাইনে তার আবার এত। আবার ম্যাট্রিক পরীক্ষার খাতা দেখা হ্যানো তেনো।' সুপ্রভা অবাক, 'এতকাল শুনে আসচি আপনি মাইনে পান ৭০্ টাকা, আজ আবার এ কি শুনছি?' বিভূতিভূষণ বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে বললেন, 'কি যে বলো, ৪০্ টাকা মাইনে পাই বলতে লজ্জা করে না, একটা মান সম্মান আছে তো? এই দ্যাখোনা তুমি কেমন ১০০্ টাকা মাইনে, থাকবার ঘর—এসব পেয়েচ। এ না হলে চাকরী?' খুব স্বাভাবিক যে বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পাঁচবছর পরে 'পথের পাঁচালী' চলচ্চিত্র দেখতে দেখতে সুপ্রভার মনে পড়েছিল অভাবী বিভূতিভূষণের কথা, 'জানো ওই লেখকের এখন আর অভাব নেই। কতগুলো বই সিনেমা হয়েছে তো।' সুপ্রভা প্রশ্ন করতেন, 'তা আপনি কেন সিনেমার জন্য বই দেন না?' উত্তরে বিভূতিভূষণ বলতেন, 'আমি যে Cinema হবে ভেবে কিছু লিখতে পারিনে, আর পথের পাঁচালী তো কেউ আর ছবি করবেনা।' (সুপ্রভা চৌধুরী, ১৯৯৫ : ৭৩)।

১৯৩৮ সালের জানুয়ারির গোড়ায় Indian Science Congress হয়েছিল কলকাতায়। সেনেট হলে ৩ জানুয়ারি বড়লাট সে সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন। বিভতিভূষণ সুপ্রভাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন জানুয়ারির ৩, ৪, ৫, ৭ আর ৮ তারিখের অনুষ্ঠান সূচি, সঙ্গে ছিল অনুরোধ, নির্দেশও বলা চলে—

'...Sir James Jeans ও Sir Arther Eddington—বিখ্যাত astronomer ও astrophysicist—এঁদেব দর্শন পাওয়া কলকাতায় বসে, এ একটা সৌভাগ্যেব কথা। তার ওপবে এঁদের public lecture হবে সিনেটে astronomy সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে।..যদি পাবো, সে সময় কলকাতায় এসো। এ একটা মস্ত এডুকেশন—এঁদেব দেখা ও বক্তৃতা শোনা। তোমাদেব কলেজেব অন্য teacher-দেব আসতে বলবে। জ্ঞানবিজ্ঞানেব সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ এভাবেই রাখা দবকার, যখন সকলেই শিক্ষাদান নিয়ে আছো।' (অপ্রকাশিত)। বিজ্ঞ নে বিভতিভূষণেব আগ্রহের কথা নীবদচন্দ্র চৌধুবীব মতো বন্ধুবা জানতেন। সেকথা লিখেছেন সজনীকান্ত দাসও, বিভূতিভূষণেব মৃত্যুব পবে ১৯৫০ সালেব ৫ নভেম্বরেব আনন্দবাজাব পত্রিকায়—'ভাবপ্রবণ বিভূতিভূষণ যে বিজ্ঞানেব একজন নিষ্ঠাবান ছাত্র ছিলেন এবং নক্ষত্রলোকেব বহস্য অভিনিবেশ সহকাবে অধ্যয়ন কবিতেন—একথা অনেকেব কাছে নূতন ঠেকিবে। প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিক জগতেব নানা বিচিত্র খবব তাঁহাব নখাগ্রে থাকিত এবং পবিচিত অপরিচিত সকলকে ধবিয়া পবলোকতত্ত্বে পাবদর্শী কবিয়া তোলাব বাতিকও তাঁহাব ছিল।'

১৯৩৮-এব সেই বিজ্ঞান কংগ্রেসে বিভূতিভূষণেব আলাপ হয়েছিল জেমস্ জিনস্ এবং অ্যালবার্ট ডেভিস মিড-এব সঙ্গে। জিনস্-এর অটোগ্রাফ নিয়ে তিনি প্রশ্ন কবেছিলেন, জিনস্ ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফব সাইকিক্ রিসার্চেব সঙ্গে জড়িত কিনা। জিনস্ নাকি বলেছিলেন, তিনি জড়িত নেই, তিনি ও জিনিস বিশ্বাস করেন না। আর এই বিজ্ঞান কংগ্রেসে তাঁব বক্তৃতার বিষয় কী, বিভূতিভূষণ তা জানতে চাইলে, জিনস্ বলেছিলেন 'নেবুলা'। (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৪০৪-৫)। আবার ৬ জানুয়ারি ১৯৩৮-এব চিঠিতে সুপ্রভাকে বিভূতিভূষণ লিখেছেন যে তিনি জেমস্ জিনস্কে দুটি প্রশ্ন করেছিলেন, Dean Irge এব বইয়ের প্রতিবাদ জিনস্ কবেননি কেন, আর পৃথিবী ভিন্ন অন্য গ্রহে নক্ষত্রে জীববাস সম্বন্ধে জিনসের মত কী। উত্তর দিতে নাকি পাঁচ ছ'মিনিটের বেশি সময় চলে গিয়েছিল, যদিও প্রথমে দুমিনিট সময় দিতেও তিনি আগ্রহী ছিলেন না, কারণ দার্জিলিঙে গিয়ে গলায় সর্দি বসে ব্যথা হয়ে তাঁর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। একই চিঠিতে বিভূতিভূষণ লিখছেন, 'আমি তো সেনেটের পেছন দিয়ে আশুতোষ মিউজিয়মের দোর দিয়ে ঢুকে দেখি হলে মাত্র ছ'জন লোক আগে থেকে চুপ করে বসে। তারপর লোকের ভিড় বাড়তে লাগলো, শেষে দাঙ্গা, দরজা ভাঙাভাঙি, হাতাহাতি, হৈ হৈ কাণ্ড। তবে অধিকাংশ লোক হুজুগে পড়ে এসেচে নইলে Jeansএর Nebulae সম্বন্ধে

বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা শুনবার জন্য পাগল, এত জ্ঞানপিপাসা এখনও বাংলাদেশে হয়নি।' (অপ্রকাশিত)। PEN ক্লাবের পক্ষ থেকে কালিদাস নাগের বাড়িতে জিনস্, এডিংটন এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে 'lunch'-এর নিমন্ত্রণে ডাকার কথা আছে, কালিদাস নাগই যে মিড-এর সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিয়েছেন, এসব কোনো খবরই সুপ্রভাকে লিখতে ভোলেননি বিভূতিভূষণ।

আরো লিখেছেন, 'কলকাতায় যে কি কাণ্ড চলচে সে তুমি সুদূর শ্রীহট্টের একটা বাজে পাড়াগাঁয়ে বসে কিছুই বুঝতে পারবে না। ···একই সময় বিখ্যাত খেলোয়াড় টিল্ডেনের টেনিস খেলা, লর্ড টেনিসনের দলের ক্রিকেট, আর্ট প্রদর্শনী, বিজ্ঞান কংগ্রেস, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের বক্তৃতা, বেকার ল্যাবরেটারিতে বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনী—সব একসঙ্গে চলচে।···এখানকার রাস্তাঘাটে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের বড় বড় অধ্যাপকগণ ঘুরে বেড়াচ্চেন, এক হাজার ডেলিগেট্ এসেচে এই কংগ্রেসের জন্যে নানা স্থান থেকে···বৈদেশিক ডেলিগেট এসেচে প্রায় ২৫০ শো, এদের সকলেই বিখ্যাত অধ্যাপক ও বৈজ্ঞানিক সত্যি এইসময়ে যদি এখানে থাকতে তুমি! আমাদের কলকাতা সহর একেবারে লণ্ডন হয়ে গেছে।' (অপ্রকাশিত)। ১৯৩৮-এর ২২ জানুয়ারি পাটনা কলেজের সাহিত্য সমিতির অধিবেশনে বিভূতিভূষণ ছিলেন সভাপতি। সেদিন আবার চিঠি লিখছেন সুপ্রভাকে, '···এখানে দুপুরের আহারাদির পরে অধ্যাপক ৺যোগীন্দ্র সমাদ্দার মশায়ের বাড়ীর ছাদে বসে নির্জ্জনে তোমায় এই চিঠি লিখচি।···আজ সভার কাজ সাঙ্গ করে এখানেই থাকবো। একটা পার্টি আছে রাত্রে, কাল সকালের এক্সপ্রেসে বক্তিয়ারপুর যাবো, সেখান থেকে নালন্দা ও রাজগির দেখতে যাবো কালই। পরশু অর্থাৎ সোমবার রাত্রে হাওড়ায় গিয়ে নামবো।' (অপ্রকাশিত)। সেদিনের সভা থেকে যখন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার সময় উঠে আসছেন বিভূতিভূষণ, সভাপতির আসনে তারাশঙ্করকে বসিয়ে রেখে, ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার অভিযোগ করেন, '···একটা কথা বলতে সঙ্কোচ হচ্চে আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আপনারা কলকাতা থেকে এসে বক্তৃতাটি দিয়েই পালান, এতে এখানকার লোক দুঃখিত।' (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৪০৯)।

পাটনা থেকে বক্তিয়ারপুর হয়ে রাজগির যাওয়ার পথে শো স্টেশনে বিভূতিভূষণের সঙ্গে দেখা হয়েছিল গ্রাম্য হিন্দি কবি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদের। দিনলিপিতে আছে, 'লোকটিকে এখানে সবাই পাগল বলে—তা তো বলবেই। কবিকে চিনবার মত লোক এসব পাড়াগাঁয়ে কে আছে? কবি আমার সঙ্গে

পরিচিত হয়ে খুবই আনন্দ প্রকাশ করলেন। আসবার সময় তিনি দয়া করে শো স্টেশনে আবার আমাদের কামরাতেই উঠে দেখা করেছিলেন।' (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৪১০)। বাংলার পাঠক তখন 'প্রবাসী' পত্রিকার পাতায় পাচ্ছেন সত্যচরণের আরণ্যক অভিজ্ঞতার হদিস। সত্যচরণের জঙ্গলমহালের জীবনে এসে পড়ল কবি ভেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ। এমন করেই এক দশকের এপার ওপার মিলে যায়—কোথায় দুয়ের দশকে বিহারের ঘোষ এস্টেটের জঙ্গলমহালের তত্ত্বাবধান আর কোথায় ১৯৩৮-এর গোড়ায় শো স্টেশনে দেখা গ্রাম্য কবি! আর এই সেতুবন্ধনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ দেখেন আর দেখান রাজু-মটুকনাথ যুগলপ্রসাদ-মঞ্চী ভানুমতীদের। এই বিভূতিভূষণের কলকাতা লণ্ডন হয়ে ওঠে, আবার কখন কলকাতার বিভূতিভূষণ, সাহিত্য সম্মেলনের বিভূতিভূষণ, সভাপতিত্বের বিভূতিভূষণ হয়ে যান সোনভাণ্ডার গুহা থেকে গৃধ্রকূট পর্বত ভ্রমণের নেশায় পাগল বিভূতিভূষণ। পরমুহূর্তেই হয়ত তিনি সবথেকে নিশ্চিত বোধ করেন বারাকপুরের বিভূতির পরিচয়ে। তারই ভিতরে চলে 'আরণ্যক'-এর নির্মাণ।

ফেব্রুয়ারিতে ছিল বনগ্রাম সাহিত্য সম্মেলন। সেখানে সভাপতি হয়ে গিয়েছিলেন খগেন্দ্রনাথ মিত্র। সরস্বতীপুজোর সপ্তাহটা সম্মেলনের ব্যস্ততায় কাটল। বিভূতিভূষণকে সেই সম্মেলনে মানপত্র আর অভিনন্দন দেওয়া হল। পরের সপ্তাহেই ছিল কৃষ্ণনগর সাহিত্য সম্মেলন। ইতিমধ্যে পাটনা থেকে বিভূতিভূষণ ফিরবার পরে সুপ্রভা এসেছিলেন কলকাতায়, তাকে নিয়ে 'চিত্রা' সিনেমায় 'মুক্তি' দেখতে গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। রাজপুর রিপন লাইব্রেরির উৎসবে যাওয়া, মাঝে আবার রংপুরে সারস্বত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করা, বছর চারেক বাদে একবার গালুডি যাওয়া, এইসব মিলেমিশে বিভূতিভূষণের দৈনন্দিন চলে, চলে 'আরণ্যক' লেখা। সেবছর গ্রীষ্মের ছুটিতে বারাকপুরে ভয়ানক বর্ষা। সেই সময় একদিন আকাশ সামান্য পরিষ্কার হলে, পচা রায়ের সঙ্গে কলাতলার দোয়া পার হয়ে সুন্দরপুরের কাছাকাছি বেড়াতে যান বিভূতিভূষণ। সেখানে জলার ধারে বসে শুনেছিলেন সেই কাহিনী; কেমন করে পচার পঞ্চাননমামা ফাঁকি দিয়ে বিয়ে করেছিল। বিভূতিসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সংযোজন "পাঁচুমামার বিয়ে" ছোটগল্পটির সূচনা এইখানে। গল্পটি ১৯৪১ সালে প্রকাশিত 'বেনীগীর ফুলবাড়ী' সংকলনে যুক্ত হয়েছিল। (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৪১১-২৬)। ১৯৩৮ সালের ১ জুন গরমের ছুটিতে বর্ষণমুখর বারাকপুর থেকে সুপ্রভাকে

শিলঙে চিঠি লেখেন বিভূতিভূষণ, 'এখানে গত ৪/৫ দিন ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেল। আজই একটু রোদ উঠেছিল, তাও বিকেলের দিকে। এমন বৃষ্টি জ্যৈষ্ঠ মাসে আমার জ্ঞানে তো কখনও হয়নি।...আচ্ছা শিলংএ কি এর কিছুও গিয়ে পৌছয় নি? অপূর্ব্ব বর্ষার দৃশ্য দেখলাম এবার, শিলং টিলং বাজে, এ ধরণের পরিপুর্ণ বর্ষার দৃশ্য সেখানে কোথায় পাবে, কোথায় সেখানে খানা, ডোবা, বিল, বাঁওড়, নদী? ব্যাঙের ডাক নেই বলেই তো লিখেচ, ব্যাঙের ডাক না থাকলে আবার বর্ষা কি? মাঠ দিয়ে, রাস্তার পাশের খানা দিয়ে কলকল করে তোড়ে জলের স্রোত এই চারদিন অনবরত বয়ে চলেচে—আর সেই জলে লোকে জাল, ঘুনি, পোলো প্রভৃতি দিয়ে মাছ ধরেচে অজস্র। বড় বড় কই, সরলপুঁটি, বাটা মাছের সের গোপালনগরের হাটে ৪ পয়সা করে। এখন অবিশ্যি একটু বেড়েচে।... হ্যাঁ, নিজেই ঘরকন্না করচিই তো ...খুকু যখন তখন এসে সাহায্য করতে পারে না, তবুও যা পারে করে। সেদিন মাংস রাঁধতে জানিনে বলে ওদের বাড়ী থেকে মাংস রেঁধে দিয়ে গেল। আজ রেঁধেছিলাম কাঁটাল বিচিভাতে, পটল-ভাজা, আলুভাজা, মায় মাছ চচ্চড়ি। ডাল রাঁধতে জানিনে, খুকু ওদের বাড়ীর ডাল দিয়ে যায়। তবে কদিন উনুন ধরানোর যা কষ্ট গিয়েচে ঝড়বৃষ্টিতে! কাঠ সব ভিজে একসা, উনুনে দিই কেবলই ধোঁয়া। খুকু এসে উনুন ধরিয়ে দিয়ে গেল দুদিন, তবে রান্না হয়। জানো, সুপ্রভা রাঁধতে বসে কতবার তোমার কথা মনে হয়।' (অপ্রকাশিত)।

সেবছর দোলের সময় ভাটপাড়ায় মামাবাড়িতে গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ, সেখান থেকে ঘোষপাড়ায় দোল দেখতে যান (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৪১৯)। গরমের ছুটি বারাকপুরে কাটিয়ে কলকাতায় ফিরেই নানান ব্যস্ততা। সাহিত্যিক আড্ডা আলোচনা, রেডিয়োতে যাতায়াত, তারই মধ্যে একবার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করা। আবার বারাকপুরে এলেন বিভূতিভূষণ ২৯ জুলাই। কলকাতার কর্মব্যস্ত জনপ্রিয় সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাঝেমধ্যেই বারাকপুর না হলে দিন চলে না। কিন্তু কেমন সেই বারাকপুর বাস? রাতে নিজের ঘরে শুয়ে শুনতে পান ন'দিদির ঘর থেকে ভেসে আসা খুকুর গলা। অথবা চৌকিদার হাঁকতে বেরিয়ে রাতের অন্ধকারে তাঁর ঘরের মধ্যে লণ্ঠন বাড়িয়ে দেখে। বিভূতিভূষণ বলেন 'কিরে, ভাল আছিস?' চৌকিদার বলে, 'হাঁ বাবু, আছি। কবে আলেন বাবু?' (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৪৩৩-৩৬)। বারাকপুরের বিভূতির নিঃসঙ্গে ওই 'কবে আলেন বাবু'র সঙ্গটুকুও কম প্রয়োজনীয় নয়। কে বলতে

পারে, চৌকিদারের ওই লণ্ঠনের আলোয়, গলার স্বরে, দূর থেকে ভেসে আসা খুকুর চিরচেনা গলার কলহাস্যে বিভূতিভূষণের জীবন আর সাহিত্যের কোনো সেতুবন্ধন ঘটে যায় কিনা! বিভূতিভূষণের সঙ্গ-নিঃসঙ্গের দোলাচল, তাঁর কলকাতা লণ্ডন হয়ে গেল বলে উত্তেজনা, আবার তাঁর বারাকপুরের বিল-বাঁওড়ের জন্য আকুলতা, এই সবকিছু নিয়েই তো মানুষটার জীবন আর সাহিত্য!

১৯৩৮ সালেই মেদিনীপুর গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। অমূল্য বিদ্যাভূষণ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিভূতিভূষণ একসঙ্গে গিয়েছিলেন সেই অনুষ্ঠানে। তারাশঙ্করের সঙ্গে তো বছরের গোড়ায় পাটনাতেও দেখা হয়েছে। তারাশঙ্কর তখন পাটনাতেই থাকেন, তবে বিভূতিভূষণকে বলেছিলেন, এ জায়গা তাঁর ভালো লাগছে না, বাংলাদেশে ফিরতে চান। বিভূতিভূষণ দিনলিপিতে লেখেন, 'তারাশঙ্কর একজন সত্যিকার ক্ষমতাবান লেখক, বাংলার মাটি থেকে ও প্রাণরস সঞ্চয় করচে, ওর কি ভাল লাগে এসব জায়গা?' পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৯-এর প্রথমদিকে বীরভূম সাহিত্য সম্মেলনে গিয়ে তারাশঙ্করের বাড়িতে দিনকয়েক ছিলেন বিভূতিভূষণ। (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৪৩৯-৪০, ৪০৯, ৪৪৪)। (দ্র. পরিশিষ্ট গ)। তবে তার আগে, অর্থাৎ ১৯৩৮-এই বিভূতিভূষণের জীবন জুড়ে আছে আরো কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর নাগাদ 'অলকা' পত্রিকায় 'বিপিনের সংসার' লিখতে শুরু করেন বিভূতিভূষণ। 'কিন্নর দল' গল্পসংকলনটি এই বছরেই প্রথম প্রকাশিত হয়, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে (বি র ৪ : ৪৯১)। মহালয়ার আগের দিন বিভূতিভূষণের বারাকপুরের বাড়ির রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৪৪০)। প্রসঙ্গত মনে পড়ে ১৯৩৮ সালের ১২ অক্টোবর সুপ্রভাকে লেখা বিভূতিভূষণের চিঠি, 'আমি সইমার সেই বাড়ীটা কিনেচি। কাল প্রথম সেই বাড়ীতে রাত্রি কাটালুম বাড়ীর মালিক হিসেবে।' (অপ্রকাশিত)।

মহালয়ার দিন খুকুকে আর খুড়িমাকে (খুকুর মা, যুগলকাকার স্ত্রী) কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন বিভূতিভূষণ। অন্নপূর্ণার ঘাটে মদনমোহন ঠাকুর, চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, রূপবাণী হলে সিনেমা এইসব ছিল সেদিন কলকাতায় বেড়ানোর তালিকায় (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৪৪০)। ওই ১২ অক্টোবরের চিঠিতে সুপ্রভাকে লিখেছিলেন বিভূতিভূষণ, 'মহালয়ার দিন খুকুর মা কলকাতায় গঙ্গাস্নান করতে এসেছিলেন, খুকুও এসেছিল সেই সঙ্গে। খুকুকে রূপবাণীতে

সাধনা বোসের "অভিনয়" দেখালুম সেদিন।' (অপ্রকাশিত)। নাটক-চলচ্চিত্র-সংগীতে নিজের মতো করে একধরনের আগ্রহ বিভূতিভূষণের ছিল। আর যে মমতা তাঁর জীবনবোধের অনেকখানি জুড়ে থাকে, তারই অনুষঙ্গে নটেদের জীবন নিয়েও তিনি ভাবেন। দিনলিপিতে লেখেন, '...পার্ক ষ্ট্রীট দিয়ে চৌরঙ্গী পর্য্যন্ত হেঁটে এলুম...মেট্রোর সামনে খুব ভিড়, Marie Antoinette ছবি দেখানো হচ্চে, নর্ম্মা শিয়ারার নেমেচে প্রধান ভূমিকায়। রাস্তায় রাস্তায় সাধনা বোস, কাননবালার ছবিওয়ালা বিজ্ঞাপন।...পঞ্চাশ বছর পরের কলকাতা কল্পনা করলুম। কেউ নেই এরা...সাধনা বোস প্রাচীনা বৃদ্ধা হয়ে হয়তো বেঁচে আছে। তখন নতুন একদল উঠেচে, তাদের নাম কেউ জানে না। জীবনের চিত্র-নাট্যপটে কত অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। গিরিশ ঘোষের স্কুলের প্রবীণা অভিনেত্রী বিনোদিনী আজও আছে। গঙ্গার ধারে বসে মালা জপ করে।' (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৪৪১)।

জীবন জীবিকার দায়দায়িত্ব

ইতিমধ্যে, এই ১৯৩৮ সালেই নুটুবিহারী চাকরি পেয়ে বেলডাঙা গেছেন (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৪৪০)। বছরের শেষের দিকেই হবে, পুজোর পরে। আর ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ২১ অগ্রহায়ণ নুটুবিহারীর বিয়ে হল। বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে অবশ্য আছে 'নুটুর বিয়ে হয়ে গেল গত বুধবারে ১৬ই অগ্রহায়ণ।' (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৪৪২)। কিন্তু বিভূতিভূষণের নামেই তো ছাপা হয়েছিল নুটুবিহারীর বিয়ের চিঠি। সেখানে দেখছি :

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ

মহাশয়,

আগামী ২১শে অগ্রহায়ণ, বুধবার আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ নুটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ভাটপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত ভূপতিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের চতুর্থা কন্যা শ্রীমতী যমুনা দেবীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হইবে। অতএব, মহাশয়, উক্ত দিবস সবান্ধবে ভাটপাড়াস্থ ভবনে শুভাগমনপূর্ব্বক শুভ-কার্য্য সম্পাদন করিয়া বাধিত করিবেন। ইতি— ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫।

ভবদীয়
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বরাগমন—২১শে অগ্রহায়ণ, বুধবার সন্ধ্যা ৭টায়,
ভাটপাড়া গোপীকিষণ রোড্, 'গুরুচরণাশ্রম' হইতে।

প্রীতিভোজ – ২৩শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার সন্ধ্যা।

লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনীয়।

নুটুবিহারীর বিয়ের কথাবার্তা সম্ভবত বেশ কিছুদিন ধরেই চলছিল। ১৯৩৮ সালের গোড়ায় সুপ্রভা বিভূতিভূষণকে অনুরোধ করেছিলেন তাদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে। যেতে না পারার কারণ হিসেবে ফেব্রুয়ারিতে বনগ্রাম সাহিত্য সম্মেলনের কথা লিখেছেন বিভূতিভূষণ, '৫ই ফেব্রুয়ারি আমাদের দেশে (বনগ্রামে) সাহিত্য সম্মেলন – আমাকে ওরা চায়। কাজ অনেকদূর এগিয়েচে। চিঠিপত্র ছাপানো পর্য্যন্ত। এখন আমার হঠাৎ উধাও হওয়া অধিবেশনের দিন – অসম্ভব। দেশের লোক ভয়ানক দুঃখিত হবে এবং রাগও করবে।' আরও লিখেছেন, '১৩ই মাঘ – আমার ভাই নুটুর বিবাহ – খুব সম্ভব, মেয়ে দেখা হয়েচে। আশীর্ব্বাদ হবে সামনের সপ্তাহে। ছোটমামা দিন স্থির করেচেন ঐ দিন – এতে আমার কিছু বলা খাটবে না। নইলে আমি কত সুখী হতুম তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে, সে কথা লিখে জানিয়ে কোনো লাভ নেই।' (অপ্রকাশিত)। এই চিঠির তারিখ ২২ জানুয়ারি ১৯৩৮, চিঠিটি লেখা হচ্ছে পাটনা থেকে। নুটুবিহারীর বিবাহ অবশ্য হল অনেক পরে, ১৯৩৮-এর ডিসেম্বরে। ছোটমামা বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মেয়ে দেখতে গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ, যমুনাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'খুকী, তোমার নাম কি?' আর আশীর্বাদের দিন একটি চেন-পেনডেন্ট দিয়ে যমুনাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। লকেটটিতে সুন্দর মিনে করা ছিল, নীল জলের উপর একটি মরাল চরছে, আর একটি পদ্ম ফুটে আছে। হারটি বিভূতিভূষণ নিজেই পছন্দ করে কিনেছিলেন। আশীর্বাদের পরে সেদিন খুব তাড়াতাড়ি তিনি কলকাতায় ফিরে যান। (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭৬ : ৩)।

বিয়ের পরে যমুনা প্রথম আসেন ভাটপাড়ায় মামাশ্বশুরবাড়িতে। তারপর নুটুবিহারীর কর্মস্থল বেলডাঙায়, যেখানকার সুগারমিলে বিয়ের মাসখানেক আগে চাকরি পেয়েছিলেন নুটুবিহারী। এ কাজ অবশ্য বেশিদিন করেননি তিনি। স্বাধীনভাবে ঘাটশিলায় যখন নুটুবিহারী প্র্যাকটিস শুরু করলেন, তখন যমুনা-নুটুবিহারীর বিয়ের পরে বছরখানেক কেটে গেছে। বেলডাঙার চাকরি ছাড়বার পরে নুটুবিহারী তাঁদের মামার বাড়ির গ্রাম মুরাতিপুরে মাসচারেক প্র্যাকটিস করেন। বিভূতিভূষণই বলেছিলেন, 'মুরাতীপুরে মামার বাড়ির গ্রামে গিয়ে কিছুদিন দেখ-না কেমন চলে, গ্রামে এখন ডাক্তারের খুবই প্রয়োজন।' মুরাতি-পুর গ্রামে বিভূতিভূষণদের মাতৃকুল কয়েকপুরুষ আগে থেকে বাস করেছেন।

ভাটপাড়ার বাড়ি করেছিলেন তাঁদের মেজোমামা শরৎচন্দ্র এবং ছোটমামা বসন্তকুমার। বড়মামা প্রবোধকুমার অল্পবয়সে মারা যান। মুরাতিপুরের মতো ছোট জায়গা, বর্ষাকালে নানান অসুবিধা—সদ্য পাস করা ডাক্তার মুটুবিহারীর ভালো লাগল না। (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৭ : ৫-৬)।

১৯৩৮ সালে বড়দিনের ছুটির আগে হাওড়া টাউন হলে বিভূতিভূষণকে সংবর্ধনা আর মানপত্র দেওয়া হল। আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সেই যে তিনের দশকের শুরুর দিকে বাংলার এক আনকোরা নতুন লেখক রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিল, 'আপনাকে কোনোদিন পত্র লিখিনি…প্রথম পত্র লিখ্‌তে কেমন একটু ভয় ভয় করে…আপনাকে একখানা "পথের পাঁচালী" ও একখানা "মেঘমল্লার" পাঠালাম। আপনার সময় মত যদি কিছু লেখেন তবে সৌভাগ্যবান বিবেচনা করবো…"পথের পাঁচালী"র অনুবৃত্তি "অপরাজিত" বলে উপন্যাসখানা সম্প্রতি প্রবাসীতে শেষ হয়েচে—বড়দিনের আগেই প্রকাশিত হবে। আপনি মাসিকের পাতায় উপন্যাস পড়েন না জানি—বইখানা বেরুলেই আপনাকে পাঠিয়ে দেবো—তবে সেবার সমালোচনা লিখবার জন্য আপনাকে বিরক্ত কোরবো না।' (বি র ১ : ৪৫১)। তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। রবীন্দ্রনাথের কাছেও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩৮-এ একটি স্বীকৃত নাম। এই ১৯৩৮-এর শুরুতেই মারা গেছেন বাংলার আর এক বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বনগ্রামে মন্মথ মোক্তারের বৈঠকখানায় বসে সে মৃত্যু-সংবাদ প্রথম পেয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। মনে পড়েছিল, ১৯১৩ সালে যখন বনগ্রাম হাই স্কুলে ফার্স্টক্লাসের ছাত্র তিনি, এই মন্মথবাবুর আনুকূল্যেই সদ্য প্রকাশিত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা তাঁর হাতে আসত। সেখানেই প্রথম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক লেখকের গল্প বনগ্রাম হাই স্কুলের ছাত্রটিকে মুগ্ধ করেছিল। আজ আড়াই দশক বাদে সেই শরৎচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ পেলেন সেই মন্মথ মোক্তারের বৈঠকখানায় বসেই (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৪০৭)। এমন আশ্চর্য যোগাযোগ বিভূতিভূষণের মতো অনুভূতিপ্রবণ মানুষকে গভীরভাবে স্পর্শ করে, এ তো স্বাভাবিক। সব মিলিয়েই হয়ত ১৯৩৮ সালের শেষে, কি ১৯৩৯-এর শুরুতে দিনলিপিতে লেখেন, '১৯৩৮ সালটা সবদিক দিয়ে বড় অদ্ভুত বছর আমার জীবনে।' (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৪৪৩)।

১৯৩৯ সালের ১০ জানুয়ারি কলকাতা থেকে বিভূতিভূষণ সুপ্রভাকে মিরাশিতে চিঠি লিখছেন, 'তোমার পাঠানো ক্যালেণ্ডারখানা ভারি চমৎকার

হয়েছে—পেয়ে খুসি হয়েচি খুব। আমার সামনেই দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেচি—যখন এখানে আসবে দেখতে পাবে। আচ্ছা, সুপ্রভা, একদিন হঠাৎ এমনি এসে পড়ো না কেন দেখতে আমি ক্যালেণ্ডারখানা টাঙিয়েছি কি না?···তোমার সঙ্গে আমার একরাশ কথা জমে রয়েচে। চিঠিতে কি কথা বলবো? তার ওপর তোমার চিঠি আজকাল এত সংক্ষেপ ও বিরল হয়ে উঠেচে যে চিঠিতে কিছু লিখতেই ইচ্ছে করে না। অর্দ্ধেক কথার তো জবাবই আসে না।···কলকাতায় এখন তিন চারটে একজিবিশন, থিয়েটার, সিনেমায় ভাল ফিল্ম, গান নাচ···৺সরস্বতী পূজোর দিন আমাদের বনগাঁয়ে সাহিত্য সম্মেলন হবে। তুমি সে সময়ে আসবে? তুমি যদি আসো কি সুখীই যে হই। সজনী সভাপতি, কলকাতা থেকে আরও সাহিত্যিকেরা যাবেন—তুমি যদি যাও, তোমার কারো সঙ্গে মিশতে না হয়, সে ব্যবস্থা আমি করতে পারি। সম্মেলনে পড়বার জন্যে একটা প্রবন্ধ বা কবিতা পাঠাবে? আমি প্রবন্ধ সংগ্রহ করার ভার নিয়েচি। অনেকেরই কবিতা বা প্রবন্ধ পাওয়া যাবে বলে ভরসা পেয়েচি—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অনেকেই দেবে না। তুমি দেবে না সুপ্রভা? তোমার কবিতা সম্মেলনে পড়া হচ্চে এতে আমার মনে খুসি রাখবার জায়গা থাকবে না।···আসো যদি তবে তো কথাই নেই।' (অপ্রকাশিত)। এরকম অনুরোধ সুপ্রভাকে আগেও করেছেন বিভূতিভূষণ। ১২ নভেম্বর ১৯৩৮-এর চিঠিতে আছে, 'সজনী বলছিল, "অলকা"র জন্যে তুমি যদি একটা কিছু লিখে পাঠিয়ে দাও, ভ্রমণ কাহিনী কিংবা গল্প, ওরা একবছর তোমাকে বিনামূল্যে "অলকা" পাঠাবে। আমি ওকে সেদিন বলেছিলাম—সুপ্রভাকে একখানা করে "অলকা" পাঠাতে হবে। তাতে ও বল্লে—এম্‌নি তো দেওয়া আমার পক্ষে শক্ত। তবে তিনি যদি একটা কিছু লিখে পাঠিয়ে দেন, সেই লেখার পারিশ্রমিকের বদলে একবছর "অলকা" পাঠাবো···একটা কিছু পাঠাও। ভ্রমণ কাহিনী একটা পাঠাও না?' (অপ্রকাশিত)। সুপ্রভা ধারাবাহিক 'বিপিনের সংসার' 'অলকা'তে পড়ুন, এ ব্যাপারে বিভূতিভূষণ খুব আগ্রহী ছিলেন বলেই মনে হয়। তবে ১৯৩৯-এ বনগ্রাম সাহিত্য সম্মেলনের সময় সুপ্রভা কি বিভূতিভূষণের কথা রেখেছিলেন? 'উৎকর্ণ' দিনলিপিতে বনগ্রাম সাহিত্য সম্মেলনের পরবর্তী গ্রন্থনায় হঠাৎ এক-জায়গায় আছে, 'মধ্যে এখানে সুপ্রভা এসেছিল—তার সঙ্গে একদিন ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে গেলুম। তারপর সে চলে গেল।' (বি. র. ৪ : ৪৪৪)। সময়ের খুব নিশ্চিত হদিস মেলে না, তবে বনগ্রাম সাহিত্য সম্মেলন, এমনকী বীরভূম সাহিত্য সম্মেলনেরও পরের ঘটনা, এরকম ধারণা হয়।

১৭ মাঘ ১৩৪৫ তারিখের চিঠিতে বিভূতিভূষণ লাভপুর সাহিত্য সম্মেলনে যাওয়ার, তারাশঙ্করের গ্রামে যাওয়ার খবর দিচ্ছেন সুপ্রভাকে। বীরভূমে বিভূতিভূষণের সঙ্গে গিয়েছিলেন সজনীকান্ত দাস, বনফুল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। চিঠিতে আছে, 'সেখানে বীরভূমের উদার মাঠের মধ্যে জ্যোৎস্না রাত্রির যে কি শোভা সেদিন দেখলুম! কথা ছিল আমি ওখান থেকে মুঙ্গের যাবো—কিন্তু শোনা গেল হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার দরুণ সেখানে যাওয়া safe নয়, তাই কাল রাত্রে ফিরেচি।' (অপ্রকাশিত)। এইসময়, অর্থাৎ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যা থেকে বিভূতিভূষণ হেমেন্দ্রনাথ দত্তের 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' উপন্যাস লিখতে শুরু করেন (বি. র. ৬ : ৪৫৩)। এ উপন্যাসের উৎস সন্ধানে বিভূতিসাহিত্যের গবেষককে পাড়ি দিতে হয় বিভূতিভূষণের একান্ত অভ্যস্ত অনেক পল্লীভ্রমণের একটিতে। সে অবশ্য এমনি ভ্রমণ, যার জন্য বারাকপুরের বিভূতিকে 'ভদ্রসদ্র' সাজতে হত না, বন্ধুপত্নী অমিয়ার কাছে ধার নিতে হত না স্যুটকেস। 'ঊর্মিমুখর' দিনলিপিতে আছে, 'বাগানগাঁয়ের পথে···কাঁচিকাটা পুল প'র হয়ে খানিকটা এসেই একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হল। তার বয়েস ষাট-বাষট্টি হবে, রঙটা বেজায় কালো, হাতে একটা পোঁটলা, কাঁধে ছাতি···বললুম—কোথায় যাবে হে?···আজ্ঞে দাদাবাবু, ষাঁড়াপোতা ঠাকুরতলা যাব। বাড়ি শান্তিপুর গোঁসাইপাড়া···একটা বিড়ি খান দাদাবাবু।···ওরকম লোক আমার ভাল লাগে। সহজ সরল মানুষ, এমন সব কথা বলে যা আমি সাধারণতঃ শুনি নে।

'···আমার নাম, দাদাবাবু, হাজারী পরটা···যদিও আমরা ভট্‌চায্যি কিন্তু আমার উপাধি পরটা। মানে এমন পরটা আর কেউ তৈরি করতে পারতো না নদে-শান্তিপুরের মধ্যে। পাঁচ সের ওজনের একখানা খাস্তা পরটা—যেখানে ধরুন খসে যাবে। আমার দোকান ছিল গ্রাম চাঁদপাড়ায়, দৈনিক দশ-বারো টাকা বিক্রি, পরটা, লুচি, আলুর দম, ডিম, মাংস। আমার দোকানে যে একবার খেয়েচে দাদাবাবু, সে আপনাদের বাপ-মাব আশীর্বাদে কখনো ভুলতো না। কলকাতা পর্যন্ত আমার নাম-ডাক। খাঁদা মিত্তিরের বাড়ি রশুই করেচি এক হাতা-বেড়ীতে পাঁচ বছর।' এত কথা মানুষটা প্রথমে বলেনি, এমনকী নিজের নাম-পরিচয়ও গোপনই রেখেছিল—'বিদেশে, পথেঘাটে নিজের পরিচয় না দেওয়াই ভাল।' কিন্তু পথ চলতে চলতে গোবরাপুরের জজসাহেবের বাড়িতে 'দাদাবাবু'র খাতির দেখে বুঝে গেছে যে, এ মানুষটা মাথা খাটিয়ে বই লিখে এত দামি দামি লোকের

খাতির যখন পেয়েছে, হাজারী পরটার মতো গুণীর কদর সে বুঝবে। তখন সে বললে, 'আমার নাম নদে শান্তিপুর থেকে আরম্ভ করে কলকাতা পর্যন্ত সবাই জানে, আপনার শ্রীগুরুর চরণকৃপায়, হেঁ হেঁ।' (বি. র. ৩ : ৫৩১-৩৩)। হাজারী পরটা নাকি বিভূতিভূষণকে নিজের অনেক আশা আকাঙ্ক্ষার কথা, হোটেল খুলবার বাসনার কথাও বলেছিল বি. র. ৬ : ৪৫৩)। সে সাধ যে পূর্ণ হল না, তার সাহিত্যিক ব্যঞ্জনায় বিভূতিভূষণের কলমে এসেছিল "শাস্তিরাম"-এর মতো ছোটগল্প, যা আছে 'বেনীগীর ফুলবাড়ী' সংকলনে (বি. র. ৬ : ৪৬৬)। আর হাজারী পরটার সাফল্যের কল্পনায় বিভূতিভূষণ লিখলেন 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'। ১৯৩৯-এর প্রথম দিকে, অর্থাৎ 'প্রবাসী'র ফাল্গুন ১৩৪৫ সংখ্যায় শেষ হয়েছে বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'। গ্রন্থাকারে তার প্রথম প্রকাশও সেই বছরেই, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে (বি. র. ৫ : ৪৭৮)।

১২ নভেম্বর, ১৯৩৮-এর যে চিঠিতে বিভূতিভূষণ সুপ্রভাকে 'অলকা'র জন্য ভ্রমণ-কাহিনী লিখতে অনুরোধ করছেন, তাতেই আছে, 'তুমি শীতের ছুটীতে কলকাতায় আসবে না এবার ?···নানা কারণে আমার যাবার উপায় নেই···সেইসময় তোমাকে "আরণ্যক"এর file দেবো—তুমি পড়ে বোলো কোথায় ভালো কোথায় মন্দ।··· তবে একটু আগে বল্লে ভাল হয় এইজন্যে যে "আরণ্যক" প্রেসে যাবে শীগগীর।' (অপ্রকাশিত)। এ উপন্যাস গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার ছ'বছর পরে ১৯৪৫ সালের ৬ জুলাই মাধব কুণ্ডু নামের জনৈক সাহিত্যানুরাগী কিশোরকে বিভূতিভূষণ চিঠিতে লিখেছিলেন, 'মধ্যপ্রদেশেব ও দক্ষিণ বিহারের পার্ব্বত্য অঞ্চলের বর্ণনা আছে আমার "আরণ্যক" পুস্তকে।' (অসীম বসু, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ ব : ২১৪)। আর 'আরণ্যক' উপন্যাসের ইঙ্গিত বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে প্রথম পাওয়া গিয়েছিল ১৯২৮ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি, 'এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো—একটা কঠিন শৌর্য্যপূর্ণ, গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি। এই বন নির্জ্জনতা ঘোড়ায় চড়া পথ হারানো—অন্ধকার—এই নির্জ্জনে জঙ্গলের মধ্যে খুবড়ী বেঁধে থাকা।···এদেশের লোকের দারিদ্র্য, সরলতা, এই Virile active life, এই সন্ধ্যায় অন্ধকারে ভরা গভীর বন ঝাউবনের ছবি—এইসব।' (স্মৃতির রেখা, বি. র. ১ : ১৪৭)। বিভূতিভূষণ সেই দুয়ের দশকে তখন ঘোষ এস্টেটের ভাগলপুর জঙ্গলমহালের কর্মচারী। শেষ হল তবে একদশক ব্যাপী সব আয়োজন। এই এগারো বছরের যাত্রাপথে সাহিত্যের কতশত উপকরণ বিভূতিভূষণ তাঁর ভ্রমণের অনুষঙ্গে, তাঁর কল্পনার বৈভবে সঞ্চয় করেছেন; প্রকৃতি আর মানুষের

ঘাতপ্রতিঘাতকে, সে বিনিময়ের অসংগতিকে, সাফ হয়ে যাওয়া জঙ্গলকে, আর সেই মরা জঙ্গলের কোনো যথার্থ বিকল্প থেকে বঞ্চিত তাঁর দেশের প্রান্তরকে পরম মমতার আর চরম যন্ত্রণার শিল্পে গাঁথবেন বলে। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যা 'অলকা'য় অর্থাৎ সেই ১৯৩৯-এই 'বিপিনের সংসার' উপন্যাসও শেষ হল।

১৩৪৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে, অর্থাৎ ১৯৩৯-এর জুন-জুলাই নাগাদ আলো-সাহিত্যচক্রের মুখপত্র 'লিপিকা'র প্রথম এবং শেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল। বছরের শুরু থেকেই বিভূতিভূষণ কলকাতার বিভিন্ন কলেজের ছেলেদের তৈরি এই সাহিত্যমণ্ডলীর স্থায়ী সভাপতি। তাদের ছাপানো প্যাডের কাগজেই সুপ্রভাকে ১০ জানুয়ারি ১৯৩৯ এবং ১৭ মাঘ ১৩৪৫ তারিখের চিঠিগুলি লেখা। প্রথম চিঠিটিতে সুপ্রভাকে লিখেও দিয়েছেন, 'এ কাগজখানাব ওপর "স্থায়ী সভাপতি—আলো-সাহিত্যচক্র" দেখে হেসো না—ও একটা সাহিত্যমণ্ডলী—বিভিন্ন কলেজের ছেলেরা মিলে করেচে। আমাকে তার সভাপতি করেচে এবং এই ছাপানো প্যাড ওদেরই দেওয়া। আমি লিখে যদি সদ্ব্যবহার না করি তবে আর দিয়েচে কেন? আর তোমার কাছে আমার লজ্জাই বা কিসের?' (অপ্রকাশিত)। এই সাহিত্যমণ্ডলীর সূত্রেই ক্যানিং হোস্টেলের বাসিন্দা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি এম. এ. ক্লাসের ছাত্র গোপাল ভৌমিকের সঙ্গে বিভূতিভূষণের ঘনিষ্ঠতা হয়। আলো-সাহিত্যচক্রের উৎসাহী সদস্য ধ্রুবদাস ভট্টাচার্যর আগ্রহে 'লিপিকা' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ। গোপাল ভৌমিক এবং ধ্রুবদাস ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় আর প্রধান সম্পাদক হিসেবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ছেপে 'লিপিকা' বেরিয়েছিল। খুকুর বিয়ের দিন সন্ধ্যায় যে সদ্যপ্রকাশিত পত্রিকাটি হাতে করে বিভূতিভূষণ বারাকপুরে গিয়েছিলেন, এই সেই 'লিপিকা'।

আলো-সাহিত্যচক্রের সভায় খ্যাতনামা সাহিত্যিকরা আসতেন। ৪৫ নং আমহার্স্ট স্ট্রিটে ঘর ভাড়া নিয়ে আলো-সাহিত্যচক্র এবং 'লিপিকা'র অফিস হল। গোপাল ভৌমিকের লেখায় আছে, '...খ্যাতনামা কোন সাহিত্যিকের নাম প্রধান সম্পাদক-রূপে ব্যবহার করার প্রশ্ন উঠল। তখনই মনে পড়ল বিভূতিবাবুর কথা। ছুটে গেলাম তাঁর প্যারাডাইস লজে, ৪১নং মীর্জাপুর স্ট্রীটে। যদিও এভাবে নাম দিতে তাঁর আপত্তি ছিল, কিন্তু তরুণ ছাত্রদের দাবির সামনে শেষ পর্যন্ত তাঁর আপত্তি টিকল না। তাঁকে সম্মতি দিতে হল। তবে প্রতিশ্রুতি দিলাম, তাঁকে না দেখিয়ে বা না জানিয়ে কারও কোন লেখা আমাদের

প্রকাশিতব্য "লিপিকা" নামক মাসিক পত্রিকায় ছাপাব না…প্রথম সংখ্যা… অ্যান্টিক কাগজে ঝরঝরে ছাপা, সুন্দর রঙিন প্রচ্ছদপট। আমার যতদূর মনে পড়ে তাতে এই সংখ্যায় বিভূতিবাবুর নিজের কোন লেখা ছিল না।…প্রশংসা যে অনুপাতে পাওয়া গেল, সে অনুপাতে কাগজ বিক্রি হল না। কিংবা গ্রাহক-গ্রাহিকাও জুটল না।…প্রথম সংখ্যার বিক্রয়লব্ধ অর্থ যথোচিতরূপে না পাওয়ায় প্রেসের দেনা শোধ করা সম্ভব হল না, ঘরভাড়া পড়ল বাকি। শেষ পর্যন্ত আশা-ভঙ্গের মনস্তাপ নিয়ে "লিপিকা"কে করে দিতে হল বন্ধ।' (গোপাল ভৌমিক, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ ব: ১৮১-২)। বিভূতিভূষণের পত্রিকা-সম্পাদনার ইতিহাস তবে এই! ১৯৩০-৩১-এ মাসিক দশ টাকার বিনিময়ে চলচ্চিত্র সাপ্তাহিক 'চিত্রলেখা'য় সম্পাদক হিসাবে নাম ধার দেওয়া থেকে ১৯৩৯-এ সাহিত্যানুরাগী ছাত্রদের 'লিপিকা' পত্রিকার একটিমাত্র প্রকাশিত সংখ্যায় প্রধান সম্পাদক হিসেবে নাম ছাপাবার অনুমতি। তিনের দশকের প্রথম দিকে হেমন্তকুমার গুপ্তর সঙ্গে যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দীপকে'র সম্পাদনা করতেন, তিনি যে 'পথের পাঁচালী'-'অপরাজিত'-খ্যাত বিভূতিভূষণ নন, তা নিয়ে বিস্তারিত লেখালেখি হয়েছিল 'শনিবারের চিঠি'র আশ্বিন ১৩৩৯ সংখ্যার "সংবাদ সাহিত্য" বিভাগে (১৮১-৮৩)। ১৯৩৭-এ 'বিচিত্রা'র ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অনুরোধ এবং চিন্তাভাবনা পর্যন্তই এগিয়েছিল, তার বেশি নয়। অর্থাৎ পত্রিকা সম্পাদনার তাগিদ বিভূতিভূষণ কোনোদিনই তেমন বোধ করেননি, খুব বেশি হলে সম্পাদক হিসেবে নিজের নামটা ধার দিয়েছেন। ১৯৪৬ সালে ৭ মার্চ তারিখের চিঠিতে মাধব কুণ্ডু, অসীম বসুর মতো খুলনার মডেল হাই স্কুলের ছাত্রদের হস্তলিখিত পত্রিকা সম্বন্ধে তাঁর যে আগ্রহ প্রকাশ পায়, তা একান্তই বিভূতিভূষণের স্বভাব-সুলভ। বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন, 'পত্রিকা বিস্তার সম্বন্ধে আমার মত এই: (১) একটি মহিলা বিভাগ (২) একটি শিশু বিভাগ (৩) নবপ্রকাশিত বইয়ের সমালোচনা বিভাগ (এটি আমি করবো)।' (অসীম বসু, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ ব: ২১৩-১৪)। শিশুর সঙ্গে শিশু হয়ে, কিশোরের সঙ্গে কিশোর হয়ে খেলতে বিভূতিভূষণ চিরকালই ভালোবাসতেন। উপরের প্রতিশ্রুতিতে সাবালকের মনস্কচিন্তার স্থায়ী প্রভাব ছিল মনে করলে, সম্ভবত ভুলই হবে।

১৯৩৯ সালে জুলাই মাসের শেষে বিভূতিভূষণ পাবনা গিয়েছিলেন, সেখান-কার অন্নদাগোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরির বার্ষিক উৎসবে গেস্ট অভ্ অনার হিসেবে। ৩০ জুলাই সকালে সরকারি উকিল জাহ্নবীচরণ ভৌমিক অনুষ্ঠান

উদ্বোধন করবার পরে বিভূতিভূষণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সেদিন বিকেলে গ্রন্থাগারের সাহিত্যশাখার উদ্যোগে একটি সাহিত্যবাসর অনুষ্ঠিত হয়। বিভূতিভূষণ সকাল-বিকেল, দুবেলার বক্তৃতাতেই আসর মাতিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন পরিমল গোস্বামী। তিনি এবং পাবনার তৎকালীন অ্যাসিস্টান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর ফণীন্দ্রনাথ রায় বিকেলের আসরে দুটি হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধ পাঠ করেন। আসলে পাবনায় বিভূতিভূষণের যাওয়ার যোগাযোগসূত্রটি পরিমল গোস্বামী, যিনি বাল্যবন্ধু ফণীন্দ্রনাথের চিঠি পেয়ে বিভূতিভূষণকে পাবনা যাওয়ার ব্যাপারে রাজি করিয়েছিলেন। বিকেলের আসরে সভাপতি বিভূতিভূষণ ছোট-গল্প আর উপন্যাস লিখবার কৌশল বিষয়ে, শ্রেষ্ঠ লেখকদের উন্নতির কারণ বিন্যাস করে চমৎকার বক্তৃতা দেন। (পরিমল গোস্বামী, ১৪০০ ব : ১৯৩-৪)।

১৯৩৯-এ শহর কলকাতা, মির্জাপুর স্ট্রিটের প্যারাডাইস লজ, খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশনের চাকরি, এইসব কিছুই বড বেশি বাস্তব বিভূতিভূষণের জীবনে। ১৯২৯ সালে বিভূতিভূষণ যখন ওই স্কুলে বাংলার শিক্ষক হয়ে এলেন, তখন খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশনের সভাপতি ছিলেন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, সম্পাদক নিরঞ্জন রায়চৌধুরী আর প্রধান শিক্ষক হেনরি ক্লিফোর্ড ক্লারিজ (কিশলয় ঠাকুর, ১৯৭৮ : ১১৫)। তারপব টানা বারোটি বছর মির্জাপুর স্ট্রিটের মেস থেকে পুরনো শাঁখারিটোলা অর্থাৎ আজকের গোকুল বড়াল স্ট্রিট, মহেন্দ্র সরকার স্ট্রিট, শশিভূষণ দে স্ট্রিটের ভিতর দিয়ে মিনিট পঁচিশেকের হাঁটাপথে ৬৪-এ ধর্মতলা স্ট্রিটে খেলাত স্কুলে পড়াতে এসেছেন বিভূতিভূষণ। ১৯৪১-এ যখন স্কুলের কাজ ছাড়লেন বিভূতিভূষণ, তার অনেক আগেই স্কুল ছেড়ে গেছেন হেডমাস্টার ক্লারিজ সাহেব। ১৯৩২ সালের শেষ কি ১৯৩৩ সালের গোড়া থেকেই ক্লারিজ আর খেলাত স্কুলে নেই। ১৯৩০ সালে সিদ্ধেশ্বর ঘোষের মৃত্যু হয়েছে। তিনি ক্লারিজকে স্কুলে এনেছিলেন। পাথুরিয়া-ঘাটার বিখ্যাত ঘোষবাড়ির এস্টেটের আর্থিক আনুকূল্য ছিল সিদ্ধেশ্বরের পিতামহ খেলাতচন্দ্রের নামে প্রতিষ্ঠিত স্কুলটির মূল অবলম্বন। সিদ্ধেশ্বর ঘোষের মৃত্যুর পরে সেই প্রসঙ্গে কোনো পরিবর্তনের চাপ এসে থাকতে পারে।

'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপিতে আছে, 'আজ এইমাত্র সাহেবের ওখান থেকে আসছি। সাহেব একটু দমে গিয়েচে—আমি ফণিবাবুর সঙ্গে ওটা মিটিয়ে ফেলতে বললুম ...ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলুম সাহেবের হাঙ্গামাটা যেন মিটে যায়।... এমন সব মানুষ জীবনে কতই দেখলাম তাদের মনের সতর্কতা চৈতন্যের ব্যাপকতা

বড়ই কম···loyaltyকে তারা ভীরুতা ভাবে, স্নেহকে দুর্বলতা ভাবে। ফণিবাবু একজন এই ধরণের মানুষ। এ সব লোকের নির্বুদ্ধিতা আমি বরদাস্ত করতে পারিনে একেবারেই। মূর্খতারও একটা সীমা আছে, এদের তাও নেই।' (বি র ২ : ২১১)। আরো পরবর্তী দিনলিপি 'উৎকর্ণ'তে দেখি, 'সুনীতিবাবু প্রধান পরীক্ষক এবারও। ওখানকার কাজ শেষ করে সুধীরবাবুদের বইয়ের দোকানে সবাই মিলে গিয়ে খানিকটা আড্ডা দিলাম। তারপর আবার এলুম স্কুলে। চারুবাবুর অভিনন্দন সভা তখন জোর চলচে। অনেক রাত পর্য্যন্ত আমরা ছিলুম। তারপর এক মাস্টারমশাই আর আমি এসে সেণ্ট জেম্‌স্ স্কোয়ারে একখানা বেঞ্চের ওপর বসে অনেক পুরোনো কথার আলোচনা করলুম। রসিদ কি করে আমাদের অনিষ্ট করতে চেয়েছিল, ক্লারিজসাহেবকে আমরা কেমন সাবধান করে দিয়েছিলুম এইসব কথা।' (বি র ৪ : ৩৭৪)। হেনরি ক্লিফোর্ড ক্লারিজের পরে খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশনে প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন রামনারায়ণ ভট্টাচার্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে খেলাতস্কুলকে শেষবার পাওয়া গেছে ১৯৪৩-এ। সে তালিকা অবশ্য ১৯৪২-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত। সেখানেও খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশনের স্থান প্রভিশনালি রেকগনাইজ্‌ড্ স্কুলের তালিকায়। আর সে স্বীকৃতি পেয়েছে Elementary Scientific Knowledge পড়ানোর। পরবর্তী ক্যালেণ্ডারে খেলাতস্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যালয়-তালিকা থেকে মুছে গেছে (The Calender Supplement 1943 : 108 ; also 1946)।

১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় বোমা পড়বার পরে খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশন সম্ভবত আর খোলেনি। খুলে থাকলেও, চলেছিল খুব অল্পদিন। সিদ্ধেশ্বর ঘোষের জ্ঞাতিভাই জিতেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের পুত্র প্রদীপ ঘোষ (বর্তমানে ৪৭ পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রিটের বাসিন্দা) জানিয়েছেন যে, ১৯৪০ সাল পর্যন্ত স্কুলের অর্থসংস্থান হয়েছে ঘোষ এস্টেট থেকেই। তারপরে শুরু হয়ে গেল ঘোষেদের শরিকি মামলা মোকদ্দমা, বন্ধ হল স্কুলের টাকা। সেইসব মামলার জেরে হারিয়ে গেল ঘোষ এস্টেটের পুরনো নথিপত্র। তাই ঠিক কোনসময় স্কুল উঠে গেল, তা বলা কঠিন। তবে স্কুল উঠে যাওয়ার পরে খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশন সংক্রান্ত এক্সিকিউটর প্রভাসচন্দ্র মল্লিক আর দুলালচন্দ্র আইচ বিনা ভাড়ায় ৬৪-এ ধর্মতলা স্ট্রিটের স্কুলবাড়িতে কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। খেলাতস্কুলের কয়েকজন শিক্ষকই পড়াতেন সেখানে। কোচিং ক্লাসের আয় থেকে স্কুলের

শিক্ষকদের বকেয়া বেতন পুরো মেটানো গিয়েছিল কিনা, তা প্রদীপ ঘোষের সঠিক জানা নেই। তবে তাঁর ধারণা ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত কোচিং ক্লাস চলেছিল (রুশতী সেন, ১৯৯৩ : ৫৮)। এহেন খেলাতস্থলে চাকরির নিরাপত্তা কেমন, তা সহজেই অনুমেয়। সুপ্রভার সঙ্গে কথোপকথনে একদিন যেমন বিভূতিভূষণ বলে ফেলেন, তাঁর মাসমাইনে আদৌ সত্তর টাকা নয়, মাত্র চল্লিশ টাকা, তেমন কাহিনী গজেন্দ্রকুমার মিত্রের সঞ্চয়েও আছে—'ও ইস্কুলে ওঁর মাইনে কি ছিল ঠিক বলা শক্ত। একবার বলেছিলেন ৬০ আর একবার বললেন পঞ্চাশ। তাছাড়া তখন পুরো মাইনে কেউ পেতেন না, বা দেরি হত। স্কুলের অবস্থা টলমল। উনিও পড়াতেন—কখনও গল্প বলতেন, মেঘ ঘনিয়ে এলে ছাদের একটা কোণ ছিল সেইখানে বসে মেঘ দেখতেন।' (রুশতী সেন, ১৯৯৩ : ১৮৫)। সুপ্রভাকে লেখা বিভূতিভূষণের চিঠিতেও আছে, 'আমার স্কুলের ছাদে টিফিনের সময় আমি একটা কিছু পেতে রৌদ্রে শুয়ে থাকি বৈশাখ মাসেও। অন্য অন্য মাস্টাররা বলেন—একটা অসুখ বিসুখ বাধাবেন দেখচি বিভূতিবাবু, অমন খাড়া রোদে শোবেন না, উঠে আসুন, উঠে আসুন।' (অপ্রকাশিত)।

এই তো তিনের দশকে বিভূতিভূষণের স্থায়ী জীবিকা! সঙ্গে আছে খাতা দেখা, ছাত্র পড়ানো বাড়িতে, কিংবা ভারত ইনসিওরেন্স কোম্পানির এজেন্ট হওয়ার বিফল প্রয়াস। স্কুলে দেবব্রতর মতো ছাত্রদের নিয়ে বিভূতিভূষণের মমতা-দুর্বলতার অন্ত নেই। 'অপরাজিত' দ্বিতীয় খণ্ড তখন ছাপা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, একদিনের দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ লিখছেন, 'স্কুলে দেবব্রত খাতা দেখাতে কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে ওবেলা—তাকে বললাম, তুই আমার ছেলে তো?···সে বললে একটু সলজ্জ হেসে—হ্যাঁ। ও কখনো এ কথা বলে নি এর আগে। তাই আজ আনন্দে মনটা পূর্ণ আছে সারাদিন।' কয়েকমাস পরে বিভূতিভূষণ লেখেন, '···দেবব্রত চলে গিয়েচে। কোথায় গিয়েচে, বা দেবব্রতর কি হয়েচে তা আমি লিখব না। কিন্তু আমার মনে যে ব্যথা লেগেচে এতে—ভেবে দেখবারও অবকাশ পাই নে সব সময়। এক-একবার গভীর রাত্রে মনে পড়ে, ঘুম আসে না চুপ করে থাকি—অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করি—সে ব্যথা বড় সাংঘাতিক—যাক্ ও-কথা আর লিখে কি হবে!' (তৃণাঙ্কুর, বি র ২ : ২০৯, ২১৫)। সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বইতে বিভূতিভূষণের প্রিয় ছাত্র দেবব্রতর মৃত্যুর বছরটি ১৯৩২-এ নির্দিষ্ট করেছেন (সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৭০ : ৮১)। বারাকপুর গ্রামে বিভূতিভূষণের পাঠশালা করা, খুকুকে পড়ানো, গল্প বলা, আকাশে বৃশ্চিকনক্ষত্র চেনানো, এসব

উল্লেখ 'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপিতে বারবার মেলে। কিন্তু শিলঙের লেডি কীন কলেজের অধ্যাপিকা সুপ্রভা দত্তের সঙ্গেও যে শিক্ষক-ছাত্রীর সম্পর্কে মাঝেমধ্যে চলে যেতেন বিভূতিভূষণ, এ তথ্য তুলনায় নতুন।

সুপ্রভা চৌধুরীর স্মৃতিকথায় আছে, 'প্রথম যখন শিলং কলেজে পড়াতে গেলাম —শুধু প্রথম বার্ষিক শ্রেণী affiliated, দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে চারটি ছাত্রী প্রাইভেট পরীক্ষা দেবে। অধ্যক্ষ ব্রজসুন্দর রায়, Mrs. Bolton ও আমি তিনজনেই ইংরেজী সাহিত্যের, অথচ বিষয় পড়াতে হবে অনেক। অধ্যক্ষ নিজে পড়াতেন ইতিহাস ও Civics, Mrs Bolton ইংরেজী, ও আমাকে পড়াতে দেওয়া হোল Logic ও বাংলা। বাংলায় আবার কোন ২ ছাত্রী অতিরিক্ত বাংলাও নিয়েছে। তাতে লম্বা পদ্যাংশ গিরিশচন্দ্রের। ছন্দের তালটা ঠিক বুঝতে পারছি না, কোন note bookও নেই—অগত্যা চিঠি বিভূতিবাবুকে। তিনি Imperial Library ও শ্রীগুরু Libraryতে গিয়ে note করে পাঠালেন, সময় নষ্ট···বা খাটুনি···গ্রাহ্যই করলেন না।' (সুপ্রভা চৌধুরী, ১৯৯৫ : ৭৩)। সুপ্রভাকে লেখা বিভূতিভূষণের চিঠিতে দেখছি, 'গিরিশচন্দ্রের ছন্দ সম্বন্ধে আমি নিজে কিছু জানি নে। সজনীকে জিগ্যেস করেছিলুম, সে উড়িয়ে দিতে চায়—ও আবার ছন্দ! সুনীতিবাবু বল্লেন, ওটা গতিমাত্রিক ছন্দ···মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভেঙে নাটকীয় কথাবার্ত্তার সুবিধার জন্যে গিরীশচন্দ্র তাঁর ছন্দ প্রবর্ত্তন করেন। আমি এ সম্বন্ধে দু তিনখানা বই দেখলুম, কোনোটাতে কিছু নেই—কেবল কুমুদ সেনের বই থেকে যে কটা লাইন পেয়েচি, তোমায় পাঠিয়ে দিলাম। ওর বেশী কেউ লেখেনি। কেউ বলতেও পারেনা। যদি এর পরে কিছু পাই, পাঠাবো।' SREEGURU LIBRARY-র ছাপানো লেটারহেডে বিভূতিভূষণ সুপ্রভাকে লিখে পাঠিয়েছেন 'Extract from Girish Ch. Ghosh Lecture (1933) of the Calcutta University by Kumud Bandhu Sen'। আরও পাঠিয়েছেন, অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গিরিশচন্দ্র' বইয়ের পৃষ্ঠা ২২৮-২৩২। বিভূতিভূষণের হাতের লেখায় পাতার উপরে শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'গৈরিশী ছন্দ'। চিঠিতে লিখেছেন, 'অবিনাশ গাঙ্গুলির "গিরিশচন্দ্র"এ ছন্দ সম্বন্ধে যতটা পাওয়া গেল, এই সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম। ওর বেশী আর নেই—ওতেই তোমার কাজ হয়ে যাবে—ওর বেশী বল্‌বার আছেই বা কি? আমায় ফরমাস দিতে ইচ্ছে হয় না লিখেচ কেন? আমার যত কাজই থাকুক না কেন সে কথা তোমায় ভাবতে হবে না। খুব রাগ করবো যদি জানতে পারি তোমার কোনো দরকার শুধু সঙ্কোচের জন্যে

আমায় জানাও নি। তোমার কোনোরকম অসুবিধে থাকার কথা আমি সহ্য করতে পারি নে।' (অপ্রকাশিত)।

ঐকান্তিক কি তবে বারাকপুরই

খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশনের দৈনন্দিন বিভূতিজীবন আর বিভূতি-সাহিত্যের সেতুবন্ধনে মূর্ত হল 'অনুবর্ত্তন' উপন্যাসে। তখন চারের দশক পড়ে গেছে, বিভূতিভূষণ ছেড়ে দিয়েছেন খেলাতস্কুলেব চাকরি। কিন্তু বিভূতিভূষণের উপন্যাসের স্কুলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব বোমাতঙ্কে ভয়ার্ত কলকাতা-নগরীর স্বল্পশিক্ষিত নিম্নবিত্ত স্কুলমাস্টারদের ত্রস্ততার মুখোমুখি আছেন ক্লারিজ সাহেবকে ভেঙে গড়া ক্লার্কওয়েল সাহেব। ইংরেজ শাসনের অবিচল নিরাপত্তা নিয়ে আস্থাব কথা রামনারায়ণ ভট্টাচাযের অনুরূপ কোনো প্রধান-শিক্ষকের মুখে তেমন আয়রনিতে বাজতে পারে না, যেমন তা বেজেছিল 'অনুবর্ত্তন'-এর ক্লার্কওয়েল সাহেবের মুখে। তবে সে উপন্যাস তো লেখা হচ্ছে ১৯৪২ সালে, যখন শেষ হয়ে গেছে বিভূতিভূষণেব বিন্দুবিন্দু জীবনযাপনের অধ্যায়। যে জীবনযাপন নিয়ে সুটবিহারী নবপরিণীতা স্ত্রী যমুনাকে গল্প করেন, 'দাদার মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসটি পৃথিবীর অষ্টম আশ্চয, তুমি দেখলে অবাক হয়ে যাবে। চারিদিকে বই আর বই…জামাকাপড় আধময়লা, চারিদিকে ছড়ান। টিনের কয়েকটা সুটকেস। চৌকির উপর গুটিয়ে রাখা বিছানা, সেই বিছানা যে কতকাল কাচা হয়নি তার ঠিক নেই। বালিশের ওয়াড় তেলে তেলে একদিক ছিঁড়ে গেলে তখন বালিশটি উলটে দিয়ে অপর পিঠটা মাথায় দেওয়া হয়। এসবের দিকে দাদার একটুও ভ্রূক্ষেপ নেই, এর মাঝে শুয়ে বসেই দিব্যি আনন্দে দাদার দিন কেটে যায়। ঐ মেসেই কত খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিভাবান ব্যক্তির শুভাগমন ঘটেছে…দাদাকে খুব যত্ন করবে, উনি জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন, যত্ন আর কোথায় পেয়েছেন বল।' (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ৫, ৭)। সম্ভবত ১৯৩৭ সালে সুপ্রভা বিভূতিভূষণকে পুজোর সময় একটি পার্সেল পাঠিয়েছিলেন। বিভূতিভূষণ লিখছেন, 'তোমার পার্সেলটা গত বৃহস্পতিবার হাটে পেয়েছিলুম। জিনিসগুলো ভারী চমৎকার হয়েচে…বালিশ ঢাকনিটা বেজায় সৌখীন, ও বালিস যে কোথায় পাতবো বুঝতে পারচি নে। রুমাল ভারী সুন্দর, তোমার হাতের কাজ বলে জিনিসগুলো আমার কাছে এত মূল্যবান হয়ে উঠবে যে ওসব আমি আর ব্যবহার করতে পারবো না। পাছে এটা ছিঁড়ে যায়, পাছে ওটা ধোপার বাড়ী

কাচতে গেলে হারিয়ে যায়। মাঝে মাঝে ব্যবহার করবো।' (অপ্রকাশিত)। ২২ জানুয়ারি ১৯৩৮ তারিখে, পাটনা কলেজে সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্বের দিনে, যে চিঠি সুপ্রভাকে সেখান থেকে লিখেছিলেন বিভূতিভূষণ, তাতে আছে, 'তোমার সেই বালিসটা এবার পাটনায় এনেচি। বালিসটা ভাগ্যিস পাঠিয়েছিলে, নইলে আমার যা বালিস ছিল, তা কোথাও বার করবার যো ছিল না। তোমার রুমালটাও এনেচি সঙ্গে।' (অপ্রকাশিত)।

সুপ্রভার সঙ্গে এরকম বিনিময় যখন বিভূতিজীবনের নিভৃতিতে অবিচ্ছেদ্য জড়িয়ে আছে, সেই সময়েই, ১৯৩৯-এ একদিন বিভূতিভূষণ দিনলিপিতে লিখলেন, '...পল্লীগ্রামের যে জীবনযাত্রা, শতাব্দীর পর শতাব্দী এই রকম, এই বাঁশ শিমুল বনে অপরাজেয় শোভা এমনি ধারা দেখা যায়—ঝিঙে ক্ষেতে এমনি ফুল ফোটে—কত বনসিমতলার ঘাট, কত গ্রাম্য মেয়ে, কত হাসি কান্না প্রেম বিরহ - এই রকম চলবে। এদের নিয়ে একটা বড় উপন্যাস লিখব আজ মাথায় এসেচে...মহাকাল যেন এই উপন্যাসের পটভূমি—নায়ক-নায়িকা গ্রাম্য নরনারী। Da Vinci-র শেষ জীবনের মত গম্ভীর তার আকৃতি।' (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৪৪৯)। এই কি তবে সেই উপন্যাস, যা লেখা হবে চারের দশকের মধ্যভাগ পার করে? ১৯৪৭ থেকে যে উপন্যাস ছাপা হবে 'অভ্যুদয়' পত্রিকায়? ১৯৩৯-এর একদশকেরও বেশি আগে, বিহারের আরণ্যক জীবনযাপনের মধ্যে বিভূতিভূষণের মনে প্রথম এসেছিল 'ইছামতী' নামের কোনো উপন্যাসের কথা, 'খুব রোদ চড়েছে, কলবলিয়াতে স্নান করতে এলাম। ঠাণ্ডা জলে নাইতে নাইতে ভাবছিলাম - ঐ আমাদের ইছামতী নদী। আমি একটা ছবি বেশ মনে করতে পারি, এইরকম ধু ধু বালিয়াড়ী, পাহাড় নয় শান্ত, ছোট, স্নিগ্ধ ইছামতীর দু'পাড় ভরে ঝোপে ঝোপে কত বনকুসুম· ·স্নিগ্ধ পাটা শেওলার গন্ধ বার হয়, জেলেরা জাল ফেলে, ধারে ধারে কত গৃহস্থের বাড়ী। কত হাসি কান্নার মেলা। আজ পাঁচশত বছর ধরে কত গৃহস্থ এল, কত হাসিমুখ শিশু প্রথম মায়ের সঙ্গে নাইতে এল—কত বৎসর পরে বৃদ্ধাবস্থায় তার শ্মশানশয্যা হল ঐ ঠাণ্ডা জলের কিনারাতেই, ঐ বাঁশবনের ঘাটের নীচেই। কত কত মা, কত ছেলে, কত তরুণ-তরুণী সময়ের পাষাণবর্ত্ম বেয়ে এসেছে গিয়েছে মহাকালের বীথিপথ বেয়ে...এদের গল্প লিখবো, নাম হবে ইছামতী।' (স্মৃতির রেখা, বি র ১ : ৪০৮)।

কিন্তু 'ইছামতী'কে নিজের শিল্পের সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনতে পারেন না বিভূতিভূষণ, যতদিন তাঁর ভবানীচরণ নিলুর মতো ঘরনির গৃহস্থালী, টুলুর মতো

পুত্রের সঙ্গ খুঁজে না পান। তাই কি চারের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় বিভূতিভূষণকে? বারাকপুর গ্রামে কল্যাণীর মনপ্রাণঢালা সংসার, সে সংসারে বাবলুর অর্থহীন হাসিকান্নার অনাহত প্রসাদ কি বিভূতিসাহিত্যের অনুষঙ্গে একাকার হয়ে যায়, যখন জীবন আর সাহিত্যের সেতু বেঁধে বেঁধে বিভূতিভূষণ পৌছতে চান তাঁর 'ইছামতী'তে? ১৯৩৯-এর শেষের দিকেই জীবনের এক মর্মান্তিক শোকের সময়, ছোট বোন জাহ্নবীর মৃত্যুর আঁধারে কল্যাণীর সঙ্গে যে বিভূতিভূষণের আলাপ হয়েছিল, সেই প্রসঙ্গেই তো এই শতকের তিনের দশকের বিভূতিজীবনকে দেখতে শুরু করেছিলাম। ১৯৩৯-এর শেষে কি ১৯৪০-এর গোড়ায় বিভূতিভূষণ বনগ্রামের বাসা তুলে দিয়েছিলেন (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৪৫৫)। সেই বাসা, যেখানে বিধবা বোন জাহ্নবীকে ছেলেমেয়েসহ এনে রেখেছিলেন। কিন্তু বনগ্রাম বিভূতিভূষণকে ছাড়ল না।

এই দশক জুড়ে বিভূতিভূষণের বিন্দু বিন্দু জীবনযাপনের একদিকে ছিল কলকাতা, মির্জাপুর স্ট্রিটের মেস, খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশনের চাকরি, নানান পত্রিকার আড্ডা এবং অবশ্যই লেখার তাগাদা, অন্যদিকে ছিল বারাকপুর, সেখানকার শ্যামল অবকাশ, সেখানকার খুকু ; আরও ছিল সুপ্রভা, শিলং। এর কোনো একটিকে বাদ দিয়েই তো বিভূতিসাহিত্যের সবচেয়ে ফলবান খণ্ডের সময়কালকে ওই সাহিত্যনির্মাণের ওতপ্রোত সত্যের অংশে চিহ্নিত করা যাবে না। একদিন ফুরিয়ে যায় সেই বিনিময়ের আখ্যান যে, 'সুপ্রভা...তোমার তো গ্রামোফোন আছে। উমা বসুর "নজর নেহি আতা" গানখানা আছে?...চমৎকার গান। যদি ওখানে পাওয়া যায় একখানা কিনো। "তুমি যে গিয়েছ বকুলবিছানো পথে" বলে একখানা শচীন দেব বর্ম্মণের গান শুনলুম—এখানাও চমৎকার। যদি পাওয়া যায় ওখানে এখানাও কিনো।' অথবা 'সেদিন সন্ধ্যাবেলা বেরিয়ে ফিরচি, উপীন জেলের বাড়ী কলের গান হচ্চে—হঠাৎই দাঁড়িয়ে গেলুম। তোমার সেই গানটা "দ্বার খুলে আর রাখবো না"—গানটা শুনলেই তোমার কথা মনে পড়ে, সেই বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে যাওয়ার কথা মনে হয়। গানটা শুনে যেন মনে হয় তুমিই গাইচ। যেন উপীন জেলের ঘরের দাওয়াতে তুমি বসে আছ। সন্ধ্যাবেলা মনটা এমন ভারী হয়ে গেল।' (অপ্রকাশিত)। নতুন বিনিময়, নতুন দায়িত্ব, নতুন বয়ানও হয়ত আসে বিভূতিভূষণের জীবনে, দৈনন্দিনে, ব্যক্তিগত আলাপে। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, অর্থাৎ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ৩ আশ্বিন কলকাতার মির্জাপুর স্ট্রিটের মেস থেকে বিভূতিভূষণ বনগ্রামে কল্যাণীকে চিঠি

লেখেন, 'এ মাসের প্রবাসীতে আমার "সুলোচনার কাহিনী" গল্পটা বেরিয়েচে। ওখানে "প্রবাসী" পাও তো পড়ে দেখো—নয় তো আমি নিয়ে যাবো এখন।' (বি র ১০ : ৩৫৯-৬০)।

১৯৪০ সালের ২৯ এপ্রিল সুপ্রভার বিয়ে হয়েছে অধ্যাপক বিপুলচন্দ্র দেব চৌধুরীর সঙ্গে। বিপুলচন্দ্র প্রথমে মদনমোহন কলেজে এবং পরে সরকারি কলেজ মুরারিচাঁদে ছিলেন। ১৯৪২ পর্যন্ত সুপ্রভা লেডি কীন কলেজে পড়ান। ১৯৪৩-এ প্রথম অধ্যক্ষার কাজ পান ঢাকার কমরুন্নিসা কলেজে। ১৯৪৭-এ তিনি সিলেটে মেয়েদের সরকারি কলেজে অধ্যক্ষা হয়ে আসেন। এইসময় বিভূতিভূষণ শ্রীহট্ট সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হয়ে এসেছিলেন সেখানে। সভায় যদিও যাননি সুপ্রভা, বিভূতিভূষণ তাঁদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন সেই বাড়িতে, সিলেটে এসে যেখানে উঠেছিলেন তিনি। নিজে এসেছিলেন সুপ্রভাদের পুরান লেনের বাড়িতে। সুপ্রভা আর বিভূতিভূষণের সেই শেষ দেখা। তার বেশ কয়েক বছর আগে ১৯৪১-এর গরমের ছুটিতে সুপ্রভা যখন স্বামীর সঙ্গে কালিম্পং আর দার্জিলিং যান, তখনও একদিন দার্জিলিঙে পথে হঠাৎই দেখা হয়ে যায় তাঁদের। বিভূতিভূষণের সঙ্গে কল্যাণী ছিলেন। ১৯৫০-এর দাঙ্গায় সুপ্রভারা কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হন। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের বিশেষ সহযোগিতা তখন তাঁরা পেয়েছিলেন। সুপ্রভা চৌধুরী কলকাতার ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন কলেজে অধ্যক্ষার পদ পেলেন, সঙ্গে ফ্রি কোয়ার্টার। বিপুলচন্দ্র কাজ পেলেন সরকারের রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে। তবে ১৯৪০-পরবর্তী যে জীবন সুপ্রভার, তা কি বিভূতিজীবনীর অংশ হতে পারে? পারে হয়ত মাত্র সেইটুকুই, যেটুকু বিভূতিভূষণ তাঁর ১৯৪০-এর এবং ১৯৪০-পরবর্তী দিনলিপিতে সুপ্রভার সম্বন্ধে লিখেছিলেন। ১৯৩৯-এ সুপ্রভার মায়ের অসুস্থতার জন্য হাওয়া বদলাতে যখন একমাসের জন্য দেওঘরে গিয়েছিলেন সুপ্রভা, তাঁর বাবা-মা, সুপ্রভার পরলোকগতা দিদির ছেলেমেয়েরা, তখন সুপ্রভার অনুরোধেই বিভূতিভূষণ সেখানে যান, হাজার বিঘা বাগানের পাশে Carstairs Town-এ দু'দিন কাটিয়ে আসেন। বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পরে সুপ্রভা জানতে পারেন যে, ওপারে যখন দাঙ্গা চলছে, তিনি নাকি খুব উদ্বিগ্নভাবে সুপ্রভার খোঁজ নিয়েছিলেন দু-একজনের কাছে (সুপ্রভা চৌধুরী, ১৯৯৫ : ৭১)।

সুপ্রভা চৌধুরী লিখেছেন, 'যদিও তাঁর মধ্যে একটা নির্লিপ্ত উদাসীনতা ছিল, তাঁর জীবনের অবিরল গতিময়তাই তার উৎস মনে হোত। কোন কিছুতেই তাঁর

প্রশান্তিতে চিড় ধরে না···আমার বরং ধারণা এই যে কোন কিছুই, অতি তুচ্ছ অভিজ্ঞতাও তিনি ভুলতে পারতেন না—"ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা"—এই উপলব্ধি···ধরা পড়ে তাঁর···সৃজনশীল রচনায়, চিঠিপত্রে, দিনলিপিতে।' (সুপ্রভা চৌধুরী, ১৯৯৫ : ৭১)। কোন্ অভিজ্ঞতা তুচ্ছ, কীই বা মুখ্য, সে বিচার এখন থাক। পাঠক বরং ফিরে যান ১৯৪০-এ লেখা বিভূতিভূষণের "সুলোচনার কাহিনী" গল্পটিতে। ১৯৪০-এর শেষ ভাগে অর্থাৎ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত এই কাহিনী কি বিভূতিভূষণ-সুপ্রভার প্রায় আটবছর-ব্যাপী বিনিময়ের প্রবাহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল? সুলোচনা সমগ্র বিভূতিসাহিত্যের প্রায় একমাত্র নারী (মুজ্‌রোওয়ালি পান্না আর অভিনেত্রী শোভারাণীকে বাদ দিলে; "হিঙের কচুরী"র কুসুম আর "বিপদ" গল্পের হাজুকে তো বিভূতিভূষণ নারীর আদিমতম জীবিকায় চিহ্নিত করেছিলেন। আর কাটনী মজুব মঙ্কী অথবা "গল্প নয়"-এর চালওয়ালির মতো মেয়েরা তো সেই জগতের বাসিন্দা, যেখানে বিভূতিভূষণদের আলোকপর্ব পৌঁছয় না।) বাইরের দুনিয়ায় আধুনিক জীবন-জীবিকার কঠিন লড়াইতে যার অবস্থান। নিজের রোজগারে সুলোচনা পরমনিষ্ঠায় স্বামী সন্তান প্রতিপালন করত, সংসারের এমনকী সাধ্যমতো সমাজেরও সেবা করত। কিন্তু সুলোচনার যে দৈনন্দিন আপাতদৃষ্টিতে দেখত সকলে, তার অন্তরে নিহিত থাকত প্রেমাস্পদ প্রকাশদার জন্য প্রতীক্ষা। সুলোচনার দৈনন্দিনে সেই প্রতীক্ষাটুকুই যেন তার একমাত্র জীবন। কিন্তু রাজনৈতিক টানাপোড়েনের আবর্ত পেরিয়ে প্রকাশদা কোনোদিন ফিরে এল না। এল তার মৃত্যুসংবাদ। তার-পরে সুলোচনা আর বেশিদিন বাঁচেনি। জীবিকার লড়াইতে চিহ্নিত তার দৈনন্দিনও কোনো সফলতার রেশ রেখে যায়নি ভবিষ্যতের জন্য। কাহিনীর শুরুতেই পাঠক দেখেন সুলোচনার বৃদ্ধা মা কলকাতার পথে পথে ভিক্ষা করেন; আর আজ বাদে কাল সুলোচনার ছেলেদের মাথার উপর ছাদটুকুও থাকবে না।

"সুলোচনার কাহিনী" কি তবে বিভূতিসাহিত্যের সঙ্গে বিভূতিজীবনের কোনো এক মর্মান্তিক ইচ্ছাপূরণের সেতু বেঁধে দেয়? চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়কে বলেছিলেন বিভূতিভূষণ, কলেজজীবনে ছাত্রদের একটি মেসে তিনি কিছুকাল ছিলেন; ওই মেসের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের যোগাযোগ ছিল, ম্যাজিস্ট্রেট কিংস-ফোর্ডের হাতে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত সুরেশ সেনের সঙ্গে এই মেসবাড়িতেই তাঁর আলাপ হয়। ওই মেসজীবনের অভিজ্ঞতার থেকেই নাকি বহুপরবর্তী গল্প "সুলোচনার কাহিনী"র সূচনা (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১ : ৭৩-৭৪)। কিন্তু

১৯২০-রও আগেকার সেই সূত্রকে বিভূতিসাহিত্যে গাঁথবার জন্য তো ১৯৪০-এর শারদীয় লেখালেখি পর্যন্ত প্রতীক্ষা প্রয়োজন হয়েছিল! সেই যে সিলেটের সুদূর মিরাশি গ্রাম থেকে লেখা একটি মেয়ের চিঠির জবাবে ১৯৩২ সালের ২২ জানুয়ারি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'আমার আপন ভালো লাগায় / রচি আমার গান, / তুমি দিলে তোমার আপন / ভালোলাগার দান / মোর আনন্দ এমনি করে / নিলে আঁজল পেতে / তোমার আনন্দেতে', সেই সুপ্রভা দত্তের থেকে বেশি আলোকপ্রাপ্ত কোনো বান্ধবী বারাকপুর-বনগ্রাম-কলকাতার বিভূতিভূষণ জীবনভর পাননি। যে আলোর তাগিদে বারাকপুর গ্রাম থেকে, বনগ্রাম মফস্বল শহর থেকে কলকাতা মহানগরীতে আসা, সেই আলোর অবলম্বন ছাড়া ছাপোষা স্কুলের সামান্য বাংলার মাস্টার থেকে বাংলার যশস্বী সাহিত্যিক পর্যন্ত কিছুই হওয়া যায় না। কিন্তু সেই একই আলোর কতখানি ঝলক জীবনপথের সহযাত্রিণীতে সহ্য করা যায়? ১৯৪০-এ "সুলোচনার কাহিনী" যখন লিখছেন বিভূতিভূষণ, সুপ্রভার সঙ্গে উষ্ণ অন্তরঙ্গ বিনিময়ের প্রবাহ তখন তাঁর জীবনে সদ্যস্মৃতি।

সুপ্রভাকে উৎসর্গ করা 'জন্ম ও মৃত্যু' সংকলনের "ডাকগাড়ী" গল্প নিয়ে বিভূতিভূষণ তাকে লেখেন, 'তুমি না সুবি, না বাধা। তুমি ওদের মত হতে যাবে কেন? বালাই-ষাট।' বিভূতিসাহিত্যে যে মানী সম্পূর্ণ অন্দরবাসিণী, তাকে নিয়ে বিপিনের মনোভাবের গঞ্জনা প্রায় হুবহু মিলে যায় ১২ অক্টোবর ১৯৩৮-এ সুপ্রভাকে লেখা বিভূতিভূষণের চিঠির ভাষায়। অথচ বিভূতিসাহিত্যের মানীর কোনো বাহির নেই, কোনো নিজস্ব স্বাবলম্বন নেই। কখনও জন্মসূত্রে, কখনও বা বিবাহসূত্রে পাওয়া সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারেই সে তার আন্তরিকতা-শুভেচ্ছা-ভালোবাসাকে শ্রীতে কিংবা মাঙ্গল্যে ভরে তুলতে চায়। আর ১৯৩৮-এর ১১ অক্টোবর যে চিঠিতে বিভূতিভূষণ সুপ্রভাকে লেখেন 'এক জায়গায় একবার হোলে দু জায়গায় হয় না', সেই চিঠি লেখা হচ্ছে বারাকপুর থেকে। সেই চিঠিতেই আছে, 'খুব বড় একটা শিউলি গাছ আছে উঠোনে—ঠিক আমার শোয়ার ঘরের জানালার সামনে—কাল সারারাত কেমন ফুটফুটে জ্যোৎস্না, তেমনি শিউলি ফুলের ঘন সুগন্ধ। তুমি যদি এখানে থাকতে সুপ্রভা।...শিলং টিলং কিছু না...তোমাকে যদি এখানে পেতুম তা হোলে আর শিলং যেতুম না।' (অপ্রকাশিত)। অথচ সত্যিই যদি সুপ্রভা বারাকপুরের হত, যদি তাকে বারবার বারাকপুরেই পাওয়া যেত, তবে কি সুপ্রভার আলোতে বিভূতিজীবনের কত মুহূর্ত এতখানি স্নাত হতে পারত? আবার বিভূতিজীবনপ্রবাহ তো তাকে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত

বয়ে যেতে পারে না, যাকে বারাকপুরে পাওয়া অসম্ভব!

জীবনের এই জটিল দ্বন্দ্বের উপশমেই কি সাহিত্যের বহির্যাত্রিণী সুলোচনা মর্মান্তিক ভবিতব্যে উপমা পায়? আর ১৯৪০-এ "সুলোচনার কাহিনী"র প্রথম প্রকাশের সমকালে বিভূতিভূষণ হয়ত স্বভাবসুলভ 'নির্লিপ্ত উদাসীনতা'য়, 'প্রশান্তি'তে এবং অবশ্যই শিল্পীর অনায়াস নৈর্ব্যক্তিকতায়, কল্যাণীকে লিখতে পারেন গল্পটি পড়বার কথা। "সুলোচনার কাহিনী" যে বিভূতিসাহিত্যেরই অংশ, সুলোচনা যে বিভূতিভূষণেরই সাহিত্যিক নির্মাণ, এতে তো কোনো মিথ্যা নেই। বিভূতিজীবনের কোনো দ্বন্দ্ব সে নির্মাণে ছায়া ফেলে কিনা, তা কি বুঝতে পারেন কিশোরী কল্যাণী? যে কল্যাণীকে বিভূতিভূষণের বারাকপুরে সহজেই ধরিয়ে নেওয়া যায়? এ দ্বন্দ্ব কি বিভূতিভূষণেরও সচেতন উপলব্ধিতে সম্পূর্ণ ধরা পড়ত? "সুলোচনার কাহিনী"কে সার্থক সাহিত্য করে তুলবার জন্য তো তেমন কোনো সচেতনতার দায় শিল্পীতে বর্তায় না। ঠিক তেমনি ১৯৪০-এর অগাস্ট মাস নাগাদ 'মাতৃভূমি' পত্রিকায় সমাপ্ত এবং সেই বছরেই গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' উপন্যাসে হাজারি ঠাকুরের সাফল্যের বিন্যাস তো বিভূতিভূষণেরই নির্মাণ। কিন্তু হাজারির সাফল্য, এযাবৎকাল বিভূতিসাহিত্যে ফিরে ফিরে আসা সব ভণ্ডুলমামাদের, এমনকী পরবর্তী দশকেও বিভূতিভূষণের লেখায় যেসব ভণ্ডুলমামা এসে পড়বেন, তাঁদেরও, স্বাবিরোধ, গ্লানি আর নিরালম্ব ব্যর্থতার থেকে একেবারে ভিন্ন কোনো আখ্যান বানাতে চায়। যেন জানাতে চায় ইংরেজিশিক্ষিত আধুনিক বাঙালি জীবনের নিরর্থকে, দৈন্যকে। সাহিত্যের এই ব্যঞ্জনাও খুবই সম্ভব তৈরি হয়ে যায় সাহিত্যিকের কোনো সচেতন উপলব্ধি ব্যতিরেকেই। সেখানেই প্রকৃত শিল্পীর যথার্থ ক্ষমতা। বর্তমান শতকের তিনের দশকটি জুড়ে বিভূতিভূষণের সেই আশ্চর্য ক্ষমতা 'অপরাজিত' থেকে 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' পর্যন্ত, "ভণ্ডুলমামার বাড়ি" থেকে "সুলোচনার কাহিনী" পর্যন্ত বারবার বাংলাসাহিত্যে উপচে পড়ে।

—

কথকের সংসার কথকের উত্তরাধিকার

'অপরাজিত' থেকে 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', "ভণ্ডুলমামার বাড়ি" থেকে "সুলোচনার কাহিনী"—এই পরিক্রমার সূচনাই তো বিভূতিজীবনকথার শুরু নয়। 'অপরাজিত'র পথকে যেমন 'পথের পাঁচালী' থেকেই নির্দেশ করা যায়, তেমনি 'পথের পাঁচালী'তে পৌঁছনোর পথও তো কোথাও না কোথাও শুরু হয়েছিল। সেই শুরুর হদিস কি মিলতে পারে পরিমল গোস্বামীর মতো নিকটজনের স্মৃতিচারণে? যে স্মৃতিতে আছে বিভূতিভূষণের মুখে শোনা তাঁর বাল্যকালের কথা; '…বালক বিভূতিভূষণের চরিত্রে একটা মজার বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। তখন তাঁর বয়স ন'দশ বৎসর। এই সময় তিনি একা বেরিয়ে যেতেন বহু দূরের কোনো নির্জন স্থানে, কখনো বা নির্জন নদীর ধারে। হাতে নিতেন একখানা বাঁশের কঞ্চি। সেই কঞ্চি হাতে একা দাঁড়িয়ে তিনি শূন্যে চীৎকার করে গল্প বলতে শুরু করতেন। যে-কোন গল্প যে-কোন বিষয়ে। ছোট ছেলেদের কাছে বয়স্করা যেমন বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলতে থাকেন, সে গল্পের সঙ্গতি বিষয়ে কথকের কোন দায়িত্ব থাকে না, অবিরাম ধারায় বলে যাওয়াই যে গল্পের সার্থকতা, সম্ভব অসম্ভব যা মনে আসে, নির্ভাবনায় বলা যায়, বিভূতিবাবুও এই বয়সে তাঁর কাল্পনিক শ্রোতাকে উদ্দেশ করে ঠিক তেমনি ভাবে গল্প বলে যেতেন। কোনো কোনো গল্প আবার একদিনে শেষ হত না, মাসিকপত্রে ক্রমশঃ গল্পের মতো তিন চার কিস্তিতে শেষ হত। অকারণ কথা বলার আকাঙ্ক্ষা এবং কথা বলা উপলক্ষে কাহিনী বানিয়ে যাওয়ার আনন্দ, বালক বিভূতিভূষণকে নেশার মতো পেয়ে বসেছিল। লোকজন ডেকে সেসব কাহিনী শোনাবার মতো নয়। বালকের রচিত সেসব কাহিনীর সমঝদার যে মানব সমাজে দুর্লভ এটুকু বোধ তাঁর তখনই জন্মেছিল। প্রাণে অফুরন্ত কথা অথচ শোনাবার লোক নেই, এমন অবস্থায় আর কি করা যায়? অতএব চল নির্জন স্থানে, গিয়ে ঘাসের কাছে, গাছের কাছে, নদীর কাছে হাওয়ার কাছে গল্প বল।'

এই বিন্যাসের সূত্রে পরিমল গোস্বামীর স্বভাবসুলভ কৌতুক লক্ষণীয়, 'এর মধ্যে বাঙালী লেখকের ভবিষ্যতেরও বেশ একটা ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয়।

এদেশে গল্প লিখলেও বা কজন পড়ে? ভাল গল্প পড়ার মতো লোক বাঙালীদের মধ্যে অন্তত দশলাখ আছে। কিন্তু হাজারকয়েক গল্পের বই বিক্রি করতেই প্রকাশকেরা হিমসিম খেয়ে যান। তাই বাঙালী গল্পলেখককে শেষ পর্যন্ত অরণ্যেই রোদন করতে হয়। বিভূতিভূষণ বাল্যকাল থেকেই এই অরণ্যে রোদন অভ্যাস করেছিলেন।' (যুগান্তর সাময়িকী, রবিবার, নভেম্বর ১২, ১৯৫০, পৃ ৯)। 'পথের পাঁচালী'র প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ নিয়ে সজনীকান্ত দাস লিখেছেন, '...তখন ২৫/৫০, টাকায় বাংলা বইয়ের কপিরাইট বিক্রয়ের কাল। আমি প্রথম সংস্করণ "পথের পাঁচালী"র জন্য বিভূতিভূষণকে নগদ তিন শত পঁচিশ টাকা দিয়া সেই মারাত্মক পদ্ধতির মূলে কুঠারাঘাত করি। সেইদিন হইতে বাংলা ভাষার লেখকদের সুদিন আসিয়াছে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অবগত আছেন।' (আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয়, নভেম্বর ৫, ১৯৫০, পৃ ৯)। কিন্তু 'অপরাজিত' উপন্যাস যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে গেছে, তখনও বিভূতিভূষণের ধারণা ছিল, 'আমাদের দেশে মুড়ি-মিছরীর একদর – International standard of values এখানে খাটে না, সাহিত্যিক খ্যাতির মূল্য এখানে কানাকড়িও না।' (অপ্রকাশিত)।

হয়ত সেই বালকবেলায় ঘাসের কাছে গাছের কাছে, নদীর কাছে, হাওয়ার কাছে গল্প বলে বলেই পথের পাঁচালী'কারের যাত্রার সূচনা। আবার সে সূচনার আগেও তো আরও এক বা একাধিক সূচনার মুহূর্ত থাকতেই হবে। যেমন প্রত্যেক প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকানো, তেমনি সেই সকালবেলার সলতে পাকানোর পিছনে তো আছে আগের দিনের প্রদীপ জ্বলতে জ্বলতে পুরনো সলতে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার ইতিহাস। এমন করে পিছন থেকে আরও পিছনে ফিরতে ফিরতেই বিভূতিজীবনীকারকে পৌঁছতে হয় গত শতকের শেষভাগে, ১৮৯৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বরে, এমনকী তারও কোনো পূর্বকথায়। বিভূতিভূষণের পূর্বপুরুষদের আদিনিবাস ছিল এখনকার চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার পানিতর গ্রামে। বিভূতিভূষণের পিতামহ তারিণীচরণ অবিভক্ত বাংলার যশোর জেলার বারাকপুর গ্রামে চলে এসেছিলেন পানিতর থেকেই। বর্তমানে এই বারাকপুর গ্রাম পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত। তারিণীচরণের আশা ছিল, বারাকপুর অঞ্চলে তিনি চিকিৎসাব্যবসায় সাফল্য পাবেন। তাঁর শ্বশুরবাড়ির সূত্রে কিছু আত্মীয়স্বজন এই বারাকপুর গ্রামের আশেপাশে ছড়িয়ে ছিলেন। তখন নীলচাষের ফলে নদীয়ার এবং খুলনার বিস্তৃত অঞ্চল বেশ কিছুটা সমৃদ্ধ। নদীয়া যশোরে নীলচাষ এবং নীল উৎপাদনের বৃহত্তম

কেন্দ্র নদীয়ার মোল্লাহাটির দূরত্ব বারাকপুর গ্রাম থেকে মাত্র চার-পাঁচ মাইল।

তারিণীচরণ-কাশীশ্বরীর মহানন্দ ছাড়া আর কোনো সন্তান ছিল বলে বিভূতিভূষণ-ন্টুবিহারীর মুখে তাঁদের নিকটজনেরা কখনও শোনেননি। খুবই সম্ভব মহানন্দই তারিণীচরণ-কাশীশ্বরীর একমাত্র সন্তান। বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে যে রাখালী পিসিমা বা মেনকা পিসিমার উল্লেখ আছে, তাঁরা মহানন্দর জ্ঞাতি বোন। বিধবা মেনকা অবশ্য মহানন্দর সংসারেই থাকতেন। বাল্যকালে মহানন্দ আদৌ শান্তশিষ্ট ছিলেন না। তাঁর সাহস এবং জেদ ছিল প্রবল। মা-বাপের অতিরিক্ত আদর পেতেন। প্রথম বয়সে লেখাপড়াতেও তাঁর বিশেষ মনোযোগ ছিল না। তারিণীচরণ ছেলেকে খানিকটা সংস্কৃত শিখিয়েছিলেন। কাছাকাছি নীলচাষ, বারাকপুরে নীলকুঠির অবস্থান, এসব মিলে গ্রামে কিছুটা ইংরেজির চর্চা ছিল। গ্রামের কার্তিক বাঁড়ুজ্যের উত্তরপুরুষরা ওই নীলকুঠিতে গোমস্তার অথবা নায়েবের কাজ করতেন। ইংরেজি খানিকটা জানেন, এমন মানুষ মহানন্দর বাল্যকৈশোরে বারাকপুর গ্রামে একেবারে অমিল ছিল না। মহানন্দ তাঁদের কাছে নাকি কিছুদূর ইংরেজি শিখেছিলেন। এমনকী তারিণীচরণ ছেলেকে বনগ্রাম স্কুলে পড়তেও পাঠান। মহানন্দ এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু পাস করতে পারেননি, এরকমও শোনা যায়। কথকতা ছিল মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবিকা। ১৯১০ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি গোপালনগর ডাকঘরে মহানন্দ যে অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন, তার পাসবইতে আছে, 'Depositor's Name Mahananda Bandyopadhyay son of Late Tarini Charan Bandyopadhyay Occupation / Profession Kathakata' (অপ্রকাশিত)। মহানন্দর কৈশোর-কালে এবং যৌবনে বনগ্রামের চারপাশে গানের চর্চা ছিল খুব বেশি। মহানন্দর গলা ছিল সুন্দর আর দরাজ।

বনগ্রামের কাছে উলসী গ্রামে থাকতেন 'মধুকান' নামে পরিচিত মধুসূদন কিন্নর —টপকীর্তন গায়ক। কিন্নর সম্প্রদায়ের নাচগানে যথেষ্ট খ্যাতি। মধুসূদন আবার যৌবনকালে ঢাকায় গিয়ে ছোটে খাঁ আর বড়ে খাঁর কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম নিয়েছিলেন। নিরক্ষর 'মধুকান' মুখে মুখে গান বাঁধতেন ; সেই পালাগান কাগজে কলমে লিখে নিতেন মুহুরি। 'কলঙ্ক ভঞ্জন, 'অক্রূর সংবাদ', 'মাথুর' এবং 'প্রভাস' হল মধুকানের এমন চারটি পালা, যা সে আমলে ছেপে বেরিয়েছিল। মহানন্দের সংগীত সংগ্রহের খাতায় মধুকানের বাঁধা কয়েকটি গান লেখা আছে। মহানন্দ যৌবনকালে মধুকানের গান নিশ্চয় শুনেছিলেন। আর

ঢপকীর্তনে ছুটসংগীতের প্রবর্তক মোহনদাস বৈরাগী মধুকানেরও আগের মানুষ। তিনি থাকতেন গোপালনগরে। তাঁর বাঁধা তিনটি গানও মহানন্দের গানের খাতায় পাওয়া গেছে। কথকতার কাজে মহানন্দ অনেক-সময়েই কৃষ্ণনগরে থাকতেন। রানাঘাট থেকে গোপালনগরের দূরত্ব বেশি নয়। আর বারাকপুর গ্রাম থেকেও গোপালনগর মাত্র মাইল দেড়েকের পথ। মহানন্দ হয়ত এই সংগীত-সংলগ্নতায় জীবন, জীবিকা, উভয়েরই সুসার খুঁজতে চেয়েছিলেন। বিখ্যাত কথক উদ্ধব শিরোমণির কাছে তাঁর কথকতার পাঠ। এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার সমসময়ে মহানন্দর বিবাহ হল বারাকপুরের খুবই কাছে বৈরামপুর গ্রামে একান্ত সম্পন্ন জমিদার পরিবারের বেয়ে হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে। হেমাঙ্গিনীর পিতা খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন রানাঘাটের নাম করা উকিল। মা-বাবা আর বালিকা স্ত্রীকে ফেলে রেখে মহানন্দ যে হঠাৎ বারাকপুর ছেড়ে কাশীতে চলে গেলেন, তার মূলে নাকি ছিল তারিণীচরণের তিরস্কার। লেখাপড়ায় ছেলের অমনোযোগ আর গানে, কথকতায় অত্যধিক মনোযোগ তারিণীচরণ মেনে নিতে পারতেন না।

কাশীতে মহানন্দ অনেকদিন ছিলেন। শাস্ত্র এবং সংগীত আলোচনায় তখন তাঁর দিন কাটত। সেই কাব্যচর্চার পরিচয় মেলে তাঁর 'সঙ্গীত সংগ্রহের খাতা'য়। গানের নেশায়, পশ্চিমের বহু জায়গায় তিনি ঘুরেছিলেন। এমনকী, পেশোয়ার পর্যন্ত গিয়েছিলেন মহানন্দ, এমনও শোনা যায়। বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ণিমারাতে গোয়ালিয়রে তানসেনের সমাধিস্থানে পশ্চিমের বিভিন্ন শিল্পীরা মিলিত হতেন সংগীতের সেই প্রবাদপুরুষের স্মৃতিতর্পণের উদ্দেশ্যে, করতেন সম্মিলিত সংগীতানুষ্ঠান। একবছর সেই অনুষ্ঠানের সময় মহানন্দ নাকি গোয়ালিয়রে, সেই আসরে উপস্থিত ছিলেন। কাশী থেকে যখন মহানন্দ ফিরলেন, তখন তিনি সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন, সংগীতে সিদ্ধ। ততদিনে তারিণীচরণ এবং কাশীশ্বরীর মৃত্যু হয়েছে। আর হেমাঙ্গিনী বাপের বাড়িতে—বৈরামপুর গ্রামে অথবা রানাঘাট শহরে। মহানন্দ যখন ফিরে এলেন, তখন তাঁর বয়স তিরিশের কোঠার মাঝামাঝি, কি আরো কিছু বেশি। তিনি হেমাঙ্গিনীকে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এলেন বারাকপুর গ্রামে। অনেকদিন প্রবাসের শেষে সাংসারিক সেবা-যত্নের উষ্ণ স্পর্শ লাগল মহানন্দের দৈনন্দিন জীবনে। পশ্চিমভারত থেকে দুটি অভ্যাস সঙ্গে এনেছিলেন মহানন্দ, যা নাকি যশোর জেলার বারাকপুর গ্রামে একেবারে বেমানান। একটি চায়ের নেশা, অন্যটি হিন্দি সংবাদপত্র পড়া। হিন্দি এবং বাংলা,

উভয় মাধ্যমের 'বঙ্গবাসী'রই গ্রাহক হয়েছিলেন মহানন্দ। বারাকপুরের মতো জায়গায় তখন জমিদারবাড়ির দারোয়ান বরকন্দাজ বাদে হিন্দিভাষী চোখে পড়ত না। হিন্দিভাষা যেটকু শিখেছিলেন, সেই শিক্ষা যাতে হারিয়ে না যায়, তার-জন্যই সম্ভবত মহানন্দ হিন্দি 'বঙ্গবাসী'ও পড়তেন।

হেমাঙ্গিনীর সন্তান হয় না। যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় আছে, হেমাঙ্গিনী নাকি পুত্রকামনায় কাশীতে কার্তিকপুজো করেছিলেন। হেমাঙ্গিনী কখন কাশী গিয়েছিলেন, তার কোনো স্পষ্ট হদিস অবশ্য মেলে না। কিন্তু স্বামীকে যে তিনি বারবার অনুরোধ করতেন, দ্বিতীয় বিবাহের জন্য, এরকম উল্লেখ বিভূতিভূষণের নিকটজনদের স্মৃতিকথায় মেলে। স্বামীশ্বশুরের বংশরক্ষার দায়িত্ব হেমাঙ্গিনীর কাছে বড় হয়ে উঠত। প্রথম প্রথম মহানন্দ স্ত্রীর সেই অনুরোধ এড়িয়ে যেতেন। গল্প আছে, মহানন্দ-হেমাঙ্গিনীর বারাকপুরের বাড়িতে এক চৈত্র সংক্রান্তির দিনে অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটে। এক সন্ন্যাসী এসেছিলেন ভিক্ষা নিতে। কিন্তু যে সংসারে সন্তান নেই সে ঘরের দান তিনি নিতে নারাজ, এমনি নাকি তাঁর গুরুর আদেশ। হেমাঙ্গিনী আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লে সৌম্যকান্তি ওই সন্ন্যাসী নাকি বলেন, হেমাঙ্গিনীর যদিও সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তবে এই গৃহে একদিন, এক দিব্যাত্মার আবির্ভাব ঘটবে; সেই মহাপুরুষ হেমাঙ্গিনীর শ্বশুরকুলকে ধন্য করবেন, জননী কৃতার্থ হবেন—'তুমি তোমার স্বামীর বিবাহ দাও মা। সপত্নী পুত্রকন্যাদের নিজের গর্ভজাত অপত্যের মত পালন কর...।' ১২৯৬ বঙ্গাব্দের ২৪ জ্যৈষ্ঠ কাঁচরাপাড়ার সংলগ্ন মুরাতিপুর গ্রামের গুরুচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা মৃণালিনীকে মহানন্দ বিবাহ করেন। তাঁর 'সঙ্গীত সংগ্রহের খাতা'য় আছে: '১২৯৬ সাল। ২৪ জ্যৈষ্ঠ পক্ষান্তরে বিবাহ করি। এই মাসেই পরিবারের বয়স পূর্ণ ১২।' পাটুলির চাটুতি কৃষ্ণের সন্তান দর্পনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মণচন্দ্র। লক্ষ্মণচন্দ্রের পুত্র ত্রাহিরাম চট্টোপাধ্যায় গুরুচরণের পিতা।

কাশীতে সংস্কৃত অধ্যয়নের সূত্রে শাস্ত্রী উপাধি পেয়েছিলেন মহানন্দ; পিতৃসূত্রে কবিরাজিও তাঁর কিছুদূর জানা ছিল। গত শতাব্দীর শেষভাগে বাঙালির নবজাগরণ যখন নানান স্ববিরোধে জটিলতায় আকীর্ণ, মহানন্দকে তখন প্রতি মুহূর্তে বুঝতে হত যে তাঁর শাস্ত্রী উপাধিটির মূল্য নেহাতই যৎসামান্য। সে মূল্য দিয়ে এন্‌ট্রান্স পেরতে না-পারার দুর্বহ ভারকে সহনীয়তার মধ্যে রাখা প্রায় অসম্ভব। মহানন্দর দ্বিতীয়পক্ষের শ্বশুরবাড়ির দেশ ঘোষপাড়া মুরাতিপুরে দোলপূর্ণিমায় বিরাট মেলা বসে। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের পীঠস্থান ঘোষপাড়া মুরাতিপুর; সে সম্প্রদায়ের

প্রতিষ্ঠাতা আউলচাঁদের আর সতীমায়ের দোলই ঘোষপাড়া মুরাতিপুরের খ্যাতির মূলে। গুরুচরণ কর্মসূত্রে বর্ধমানের খোশবাগান পাড়ায় থাকলেও, মুরাতিপুর গ্রামের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। মৃণালিনীর সঙ্গে মহানন্দর বিয়ের সাড়ে পাঁচবছর পরে এই মুরাতিপুরেই বিভূতিভূষণের জন্ম, ১৩০১ বঙ্গাব্দের ২৮ ভাদ্র, ইংরেজি ১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪। জ্যেষ্ঠ সন্তানের জন্মপত্রিকায় মহানন্দ লিখেছেন, '(শুক্লপক্ষ) ১৩০১ সাল, ২৮শে ভাদ্র বুধবার দিবা ১০॥ সাড়ে দশ ঘণ্টার সময় আমার বিভূতিভূষণ পুত্রের জন্ম হয়॥ মুরাতিপুর গ্রামে। ইঙ্গরাজী ১৮৯৪। ১২ সেপ্টেম্বর দিবা ৩০।৪২ রাত্র ২৯।১৮ ২৮ ভাদ্র বুধবার ত্রয়োদশী ৬০।০ শ্রবণা নক্ষত্র ১২।৪৫ ইং দিবা ১০।৫৮ কৌলবকরণ অতি গণ্ডযোগ ১২।২২ ইং দিবা ১।৪৮। যাত্রা নাস্তি পাপ যোগ…জন্ম মকর রাশি দেবগণ শূদ্রবর্ণ।' হেমাঙ্গিনী নাকি মহানন্দের সন্তানলাভের পরে আর কখনও বারাকপুরে আসেননি। কিন্তু মহানন্দের জ্যেষ্ঠ সন্তান তাঁর বড়মার স্মৃতি একান্ত শ্রদ্ধায় লালন করতেন। নুটুবিহারীর স্ত্রী যমুনাকে একবার একখানা অতি প্রাচীন পোস্টকার্ড দিয়ে বলেছিলেন, 'এই চিঠিখানা যত্ন করে রেখে দিও বৌমা, বাবা বড়মাকে লিখেছিলেন।' (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ১৫, চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১ : ১১-১৯)।

বিভূতিজীবনের এই পূর্বকথা বিভূতিসাহিত্যে একাধিকবার ফিরে এসেছে। লক্ষণীয় যে জীবনের প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'তে আর শেষ উপন্যাস 'ইছামতী'তে এই পূর্বকথার অনুষঙ্গকে সবচেয়ে প্রত্যক্ষে পড়ে নেওয়া যায়। মহানন্দর কাশী যাওয়া, কাশীথেকে ফেরা, তাঁর কৈশোর যৌবনের টুকরো কাহিনী, এ সবের অনুষঙ্গে হরিহরের বেশ খানিকটা তৈরি হয়ে যায়। 'পথের পাঁচালী'তে হরিহর যখন তার প্রথমজীবনের স্মৃতি রোমন্থন করে, সেখানে বিভূতিজীবনের পূর্ব-কথার অর্থাৎ মহানন্দর জীবনকথার অনিবার্য ছায়া পড়ে। বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে আছে, 'আজ দাসী পিসিমার সঙ্গে গল্প করলুম। সেকালের অনেক কথা হল…গোলক চাটুয্যে ছিলেন বাবার মামাতো ভাই—পিসিমার মা ছিলেন ব্রজ চাটুয্যের পিসি। রাখালী পিসিমা ছিলেন চন্দ্র চাটুয্যের মেয়ে…শ্বশুরবাড়ি ছিল চৌবেড়ে। নিবারণ রাখালী পিসিমার ভাই, ভারি সুন্দর দেখতে ছিল—কলেরাতে মারা যায় আঠারো বছর বয়সে।' (তৃণাঙ্কুর, বি র ২ : ১৭৮)। 'তৃণাঙ্কুর' যদি সত্যিই লেখা শুরু হয়ে থাকে ১৯২৯-এর ১৯ জুন, তবে তো 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস তার আগেই লেখা হয়ে গেছে। যেখানে "বল্লালী-বালাই"

অংশে আছে ইন্দির ঠাকুরণের স্মৃতিরোমন্থন, 'নিবারণের কথা মনে হয়—নিবারণ, নিবারণ! ব্রজ কাকার ছেলে নিবারণ! ষোল বৎসরের বালক, কি টক্‌টকে গায়ের রং, কি চুল। ঐ যে চণ্ডীমণ্ডপের পোতা জঙ্গলে ঢাকা পড়িয়া আছে, বাঁশবনের মধ্যে—ওই ঘরে সে কঠিন জররোগে শয্যাগত হইয়া যায়-যায় হইয়াও দুই-তিন-দিন রহিল। আহা, বালক সর্বদা জল জল করিত, কিন্তু ইশান কবিরাজ জল দিতে বারণ করিয়াছিলেন—মৌরীর পুঁটুলি একটু করিয়া চুবানো হইতেছিল। নিবারণ চতুর্থদিন রাত্রে মারা গেল; মৃত্যুর একটু আগেও সেই জল জল তার মুখের বুলি—তবুও একবিন্দু জল তাহার মুখে ঠেকানো হয় নাই।' (বি র ১ : ১৩)।

তবে কি নিশ্চিত বলা যায়, যে বিধবা জ্ঞাতিবোন মেনকা মহানন্দর সংসারে থাকতেন, কেবল তাঁকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল ইন্দির ঠাকরুণ? নাকি ইন্দিরের নির্মাণে এসে জমা হল কত জানা-অজানা পিসিমার কত দুঃখ-সুখের কত খণ্ড খণ্ড আখ্যান? জীবনের সাহিত্য আর সাহিত্যের জীবন নিয়ে কোনো ঢালা ছক বানিয়ে তোলার অবকাশ কি পাঠক সত্যিই পান, যদি সেই সাহিত্যের নির্মাতা হন বিভূতিভূষণের মতো কোনো স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পী? এ বিষয়ে পাঠককে সতর্ক করতেও বিভূতিভূষণ ভোলেন না। যেমন, 'অপরাজিত'র শেষ ফর্মার প্রুফ দেখার দিন ডায়েরিতে তিনি লেখেন, 'অনেকে ভাবেন আমার জীবনের সঙ্গে বুঝি বই দুখানির খুব যোগ আছে—চরিত্রগুলি বোধহয় জীবন থেকে নেওয়া। অবশ্য কতকটা যে আমার জীবনের সংযোগ আছে ঘটনাগুলির সঙ্গে, এ বিষয়ে ভুল নেই—কিন্তু সে যোগ খুব ঘনিষ্ঠ নয়—ভাসা-ভাসা ধরনের। চরিত্রগুলি সবই কাল্পনিক। সর্বজয়ার একটা অস্পষ্ট ভিত্তি আছে—আমার মা। কিন্তু যারা আমার মাকে জানে, তারাই জানে সর্বজয়ার সবখানি আমার মা নন।' (তৃণাঙ্কুর, বি র ২ : ২০৭-৮)। ঠিক সেইরকমই, হরিহরের খানিকটা পড়া চলে মহানন্দের অনুষঙ্গে, পুরোটা আদৌ নয়। আবার বিভূতিভূষণের পিতার কৈশোর-যৌবন, তাঁর পিতা-মাতার সংসারজীবন, বারাকপুরের বাড়িতে সন্ন্যাসীর আগমন এবং ভবিষ্যৎ বলা যে সে গৃহে দিব্যাত্মা আসবেন, এসবই আখ্যান হিসেবে পাঠক পেয়েছেন 'পথের পাঁচালী'-'অপরাজিত'র পরবর্তীকালে। তার আগে বিভূতিজীবনের পূর্বকথা নিয়ে কোন্ বাঙালিরই বা মাথা ব্যথা ছিল? হয়ত ওইসব আখ্যানে গল্প আর গল্প-নয় এমন অবিচ্ছেদ্য গ্রন্থিতে বাঁধা আছে যে, তাদের একটিকে অন্য থেকে আলাদা করে নেওয়া আজ শতবর্ষের এপারে দাঁড়িয়ে প্রায় অসম্ভব। আর

বিভূতিভূষণই তো অন্য দিনলিপিতে লেখেন 'পথের পাঁচালী' প্রসঙ্গে, 'নভেলে… শৈশবকালের স্মৃতিরই পুনরাবৃত্তি করছি মাত্র—কারণ মনের অভিজ্ঞতা, জীবনের অভিজ্ঞতা ছাড়িয়ে কোনো লেখকই যেতে পারেন না—গেলেই সেটা কৃত্রিম, Tour de force হয়ে পড়বে।' (স্মৃতির রেখা, বি র ১ : ৪০৬)। আর 'ইছামতী'-তে তো বিভূতিভূষণ নিজের জন্মের পূর্বকথাকেই কাহিনীর অন্যতম অনুষঙ্গে জড়িয়ে নেন।

মহানন্দ-মৃণালিনীর পাঁচ ছেলেমেয়ে। বিভূতিভূষণের পরে ইন্দুভূষণ। তাঁর জন্ম ১৩০৪ বঙ্গাব্দের ১৮ ভাদ্র। তারপরে জাহ্নবী, জন্মেছিলেন ১৩০৫-এর ৬ চৈত্র। জাহ্নবীর পরে সরস্বতী, যার ডাকনাম মণি, জন্ম ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ১১ আশ্বিন। আর সর্বকনিষ্ঠ নুটবিহারীর জন্মতারিখ ৮ শ্রাবণ, ১৩১২ (সজনীকান্ত দাস, ফাল্গুন ১৩৫৭ ব : ৫১৯)। সংস্কৃতে বুৎপত্তি, সংগীত, কথকতা কিংবা কবিরাজি, কোনোকিছুর আশ্রয়েই মহানন্দর সংসার যে আদৌ অনায়াসে চলত না, তার অজস্র প্রমাণ আছে বিভূতিভূষণের দিনলিপি জুড়ে। যেমন, 'মনে হল বহুকাল আগে শৈশবে হবি ঠাকুরদাদা সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ির দরজা থেকে চাল চেয়ে না পেয়ে মলিন মুখে ফিরে গিয়েচেন…তারও আগে…মা…অতি শৈশবে ছোলা ও মুড়ি খেতে দিয়ে দিদিমার কাছে তিরস্কৃত হয়েছিলেন—তাঁর গুরু এসেছিলেন, তিনি যে আমাদের জন্য গুরুর পাতের মাছের ঝোল ও রুটি তুলে রেখে দিয়েছিলেন, মা তার খবর না জেনেই আমায় দিয়েছিলেন মুড়ি ও ছোলা ভাজা। —সেই ঘটনা থেকে মায়ের উপর এক অদ্ভুত স্নেহ ও বেদনাবোধ—তার পরে জাহ্নবীর আম-জরানো, পিসিমার শত দুঃখ, কামিনী পিসির কষ্ট…' (তৃণাঙ্কুর, বি র ২ : ১৯৫)। অথবা ১৯৫০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর, কল্যাণীর মামা নিরঞ্জন চক্রবর্তীর সুইনহো স্ট্রিটের বাড়িতে যখন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন-উৎসব হচ্ছে, বিভূতিভূষণ দিনলিপিতে লিখছেন, 'বাবার দশ টাকা দেওয়া মনে পড়লো। কতদিনের কথা—সেই খড়ের ঘরে জল পড়চে।' (অ. র. : ৩০১)। সেই ১৯৫০-এরই ২৩ জুলাই তারিখের দিনলিপিতে আছে, 'আজ কেষ্টনগরে সভা করতে গেলুম…কৃষ্ণনগরে গিয়ে বাবার কথা মনে হোল। সেই তাঁর মার বাড়িতে এসে আলুভাতে খাওয়া অনেক বেলায়। তাঁর ছেলেকে গলায় ফুলের মালা দিয়ে নিয়ে গেল লোকেরা। বাবা আজ কোথায়?' (অ. র. : ২৯০)।

১৯০৮-৯ সাল নাগাদ যে বিভূতিভূষণ বাবার সঙ্গে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর গিয়েছিলেন, সে উল্লেখ 'উর্মিমুখর' দিনলিপিতে আছে (বি র ৩ : ৫২৯)। আর

এই গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরেই 'পথের পাঁচালী'র হরিহর জীবিকার সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরছিল, তার একমাত্র কন্যার মৃত্যুর সমকালে। প্রথমে ভেবেছিল. জমিদারবাড়িতে অথবা উকিলবাড়িতে চণ্ডীপাঠ কি ভাগবতপাঠ জুটে যাবে। ব্যর্থ হয়ে গেল সে স্থানীয় হরিসভায়, যেখানে অভাবী ব্রাহ্মণ পথিকদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। রানাঘাটে এক বড়লোকবাড়ির বৈঠকখানায় হরিহরের মুখের উপরে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল ছোটমাপের মুদ্রা, ঠিক ভিখারির বিদায়ের ধরনে, যখন সে জানিয়েছিল, সে ব্রাহ্মণ, পাঠ-টাঠ করতে সক্ষম। গোপালনগরের কাছাকাছি কোথাও কথকতার আসর বসলে শিশু বিভূতিকে নিয়ে যেতেন মহানন্দ। হাতে সোনার বালা, গলায় ফুলের মালা পরা সেই শিশু হাততালি দিয়ে আবৃত্তি করত ছড়া, কবিতা। সকলের ভালো লাগত কচি গলার সেই বলা। বিভূতিভূষণের বয়স তখন তিন-চার হবে (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১ : ২৫)। বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে আছে, 'উমাচরণ মাঝি বল্লে ১৩০৩ সালের চৈত্র মাসে ওরা নৌকোর কারখানা করেছিল ঘাটের ধারের বাগানে—আমি তখন বাবার সঙ্গে সেখানে গিয়ে শ্লোক বলতুম ওদের কাছে।' (অ. দি. : ১১১)। ছেলের বয়স আর একটু বাড়লে, মহানন্দ তাকে দূরেও নিয়ে যেতেন কথকতার আসরে। 'উৎকর্ণ' দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ লিখেছেন, ১৯০৬ সালে তিস্তাব্রিজ পেরিয়ে বাবার সঙ্গে রংপুর যাওয়ার কথা (বি র ৪ : ২৯৬)। যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় আছে, 'মাঝে মাঝে বাবা কথকতা করতে বেরুলে তাঁর প্রিয় সন্তান "খোকা"কেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। বড়ঠাকুর বলতেন, "তখন কিন্তু বেশ খাওয়াদাওয়ার জুত হতো।" ' (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ১৬)।

যমুনাকে আরো বলেছিলেন বিভূতিভূষণ, 'আমাদের অবস্থা তো ভাল ছিল না, বাবা কথকতা করে যখন বাড়ি ফিরতেন, তখন প্রচুর টাকা, জিনিসপত্র নিয়ে আসতেন, এবং সেগুলি ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি বাড়ি থেকে বেরুতেন না, এমন ছিল তাঁর স্বভাব।...পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন...অর্থোপার্জনের প্রতি তত লক্ষ্য ছিল না, দিবারাত্রি অধ্যয়ন ও গান লিখে এবং গেয়ে কাটিয়ে দিতেন...বাবা তো ঘন ঘন তামাক সাজতেন, আর মাকে বলতেন, একটু চা করে দাও না। মা কিন্তু সহজে দিতেন না, বকতে শুরু করতেন...আহা, মা-ই বা কি করবে, বার বার চা তামাক খেলে ফুরিয়ে যাবে তো, আবার আসবে কোথা থেকে। আমাদের অবস্থা তো ভাল ছিল না বৌমা...আহা, এই সময় যদি আমার বাবা বেঁচে থাকতেন, তাহলে যত খুশী "তামাক" আর "চা" খেতে পারতেন, কেউ বকত

না।' (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ১৬)। যমুনা বিভূতিভূষণের ছোটভায়ের বউ হয়ে এসেছিলেন ১৯৩৮ সালে। এসব গল্প তিনি তার পরবর্তীকালে শুনেছেন। কিন্তু ১৯৩৮-এর একদশক আগেই 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে হরিহর কলকে হাতে রান্নাঘরের দাওয়ায় আগুন নিতে এলে, সর্বজয়া বলেছে 'ঘণ্টায় ঘণ্টায় তোমাকে আগুন দি কোথা থেকে? স্‌দবীকাঠের বন্দোবস্ত করে রেখেচো কিনা একেবারে! বাঁশের চেলার আগুন কতক্ষণ থাকে যে আবার ঘড়ি-ঘড়ি তামাক খাওয়ার আগুন যোগাবো?' বি র ১ : ৫৫)।

অসচ্ছল অবস্থার মধ্যেও প্রথম সন্তানের অন্নপ্রাশন অত্যন্ত ঘটা করে দিয়েছিলেন মহানন্দ সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করেছিলেন। সারা বারাকপুর গ্রাম ঘুরে ঘুরে পালকিতে টোপর পরা শিশু বিভূতিকে 'চলন' করা হয়েছিল, এমন গল্প বিভূতি-ভূষণের মৃত্যুর পরেও বারাকপুরের বহু বৃদ্ধের মুখে মুখে ফিরেছে। বিভূতিভূষণের বর্ণপরিচয় হয়েছিল পাঁচবছর বয়সের আগেই। রোজ একটি করে 'বর্ণপরিচয়' লাগত, এমনি শান্তশিষ্ট ছিলেন বিভূতি। তখন 'বর্ণপরিচয়' এক-একটা একপয়সা। মাসের প্রথমেই মহানন্দ গোপালনগরের হাট থেকে গোটা মাসের 'বর্ণপরিচয়' কিনে রাখতেন। রোজ সকালে বালক বিভূতি নতুন 'বর্ণপরিচয়' নিয়ে পড়া শুরু করতেন। দিনের শেষে সে বইয়ের চিহ্নও থাকত না, বাবাকে বলতেন 'বই ছিঁড়ে ফেলেছি বাবা।' পরদিন মহানন্দ নতুন 'বর্ণপরিচয়' দিতেন ছেলের হাতে। পাঁচ-বছর বয়সে বাবার কাছেই বিভূতিভূষণের হাতে-খড়ি হল। হাতে-খড়ির সঙ্গে সঙ্গেই নাকি সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পাঠ নিতে হত বিভূতিভূষণকে। মহানন্দ যখন বাড়িতে থাকতেন, রোজ নানান শ্লোক শেখাতেন বড়ছেলেকে। পয়ার, দীর্ঘপয়ার, ত্রিপদী, চৌপদীতে পদ্য লিখতেন মহানন্দ, সেসবও শেখাতেন বিভূতিকে। বাবার লেখা পদ্যও মুখস্থ করতে হত বালককে (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১ : ২০, ২৪)। 'ঊর্মিমুখর' দিনলিপিতে আছে ১৯৩৬ সালে বারাকপুর গ্রামে গ্রীষ্মের ছুটির একটি অপরাহ্ণের বর্ণনা, 'দুপুরের পরে একটু ঘুমিয়েচি, নির্জন মেঘমেদুর অপরাহ্ণ···বাবার একটা শ্লোকের খানিকটা মনে এল ঘুমের ঘোরে। এত স্পষ্ট মনে এল যেন বাবার সঙ্গে বসে আমি কবিতা আবৃত্তি করচি বাল্যদিনের মত। কথাটি এই—"নীচৈস্বভিরুচিঃ" এই টুকরোটুকু যেন উদ্ভটশ্লোকে ছেলেবেলায় পড়ে-ছিলুম।' (বি র ৩ : ৫২৭)। ১৯৩৩ সালের ৩ এপ্রিল, দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ লেখেন, 'কাল। রামনবমী। বাইরে বসে কথা ভাবছিলুম। সেই পাপিয়া ডাকত আমাদের দেশে। শুকনো বাঁশপাতার ওপর দুপুরে বাঁশবাগানে বেড়াতুম। কি

আনন্দ নিয়ে। কেননা কাল লুচির নেমন্তন্ন খেতে যাবো (বারাকপুরের বৃন্দাবন গোস্বামীদের বাড়িতে সম্ভবত রামনবমীর উৎসব হতো)। বাবার সেই ষোষা দোষাস্পদ ? ইত্যাদি। খাতাখানা এখনও আছে।' (অ. দি. : ৭৬)।

বিভূতিভূষণ প্রথম পাঠশালায় যান হুগলিতে, শা-গঞ্জ কেওটায়। সেখানে প্রথমে প্রসন্ন গুরুমশায়ের এবং পরে বিপিন মাস্টারের পাঠশালায় তিনি পড়েছিলেন। 'বিচিত্রা'য় যে 'পথের পাঁচালী' প্রথম বেরোয়, সেখানে অপুর পাঠশালা বদলের কাহিনী ছিল। কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় সে কাহিনী বাদ যায়। প্রসন্ন গুরুমশায়ের মুদি দোকান আর পাঠশালাই 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থে অপুর শৈশবের একমাত্র পাঠশালা। বিভূতিভূষণের বাল্যের কিছুটা সময় কেওটায় কেটেছে। মহানন্দ সেখানে অনেকদিন বাসা করেছিলেন। এসব বিভূতিভূষণের ছ-সাতবছর বয়সের আগেকার ঘটনা। বছর ছয়েক বয়সেই বিভূতিভূষণ বাবা-মার সঙ্গে বারাকপুর গ্রামে ফিরে আসেন। শা-গঞ্জ কেওটায় থাকাকালীন বিভূতিভূষণের পরের ভাই ইন্দুভূষণ হুপিং কাশিতে মারা যান। তখন এ রোগের কোনো চিকিৎসা ছিল না। রূপবান, সহিষ্ণু এই ভাইটির কথা বলতে বলতে প্রৌঢ় বয়সেও বিভূতিভূষণের গলা ভারি হয়ে আসত। ১৯০০ সালে কি ১৯০১ সালে বারাকপুর গ্রামে হরি রায়ের পাঠশালায় বিভূতিভূষণ পড়তে যেতেন। কবিশেখর কালিদাস রায়কে তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন যে এই হরি রায় আর কেওটার প্রসন্ন গুরুমশায়কে মিলিয়ে মিশিয়েই 'পথের পাঁচালী'র অপুর পাঠশালায় পড়ার গল্প তৈরি হয়েছে। যে হরি রায়ের পাঠশালায় বাল্যে পড়েছেন, তাঁরই বাড়ি ১৯৩৮ সালে বিভূতিভূষণ কিনেছিলেন। হরি রায়ের পাঠশালার পরে তুঁততলার স্কুল। (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১ : ২৬-৩০)।

'উর্মিমুখর' দিনলিপিতে ১৯৩৬ সালের গ্রীষ্মের ছুটির বর্ণনায় আছে, 'বিকেলে হাটে গেলাম। এবছর গ্রীষ্মের ছুটির প্রথম হাট। পথেই আফ্‌জলের সঙ্গে দেখা, সে হাটে পটল বেচতে যাচ্চে। তুঁততলার স্কুলের ভিটে দেখিয়ে বললে — দা-ঠাকুর এখেনে মোরা পড়িচি, কত আনন্দই করিচি এখেনে, মনে আছে ?...তুঁততলার স্কুলের কথায় হাঁড়ি-বেচা মাস্টারের কথা উঠল, আর কে কে আমাদের সঙ্গে পড়তো, সে কথাও উঠল।...গৌর কলুর দোকানে চা কিনতে গেলাম, সে আর আমায় কিছুতেই ছাড়তে চায় না। সেও আমার এক সহপাঠী, ওই তুঁততলার স্কুলে ১৩১০-১১ সালে তার সঙ্গেও পড়েচি।' (বি র ৩ : ৫২৮)। তুঁততলার স্কুলই সম্ভবত প্রাথমিক বিদ্যালয়, যেখানে প্রধানশিক্ষক গগনচন্দ্র পালের মুখে

বিভূতিভূষণ জীবনে প্রথম রবীন্দ্রনাথের কবিতা শোনেন। তাঁর "প্রথম দর্শন" লেখায় আছে, 'আমার বয়েস যখন আট কিংবা নয়, পাঠশালায় পড়ি আপার প্রাইমারি—তখন আমাদের হেড-মাস্টার গগনচন্দ্র পাল একদিন একখানা শিশুপাঠ্য বই থেকে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন···দাশু রায়ের পাঁচালি শুনেছি, কবি-জারি-গান শুনেছি, কাশীরাম দাসের মহাভারত নিজেও পড়েছি, গুরুজনদের মুখেও শুনেছি, কিন্তু এমন সুললিত কবিতা কখনও শুনিনি।···হেড-মাস্টারের মুখে শুনলাম কবিতার নাম "বঙ্গে শরৎ"—লেখকের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের নাম সেই প্রথম শুনলাম জীবনে···ওই নামটির চারিপাশে একটি মায়ালোক গড়ে উঠল আমার মনে সেই দিন থেকেই।' (বি র ১২ : ৩৫৪)। 'উর্মিমুখ'-এর আছে পাঠশালার আরো গল্প, যেমন 'হাটখোলার এক দোকানে এক মৌলবী সাহেব আমাদের ডাকাডাকি করলেন বলে গেলাম··তাঁর মুখে মধুবাবু সাব-ইনস্পেক্টরের গল্প শুনলাম। মধুবাবু আমাদের কালে, আমরা যে পাঠশালায় পড়তাম, সেখানে গিয়ে আমায় একবার "গ্রন্থ" বানান জিজ্ঞেস করেছিলেন। সে ১৯০৫ সালের কথা হবে।' (বি র ৩ : ৫৩৪)। সময়ের হিসাবে মনে হয়, এই ঘটনাও তুঁততলার স্কুলেই ঘটেছিল। এই তুঁততলার স্কুল বিভূতিসাহিত্যে "ভূত" গল্পটিতে স্বনামেই উপস্থিত হয়েছে। আর "রামতারণ চাটুজ্যে, অথর" কাহিনীতে তার নাম হয়েছে রাখাল মাস্টারের স্কুল। হাঁড়ির দোকানি হীরালাল চক্রবর্তী আর হাঁড়ি-বেচা মাস্টার নামকরণও বিভূতিভূষণের এসব সাহিত্যিক নির্মাণে মিলে যায়।

হরিহর কখনও অপুকে কলকাতা দেখায়নি, নিজেও হরিহর দেখেনি এই শহর। বিভূতিভূষণের পিতা মহানন্দ কিন্তু সপরিবারে কিছুদিন কলকাতায় বাস করেছিলেন। 'তৃণাঙ্কুরে' আছে, 'বাগবাজার ট্রামে আসবার সময়ে মনে ভাবছিলাম সাতাশ বছর আগে এই বর্ষাকালে···এই জায়গাটি দিয়ে ট্রামে করে যেতুম বাবার সঙ্গে' (বি. র. ২ : ১৮৪), অথবা 'সেদিন···ভগবতীপ্রসন্ন সেনের বাড়ি গিয়েছিলাম। ছেলেবেলাকার সে স্থানটি হয়তো আর কখনও দেখতুম না—কিন্তু আবার সেই "পরশুরামের মাতৃহত্যা" যাত্রাটি হয়েছিল, সেটি আবার দেখলাম—ঘরে বসে বাবার সঙ্গে নিমন্ত্রণ খেয়েছিলাম—ভগবতীবাবু যে রোগীকে ব্যবস্থা-পত্র দিয়েছিলেন কতকাল আগে আমার নয় বছরের শৈশবে—লেখো "রত্নগর্ভ" বলে, সেই কথাটি মনে পড়ল এতকাল পরে।' (বি র ২ : ২০২)। এই দিন-লিপি লেখা হচ্ছে বর্তমান শতকের তিনের দশকটির প্রথমদিকের বছরে, ১৯৩১

সালে। সময়ের হিসাবে মনে হয় তুঁততলার স্কুলে পডবার সময় বিভূতিভূষণ প্রথম কলকাতায় এসেছিলেন বাবার সঙ্গে। কলকাতার ট্রামে তিনি প্রথম চড়েছিলেন বাল্যে, পিতা মহানন্দর হাত ধরেই। দিনলিপিতে কাছাকাছি সময়েই লেখা হয়, 'সেদিনের সন্ধ্যায় নন্দরাম সেনের গলিতে যাওয়া, সেই চাউলের গুদাম—সেই শুভঙ্করী পাঠশালার সামনে আমার সহপাঠির বাডি মনে পডে।' (তৃণাঙ্কুর, বি র ২ : ১৬৮)। 'উৎকর্ণে' আছে, 'আজ বহুদিন পবে গিয়েছিলুম নন্দরাম সেনের গলিতে সেই প্রসন্নদেব বাডি। বাল্যে এখানে কিছুকাল কাটিয়েচি। আমার তরুণী মায়ের মুখেব শাঁখ যেন এই সন্ধ্যায় এ অঞ্চলে কোথায় আজও বাজচে। প্রসন্ন বসে অনেকক্ষণ গল্প কবলে। প্রসন্নের মা বাবা গিয়েছেন গত ফাল্গুন মাসে। সেই মাথম বুড়ী এখনও বেঁচে আছে।' (বি ব ৪ ৩৫৮)।

কলকাতায় এসে মহানন্দ প্রথমে ছিলেন মদনমোহনতলায় একটি মাঠকোঠার বাসায়। বিভূতিভূষণ তখন পডতেন বাগবাজাবের শুভঙ্কবী পাঠশালায। তাবপব মহানন্দ বাসা বদলে আবপুলি লেনের যে বাডিতে যান, সেই বাডিটি বহুদিন বাদে ১৯৪৭ সালে একবার বিভূতিভূষণ শ্যালক চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়কে দূব থেকে দেখিয়েছিলেন। বাপেব বাসাবদল হল মদনমোহনতলা থেকে আবপুলি লেনে। আর ছেলে এল বাগবাজারেব শুভঙ্করী ছেডে বৌবাজারের একটি পাঠশালায়। ১৯০৫ ৬ সালে শিয়ালদহ স্টেশন ভেঙে নতুন করে তৈবি হচ্ছিল। বিভূতিভূষণ পুরনো শিয়ালদহ স্টেশন দেখেছিলেন। আর বাবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে খুব ভালো করে দেখেছিলেন চিডিয়াখানা, জাদুঘব (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায, ১৯৯১ : ৩৩-৪)। 'ঊর্মিমুখব' দিনলিপিতে তিনেব দশকের মাঝামাঝি বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন, '··গাড়িতে গ্রে স্ট্রীট দিয়ে, স্ট্র্যাণ্ড রোড দিয়ে হাওড়া স্টেশনে। বসুমতীর সেই পুরোনো বাড়িটা, বাবার সঙ্গে যেখানে বাল্যে একদিন এসেছিলুম, সেটা সেই রকমই আছে। কুসুম বলে বাল্যে যে মেয়েটিকে জানতুম, এখন সে বুড়ী হয়েচে, ছেলেবেলায় আমায় তার ছেলের মত ভালবাসতো, সে থাকে কাছেই ওই বাড়িটাতে' (বি র ৩ : ৫৫০)। এই কুসুমকে নিয়েই চারের দশকের শেষে বিভূতিসাহিত্যে সংযোজিত হয়েছিল বিশিষ্ট ছোটগল্প "হিঙের কচুরী"। বিভূতিভূষণের বাল্যে মদনমোহনতলা অঞ্চলে কুসুমের মতো দেহোপজীবিনী মেয়েরা তাদের জীবিকার ভার, তাদের মানবিক গুণাগুণ নিয়ে আদৌ বিরল নয়। একই দিনলিপিতে আছে, '···নানা জায়গায় ঘুরে···কুসুমের সন্ধান করে তার ঠিকানা পেলুম···তেত্রিশ বছর পরে গিয়ে কুসুমের সঙ্গে দেখা করলুম।

আমার ন-বছর বয়সে কুসুম আমায় কত গল্প বলত। এখন তার বয়স ষাট-এর কম নয়—গরীব, লোকের বাড়ির ঝি। সে চেহারাই আর নেই। ওর সে চেহারা আমার মনে আছে। মানুষের চেহারার কি ভয়ানক পরিবর্তন হয়।' (বি র ৩ : ৫২৬-৭)।

শহর কলকাতায় মহানন্দ শাস্ত্রীর রুজির কোনো সুরাহা হয়নি। সংসারের চাহিদা যেমন বাড়ে, সে অনুপাতে আয় বাড়ে না। মহানন্দের ছেলেমেয়েদের শরীরও এ শহরে তেমন ভালো থাকে না! শিশুর অনাহত দৃষ্টি আর কৌতূহল নিয়ে কলকাতা দেখেনি বিভূতিসাহিত্যের বালক অপু। কিন্তু 'অপরাজিত'র পাঠক জানেন, জনসমুদ্রের আলোকিত শিয়ালদহ স্টেশন, বড়ো রাস্তায় গাড়িতে গাড়িতে একেবারে অচেনা এক জগৎ, জাদুঘরের সম্ভার, সবই অপু দেখিয়েছিল তার বালকপুত্র কাজলকে। আগেই বলেছি, জীবনের সাহিত্য আর সাহিত্যের জীবনের অন্তর্বর্তী সেতুটাকে ভাঙার কাজ বিভূতিসাহিত্যের পাঠকের পক্ষে কখনোই তেমন সহজ হয় না। কখন যে বিভূতিভূষণ অপু হয়ে যান, কখন যে অপু মহানন্দ হয়ে বালকপুত্র কাজলকে কলকাতা চেনায়, কখন যে কাজল বালক বিভূতির মতো অপার বিস্ময়ে কলকাতা দেখে, তার কোনো নিশ্চিত ভেদরেখা পাঠকের আয়ত্তাতীত। শেষপর্যন্ত অপূর্বকুমারের স্রষ্টা 'ইছামতী'তে পৌঁছিয়ে, ইছামতী নদীর তীরের ওই গ্রামে শাস্ত্রজ্ঞ ভবানীচরণের বিশিষ্টতায়, নানান তীর্থযাত্রায় অভিজ্ঞ ভবানীচরণের অনন্যতায়, সুবিশাল উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্রকে খুঁজতে থাকেন। তবে কি বিভূতিভূষণ অপূর্বকুমার রায়ের অগ্রগতির সঞ্চয়-অপচয় নিয়ে মহানন্দের দুয়ারেই ফিরতে চাইছিলেন? ভবানীচরণে বিভূতিভূষণকে আবিষ্কার করা তো সমালোচক-বিশেষজ্ঞদের বহুদিনের অভ্যাস! কে বলতে পারে, হয়ত বনগ্রামহাইস্কুল, রিপনকলেজ, ইমপিরিয়াল লাইব্রেরির বিভূতিভূষণ, বাংলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ সেই সংস্কৃতের, কথকতার, কবিরাজির মহানন্দ শাস্ত্রীকে, এনট্রান্স ফেল সেই মহানন্দকে নিজের মধ্যে আবিষ্কার করতে স্বস্তি পেতেন, প্রৌঢ়ত্বের মাঝপথে দাঁড়িয়ে! মহানন্দ কলকাতা থেকে আবার ফিরে গিয়েছিলেন বারাকপুর গ্রামে। কলকাতা ছাড়বার পরে প্রথমে অবশ্য স্ত্রী এবং পুত্রকন্যাদের মুরাতিপুরে রেখে জীবিকার খোঁজে পথে বেরোলেন।

মুরাতিপুরের কুখ্যাত ম্যালেরিয়া ধরল মহানন্দর বড়োছেলেকে। একটু সুস্থ হওয়ার পরে সেই ছেলেকে বারাকপুর গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটা

মহানন্দর পক্ষে সহজ হয়নি। গোপালনগর স্টেশনে জ্বরে অচৈতন্য বিভূতিকে প্ল্যাটফর্মে জারুল কাঠের সিন্দুকের উপরে শুইয়ে রেখে মহানন্দ গিয়েছিলেন গোরুর গাড়ির খোঁজে। এইসময়, জ্বরের ঘোরে বিভূতিভূষণ নাকি দেখেছিলেন, স্টেশন-মাস্টারের পাশের ঘরে রেলের কোন্ এক পদস্থ কর্মচারী সাহেব খেতে বসেছেন ছুরি-কাঁটা হাতে। আস্ত মুরগির রোস্ট, মুলোসিদ্ধ, কাঁচা পেয়াজ, কাঁচা কপির পাতা—এমন সব আহায। কাচের জানলার শার্সি দিয়ে সাহেবের খাওয়া দেখেছিল বালক বিভূতি। (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায, ১৯৯১ : ৩৪-৫)। তখন পরম দূরদর্শী কোনো বাঙালি পাঠকও জানতেন না যে চারের দশকের গোড়ায় বাংলাসাহিত্যে সংযোজিত হবে 'অনুবর্তন'-এর মতো উপন্যাস, যে উপন্যাসে ট্যাংরা মাছের ঝাল অথবা মাছের মাথা দিযে রাঁধা কচুর শাকের ভক্ত এক অ্যাংলোসাহেব হেনরি ক্লিফোর্ড ক্লারিজ (রুশতী সেন, ১৯৯৩ : ৬৬) বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক কল্পনায হয়ে উঠবেন প্রতাপী ক্লার্কওয়েলসাহেব, আর তার আহারের বিন্যাসে থাকবে বিভূতির কোন্ শৈশবকালে দেখা গোপাল-নগর প্ল্যাটফর্মের সেই সাহেব কর্মচারীব সাহেবি খানার বর্ণনা। বারাকপুর গ্রামে ফিরেও বিভূতিভূষণের শরীর সারতে সময লেগেছিল। আবাব বিভূতিভূষণ ভর্তি হলেন তুঁততলার স্কুলে। ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ৫ ফাল্গুন, অর্থাৎ ১৯০৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি মহানন্দ জ্যেষ্ঠপুত্রের উপনয়ন দিলেন, আবারও সাধ্যাতিরিক্ত খরচ করে। (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায, ১৯৯১ : ২১)।

হরি রায়ের পাঠশালায় পডবার সময় বন্ধু ছিল যারা, সেই নেড়া, কালী, ভরতদের সঙ্গে বিভূতিব সম্পর্ক তখনও অমলিন। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ একদিন শেষ হয়ে যায়। বিভূতির ইচ্ছে, সে আরও পড়বে, ইংরেজি শিখবে। বনগ্রামে বড়ো স্কুল আছে। সেখানে পড়তে গেছে বিভূতির বন্ধু সুরেন। এই সুরেনই পরবর্তী কালে যশোর খুলনার বিখ্যাত চিকিৎসক ক্যাপ্টেন সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। কল্যাণীর সন্তান সম্ভাবনার সময় ইনিই চিকিৎসা করেছিলেন। সুরেনের বাবা গিরীন ডাক্তার ছিলেন মহানন্দর বন্ধু, বয়স হয়ত মহানন্দর থেকে কিছু কম। গিরীন নাকি উত্তরপ্রদেশের কোন্ মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র ছিলেন। একই সময় মহানন্দ এবং গিরীন কাশীতে থাকতেন। কাশী থেকেই গিরীন নেপালে যান, কাঠমণ্ডুতে রাজচিকিৎসকের পদ লাভ করেন। বিভূতিসাহিত্যের পাঠক বুঝবেন, তিনের দশকে "ডানপিটে" কাহিনীটির উৎস কোন্ সঞ্চয় থেকে বিভূতিভূষণের মনে এসেছিল। কিন্তু সুরেন যত বন্ধুই হোক বিভূতির, সামাজিক-

অর্থনৈতিক অবস্থানে তারা যে অনেকখানি পৃথক। সুরেনদের পরিবার বারাকপুর গ্রামের ধনী পরিবার। তাদের বাড়িতে বিদেশী চিত্রকরের আঁকা ছবি আছে, আছে আর এক বিস্ময়; বারাকপুর গ্রামের প্রথম সাইকেল—কলকাতা থেকে আনা। কৈশোরের প্রথম প্রান্তে দাঁড়িয়ে বিভূতি সেই সাইকেলের গায়ে হাত বুলোয়, মুগ্ধ হয়ে শোনে বনগ্রামের ইংরেজি স্কুলের গল্প। তার বাড়িতে ছোট ভাইবোনেরা নিত্য অসুখে ভোগে, বর্ষার দিনে ঘরের চাল দিয়ে জল পড়ে, রুজির খোঁজে বাবা তার কোথায় ঘুরছেন, অনেকসময়েই তার কোনো হদিস থাকে না। (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১ : ৪৩-৫)।

বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে দেখা যায়, মহানন্দ কখনও মুড়াগাছার কাছে ধর্ম্মদহ গ্রামে কথকতা করেন, আবার তাঁকে দেখা যায় যশোরের সারসা থানার অন্তর্গত বাঁকি করিমালীতে, কখনও বা শহর কলকাতায় (উৎকর্ণ, বির ৪ : ৩০৬, ৩৯৬ ; অ. দি. : ৭৯)। মৃণালিনীর নামে যৎসামান্য টাকার মনিঅর্ডার আসে, তাও অনিয়মিত। পাঠশালার পড়া শেষ করে মহানন্দর বড়ো ছেলে তখন বাড়িতে বসা—ইংরেজি স্কুলে কেমন করে পড়বে সে? অথচ মহানন্দ পণ্ডিত মানুষ, তাঁর বাড়িতে বইয়ের সংগ্রহ আছে, অন্তত তেমন সংগ্রহ যা মহানন্দ শাস্ত্রীর পাণ্ডিত্যের এবং সাধ্যের অন্তর্গত। বিভূতিভূষণের তখন পড়া হয়ে গেছে 'সর্বদর্শন-সংগ্রহ', যে বইয়ের কয়েকটি পৃষ্ঠা আজও বিভূতিভূষণের পুত্র তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগ্রহে আছে। মহানন্দের বাড়িতে ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত 'চরিতমালা', যে বইতে লেখা 'গ্রন্থকার কর্তৃক প্রদত্ত হইল'। বিদ্যাসাগরের হস্তাক্ষর সম্বলিত সেই 'চরিতমালা' বিভূতিভূষণ সাগ্রহে অনেককে দেখিয়েছেন। চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় আছে মহানন্দকে বিদ্যাসাগরের উপহার দেওয়া সেই বইটি দেখার অভিজ্ঞতার কথা (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১ : ৪২)। এই 'চরিতমালা' পড়তে পড়তেই তো 'পথের পাঁচালী'র অপু নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে বসে ভাবত 'বইখানিতে যাঁহাদের গল্প আছে সে ঐ রকম হইতে চায়! হাটে আলু বেচিতে পাঠাইলে কৃষকপুত্র রস্কো বেড়ার ধারে বসিয়া বসিয়া বীজগণিতের চর্চা করিত, কাগজের অভাবে চামড়ার পাতে ভোঁতা আল দিয়া অঙ্ক কষিত, মেষ-পালক ডুবাল ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল মেষদলকে যদৃচ্ছ বিচরণের সুযোগ দিয়া একমনে গাছতলায় বসিয়া ভূচিত্র পাঠে মগ্ন থাকিত—সে ঐ রকম হইতে চায়।…"বীজ-গণিত" কি জিনিস? সে বীজগণিত পড়িতে চায় রস্কোর মত। সে এই হাতের লেখা লিখিতে চায় না, ধারাপাত কি শুভঙ্করী এসব তাহার ভাল লাগে না। ঐ

রকম নির্জন গাছতলায়, বনের ছায়ায়, কি বেড়ার ধারে বসিয়া বসিয়া সে "ভূচিত্র" (জিনিসটা কি?) পাতিয়া পড়িবে, পণ্ডিত হইবে ঐ রকম। কিন্তু কোথায় পাইবে সেসব জিনিস? কোথায় বা "ভূচিত্র", কোথায় বা "বীজগণিত" কোথায়ই বা লাটিন ব্যাকরণ? এখানে শুধুই কড়ি কষার আর্যা আর তৃতীয় নামতা?··· যাহা সে পড়িতে চায়, তাহা এখানে কই?' (বি র ১ : ১৪১-২)।

নতুন পথ

১৯০৮ সালের এক বর্ষার সকালে কথকপুত্র বিভূতি মায়ের লক্ষ্মীর ঝাঁপি শূন্য করে ক'টি মাত্র টাকা আর যৎসামান্য জলখাবারের জন্য দুটি পয়সা নিয়ে বারাকপুর গ্রাম থেকে বনগ্রাম হাইস্কুলের পথে যাত্রা করল। একাকী পথযাত্রার অভ্যাস আজকের নয়। আড়াই-তিন বছরের বিভূতিই তো মা-পিসিমাকে কাঁদিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল, একাকী নিরুদ্দেশ যাত্রায় পৌঁছে গিয়েছিল বনের ধার পর্যন্ত, কিন্তু নিজে কাঁদেনি এক ফোঁটা, সে তো আজকের কথা নয় (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১ : ২৩)। সেদিনের অনাহত নিশ্চিতি আজ কোথায় পাবে ইংরেজি স্কুলের কাঙাল বিভূতিভূষণ? হারিয়ে যাওয়া সেই শিশুকে ফিরিয়ে এনেছিল হাজারি জেলেনি কোলে করে। 'অপরাজিত' উপন্যাসে অপু যখন দেওয়ানপুরের বড়ো স্কুলে পড়ে, তখন মনসাপোতায় একাকী সর্বজয়ার দৈনন্দিন জুড়ে থাকত অপুর শৈশবের কত স্মৃতি, অপুর বয়স যখন তিন বৎসর, তখন সে একবার হারাইয়া যায়···পাড়ায় কাহারও বাড়িতে নাই, পিছনের বাঁশবনেও নাই—চারিধারে খুঁজিয়া কোথাও অপুকে পাইল না। সর্বজয়া কাঁদিয়া আকুল হইল—কিন্তু যখন হরিহর বাড়ির পাশের বাঁশতলার ডোবাটা খুঁজিবার জন্য ও-পাড়া হইতে জেলেদের ডাকিয়া আনিল, তখন তাহার আর কান্নাকাটি রহিল না···কেমন কাঠের মত হইয়া ডোবার পাড়ে দাঁড়াইয়া জেলেদের জাল-ফেলা দেখিতে লাগিল···ইহারা সকলে মিলিয়া তাহার বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে কি একটা ষড়যন্ত্র আঁটিয়াছে···সেই সময়ে দুর্গা অপুকে খুঁজিয়া আনিয়া হাজির করিল। অপু নাকি নদীর ধারের পথ দিয়া হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া একা একা সোনাডাঙার মাঠের দিকে যাইতে ছিল··· তাহার পর ফিরিতে গিয়া বোধহয় পথ চিনিতে পারে নাই। বাড়ির কাঁঠাল-তলায় বসিয়া খেলা করিতে করিতে কখন কোন্ ফাঁকে বাহির হইয়া গিয়াছে···সর্বজয়া স্বামীকে বলিল—এ ছেলে কোনদিন সংসারী হবে না, দেখে নিও···তিন বছর বয়সে অন্য ছেলে বাড়ির বাইরে পা দেয় না, আর ও কিনা গাঁ ছেড়ে বাঁশবন, মাঠ

ভেঙ্গে গিয়েছে সেই সোনাডাঙার মাঠের রাস্তায়। তাও ফেরার নাম নেই—হন্ হন্ করে হেঁটেই চলেছে—কখ্খনো সংসারে মন দেবে না···এ আমার কপালেই লেখা আছে!' (বি র ২ : ৪৮-৯)।

১৯০৮ সালে বিভূতিভূষণ যে অভীষ্টের স্বপ্ন নিয়ে বনগামের পথে পা বাড়াল, তার সিদ্ধিলাভে হাজারি জেলেনির কোলের উষ্ণতা অথবা অপুর দিদি দুর্গার মরিয়া হয়ে খুঁজে ফেরা কি কোনো কাজে লাগে? 'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ লিখেছেন, '···বনগাঁ স্কুলের ফটকে ঠেস দেওয়ানো বেঞ্চিটার ওপর গিয়ে বসলাম ·চব্বিশ বছর আগে একজন বারো বছরের ক্ষুদ্র বালক একা বাড়ি থেকে ভর্তি হতে এসে ওই জায়গাটাতে লাজুকভাবে চুপ করে বসে ছিল···বর্ষায় জলা ও আষাঢ়-শ্রাবণের আউশ ধানের ক্ষেত ভেঙে এক-গা কাদা মেখে চাদর গায়ে, মায়ের কাছ থেকে ভর্তি হওয়ার সামান্য টাকা ও দুটি পয়সা জলখাবারের জন্য বেঁধে এনে লাজুক মুখে চুপ করে ওই স্কুলের পৈঠার উপর বসে আছে এমন মুখচোরা যে, কাউকে বলতে পারচে না ভর্তি কোন ঘরে হয়, বা কাকে বলতে হবে?' (বি র ২ : ২১৪)। বনগ্রাম হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক তখন চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'কুশদ্বীপের ইতিহাস' বইটির রচয়িতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উৎসাহী কর্মী। 'যশোর খুলনার ইতিহাস' লেখার কাজে বহু তথ্যের জোগান দিয়ে সতীশচন্দ্র মিত্রকে সাহায্য করেছিলেন চারুচন্দ্র। ছাত্রবৎসল এই প্রধানশিক্ষকের স্মৃতিতেই বিভূতিভূষণ ১৯৪১ সালে তাঁর 'বিপিনের সংসার' উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন। ১৯০৮ সালের অনেকখানি তখন পেরিয়ে গেছে নতুনবছরের ক্লাস শুরু হওয়ার পরে। চারুচন্দ্র একদিন দেখলেন, একটি ছোট ছেলে স্কুল কম্পাউণ্ডে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। সেদিনের আগে আরও দু-দিন ঘুরে গেছে ছেলেটি, কিন্তু প্রধানশিক্ষকের নজরে আসেনি। প্রথমদিন বালক সাহস করেনি স্কুল কম্পাউণ্ডে ঢুকতে, আর দ্বিতীয় দিন ঢুকে দাঁড়িয়েছিল ইঁদারার কাছে।

তৃতীয় দিন প্রধানশিক্ষকের চোখে পড়ল যখন, দপ্তরিকে দিয়ে তাকে ডাকিয়ে আনলেন ঘরে। বালকের প্রার্থনা শুনে আর লক্ষ্মীর ঝাঁপির সিঁদুর-মাখানো টাকা কটি দেখে চারুচন্দ্র বিধান দিলেন, ছেলেটি ভরতি তো হবেই, তার কোনো বেতনও লাগবে না। প্রবেশিকা পর্যন্ত প্রতি ক্লাসে যদি সে প্রতি বছর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তবে বনগ্রাম উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পর্যন্ত সে বিনা বেতনেই লেখাপড়া করতে পারবে। ১৯০৮ সালের ৫ আগস্ট। সিক্সথ্ ক্লাসে অর্থাৎ কিনা এখনকার পঞ্চম শ্রেণীতে তখন পড়াচ্ছিলেন রাশভারি সহ-প্রধানশিক্ষক হরিচরণবাবু; পরনে

সাহেবি পোশাক, মুখে অনর্গল ইংরেজি ; তাঁর স্বভাব, পড়ানোর সময় শ্রেণীকক্ষে অবিরাম পদচারণা করা। হরিচরণবাবুর ক্লাস চলাকালীনই এক গ্রাম্য বালক নিতান্ত সংকোচের সঙ্গে পঞ্চম শ্রেণীর ঘরে এসে ঢুকল, বসল একটি খালি জায়গা দেখে। বছরের প্রথম থেকে তো বেশ কয়েকমাস কেটে গেছে ! তার আগে গ্রামের পাঠশালার দিন সাঙ্গ করে বিভূতিকে বাড়িতে থাকতে হয়েছে কিছুকাল। মূলত অর্থাভাবের কারণেই বনগ্রামের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে পৌঁছতে খানিকটা বিলম্ব ঘটে গেছে বিভূতির। জানে না বিভূতি 'টেক ডাউন' কথাটির বাংলা অর্থ। অথচ তার ক্লাসের অন্য ছেলেদের তো ওটা চেনা কথা। এই অর্থ যার কাছে সেদিন জেনে নিয়েছিল সদ্য আগত সিক্সথ ক্লাসের ছাত্রটি, সেও আর এক বিভূতি, বিভূতি মুখোপাধ্যায় বাড়ি চাল্‌কী গ্রামে। কীরকম সম্পর্কে বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের কাকা হয় সুরেন বারাকপুরের বিভূতির বন্ধু সেই সুরেন। সুরেনকাকার কাছে আগেই জেনেছে চাল্‌কীর বিভূতি যে, বারাকপুরের এক বিভূতি আসছে বনগ্রাম উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে, বড়ো ভালো ছেলে নাকি সেই বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন থেকে দুই বিভূতি হলেন একে অপরের মিতে। এ সম্পর্কের প্রসাদ কোনোদিন ম্লান হয়নি। (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় ১৯৯১ : ৪৫-৬, ৫০-১)।

কতদিন পরে, বারাকপুরের বিভূতি যখন বাংলার স্বনামধন্য সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তখনও তিনি 'অক্রুর-সংবাদ' বইয়ের লেখক (তবে 'নীলাঙ্গুরীয়'-'বরযাত্রী'-খ্যাত নয়) বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে অর্থাৎ ১৯০৮ সালের সেই চাল্‌কীর বিভূতিকে এরকম চিঠি লিখতেন : মিতে, আগামী কল্য স্কুল করেই আমি কলিকাতা যাইতেছি—৪টার ট্রেণে। শুক্রবার বেলা ১২টার সময়ে গজেন মিত্রের দোকানে দেখা পাইবে।...আপাততঃ যখন মিতেনি যাইতেছে না, তখন তুমি আমার ওখানে থাকিবে। ইহাতে কোনো অসুবিধা নাই। পরে যেমন হয় বিবেচনা করা যাইবে।...ঘাটশিলাতে গিয়া বেশি অর্থচিন্তা ত্যাগ কর। সাহিত্য-সাধনা ও ভগবচ্চিন্তা করাই কর্তব্য। Bricks লইয়া সন্তুষ্ট থাকো। এই আমার পরামর্শ। মিতে' (অপ্রকাশিত)। চিঠিটিতে কোনো তারিখ নেই, একটুখানি টুকরো কাগজের উপরে লেখা। নিশ্চিতভাবেই ধরা যায়, এ চিঠি লেখা হয়েছিল, বিভূতিভূষণ গোপালনগরের হরিপদ ইনষ্টিটিউশনে কাজ নেওয়ার এবং পাকাপাকিভাবে বারাকপুরে থাকতে শুরু করবার পরে। ১৯০৮ সালের পরে তখন তিন দশকেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে।

বনগ্রাম হাইস্কুলে পড়বার সময় বারাকপুর গ্রাম থেকে বনগ্রামের পথটা

বিভূতিভূষণ পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করতেন। দু-একজন সঙ্গী থাকত সেই পথে। যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গল্প করেছিলেন বিভূতিভূষণ, 'পথ হাঁটতে বিশেষ কষ্ট হতো না, পথের পাশে নানারকম গাছপালা, পাখির কলকাকলী, এইসব এটা-ওটা দেখতে দেখতে পথ চলার কোন কষ্ট বোধ করতাম না ; কিন্তু তখন ছোট ছিলাম তো, ফেরার সময় বড্ড খিদে পেতো, কিন্তু পয়সা তো থাকত না যে কিনে কিছু খাবো। মা উড়ুনির খুঁটে মুড়ি-মুড়কী বেঁধে দিতেন, তাই খেতে খেতে আসতাম, পাছে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায় তাই আস্তে আস্তে খেতাম।' (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ১৫-৬)। মনসাপোতা থেকে আড়বোয়ালের স্কুল, এই দুই ক্রোশ পথে অপুর অভিজ্ঞতা তো 'অপরাজিত'র পাঠকের অজানা নয়—'দুধারে বট, তুঁতের ছায়া, ঝোপঝাপ মাঠ, মাঝে মাঝে অনেকখানি ফাঁকা আকাশ···বৈকালের ছায়ায় ঢ্যাঙা তাল-খেজুরগাছগুলা যেন দিগন্তের আকাশ ছুঁইতে চাহিতেছে – পিড়িং পিড়িং পাখির ডাক—হু হু মাঠের হাওয়ায় পাকা ফসলের গন্ধ আনিতেছে···কত ধরণের লোকের সঙ্গে পথে দেখা হইত···প্রায়ই চাষালোক, হাতে হুঁকোকল্কে। অপু জিজ্ঞাসা করে – কোথায় যাচ্ছ, হ্যাঁ কাকা ? চলো আমি মনসাপোতা পর্যন্ত তোমার সঙ্গে যাবো। মামজোয়ান গিইছিলে ? তোমাদের বাড়ি বুঁঝি ? না ? শিকুড়ে ? নাম শুনেচি, কোন্‌দিকে জানিনে। কি খেয়ে সকালে বেরিয়েচ, হ্যাঁ কাকা ?' এই পথেই অপু শুনেছিল, কোন্ গ্রামের পরমাসুন্দরী ব্রাহ্মণবউ বাগ্‌দির সঙ্গে কুলত্যাগ করে আজ নাকি চরম দুরবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। দেখেছিল অপু, তীরধনুক হাতে এক সাঁওতালকে, পথের ধারে কাঁধের ভার নামিয়ে রেখে, আগুনে পাখি আর আলু ঝলসে খাচ্ছে (বি র ২ : ১৮-২২)।

প্রধানশিক্ষক চারুচন্দ্রের শর্ত বিভূতিভূষণ পূরণ করেন। বনগ্রাম হাইস্কুলের প্রথম বছরের পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিল বারাকপুরের বিভূতি। সে সময় স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন বনগ্রাম 'লিচুতলা ক্লাব'-এর প্রতিষ্ঠাতা কবি মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১৯০৮ সালে ওই স্কুল থেকেই তিনি এনট্রান্স পাস করেন। ১৯১২ পর্যন্ত স্কুলে পড়িয়েছিলেন মন্মথনাথ। ১৯১২-র শেষদিকে তিনি আইন পাস করেন এবং পরের বছর আদালতে আইন-ব্যবসা শুরু করেন (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১ : ৫৩)। 'অপরাজিত' উপন্যাসে দেওয়ানপুর স্কুলের শিক্ষক সত্যেনবাবু খুশি হয়েছিলেন, অপু ভিক্টর হ্যুগোর পরিচয় বলতে পারায় ; নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে জলখাবার খাইয়েছিলেন। সত্যেনবাবু আইন পাস করে দেওয়ানপুর স্কুল ছেড়ে চলে যান, অপু তখন থার্ড ক্লাসের ছাত্র। বহুদিন বাদে, অপর্ণাকে যখন

মনসাপোতায় নিয়ে আসছে অপু, কোন্ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দেখা হয় অপু আর সত্যেনবাবুর; 'পুরাতন ছাত্রকে দেখিয়া খুশী হইলেন, অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন, অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে কে কি করিতেছে শুনিবার আগ্রহ দেখাইলেন ···আজকাল পাটনা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন, চালচলন দেখিয়া অপুর মনে হইল—বেশ দু'পয়সা উপার্জন করেন। তবুও বলিলেন, পুরানো দিনই ছিল ভাল·· ট্রেণ আসিলে তিনি সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিলেন।' (অপরাজিত, বি র ২ : ৩১-২ ; বি র ৩ : ৯)। মন্মথনাথের সঙ্গে অবশ্য বিভূতিভূষণের সংলগ্নতা অনেক বেশি। মন্মথনাথ তাঁর বাল্যে শিশু বিভূতিকে কথকতার দু'একটি আসরে আবৃত্তি করতে দেখেছেন। এই মন্মথনাথের আগ্রহেই বনগ্রাম হাইস্কুলের ছাত্র বিভূতি সদ্য প্রকাশিত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা পড়বার সুযোগ পেত। আবার এই মন্মথ-মোক্তারের বৈঠকখানায় বসেই বিভূতিভূষণ ১৯৩৮ সালে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদ প্রথম পেয়েছিলেন শরৎচন্দ্রকে বিভূতিভূষণ প্রথম চিনেছিলেন মন্মথনাথের আনুকূল্যে পাওয়া 'ভারতবর্ষ'র পাতায়। বিভূতিভূষণ যখন বনগ্রাম হাইস্কুলের ছাত্র, তখন স্কুল ইনস্পেক্টর ছিলেন প্রিয়নাথ ব্রহ্মচারী। ' চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১ : ২৫, ৩৩)। তিনি সত্যিই স্কুল পরিদর্শনে এসে স্লেজ অথবা অরোরা বোরিয়ালিসের অর্থ বিভূতিভূষণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কিনা, তা নিয়ে সংশয় থাকতে পারে ; কিন্তু দেওয়ানপুর স্কুলে অপূর্ব এসব প্রশ্নের উত্তর ঠিকই দিয়েছিল প্রশ্নকর্তাকে।

বারাকপুর গ্রাম থেকে বনগ্রাম হাইস্কুল কিছুকাল হেঁটে যাতায়াত করবার পরে বিভূতিভূষণ স্কুল-বোর্ডিং-এ চলে যান। তাঁর দিনলিপি অনুসরণ করলে মনে হয়, ১৯০৮ সালেই তিনি বোর্ডিং-এ চলে যান। ১৯২৭ সালের ৯ ডিসেম্বর ভাগলপুর জঙ্গলমহালে কাজ করবার সময় বড়বাসায় বসে তিনি লিখেছেন, ' অনেককাল আগে সেই ১৯০৮ সালে, এক সন্ধ্যায় বেহারী ঘোষের বাড়ী মাণিকের গান হল – পরদিন জিনিসপত্র নিয়ে সেই যে বোর্ডিংএ এলাম – কি ক্ষণে বাড়ীর বাইরে পা দিয়েছিলাম জানি না – সেই বিদেশবাস শুরু হল। পরে আর বারাকপুরকে বারোমাসের জন্য একবারও পায়নি – হারিয়ে হারিয়ে পেয়ে আসছি – কত জগদ্ধাত্রী পুজার ছুটিতে, গুডফ্রাইডের ছুটিতে, বড়দিনে, পুজায় —শনিবার পেয়ে এসেছি ছেলেবেলায় — এখনও অন্যভাবে পাই।' (স্মৃতির রেখা, বি র ১ : ৩৮৯)। মাণিক পীরের গান বিভূতিভূষণ কোনোদিন ভোলেননি। ১৯৪১ সালে বনগ্রামের বীণাপাণি ভবনে, নাবালক শ্যালক-

শ্যালিকাদের সে গান শুনিয়ে তিনি হাসাতেন (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১ : ৫৬)। একটিই প্রশ্ন থাকে। ১৯০৮ সালের অগাস্টের শুরুতে বিভূতিভূষণ যদি বনগ্রাম হাইস্কুলে ভরতি হয়ে থাকেন, তার দু-আড়াই মাসের মধ্যেই তো পুজোর ছুটি ; আর তারপরে বার্ষিক পরীক্ষা হয়ে স্কুল কিছুটা অনিয়মিত হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। আবার তা জোরকদমে নিয়মিত শুরু হওয়ার কথা পরের বছর জানুয়ারিতে, নতুন ক্লাসে। ১৯০৮-এই যদি বোর্ডিং-এ চলে যান বিভূতিভূষণ, তবে যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বলা তাঁর বারাকপুর-বনগ্রাম হাঁটাপথের বর্ণনা ক'দিনের সত্যি ? তা যদি কেবল সপ্তাহান্তে বাড়ি ফেরার সত্যি হয়, তবে তো উড়ুনিতে মায়ের দেওয়া মুড়ি ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়ে আস্তে আস্তে খাওয়ার ব্যঞ্জনা আর সত্যি থাকে না। তবে কি অপুর মনসাপোতা আড়বোয়াল হাঁটাপথের অভিজ্ঞতা সাহিত্য থেকে জীবনে গ্রথিত করে ফেলেছিলেন বিভূতিভূষণ, যখন 'বউমা'র কাছে বলেছিলেন নিজের ছোটবেলার গল্প ? নাকি 'স্মৃতির রেখা'র ১৯০৮ তারিখটিতেই কোনো গরমিল আছে ? অথবা হতে পারে, একমাস, কি তার কিছু বেশি-কম সময় ধরে বারাকপুর থেকে বনগ্রাম আর বনগ্রাম থেকে বারাকপুর নিত্য যাতায়াতের স্বল্পকালীন অভিজ্ঞতাই অসামান্য কথক বিভূতিভূষণের মৌখিক বয়ানে যেন কতদিনের পথচলার আখ্যান হয়ে যায় !

পুজোর ছুটিতে বোর্ডিং থেকে বাড়িতে ফিরবেন বনগ্রাম হাইস্কুলের ছাত্র বিভূতিভূষণ। সারাবছর বাইরে বাইরে ঘুরে মহানন্দও সেইসময় ফিরে আসেন সংসারে। মহানন্দের পাঠানো দু-চার টাকার মনি অর্ডারে মৃণালিনীর সংসার যে কীভাবে চলে, সারাটা বছর কত ধারে, বন্ধকে, ঘরের জিনিস বিক্রিতে প্রাত্যহিকের ভার মৃণালিনী যে কোন্ উপায়ে বহন করেন, তার খবর ছেলে-মেয়েরা রাখে না। কিন্তু পুজোর দিনগুলোতে এই অনটনের সংসারেও আনন্দের ছোঁয়া লাগে। চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, 'পুজোর সময় ফিরে আসেন মহানন্দ। সারা বৎসরের উপার্জন সঙ্গে নিয়ে আসেন। হাতে টাকা অল্পই থাকে। ছেলেমেয়েদের জন্যে জামা কাপড় কিনে নিয়ে আসেন। সঙ্গে আর থাকে ঘরের টুকিটাকি জিনিসপত্র। বেলুন-চাকি, কাচের জার ও বোয়াম, হাতা, খুন্তি, জলচৌকি, খড়ম ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় জিনিস। আর থাকে ছেলেমেয়েদের পড়ার বই। "বর্ণ পরিচয়" ও "ধারাপাত"। তাছাড়া বিভূতি বই পড়তে ভালোবাসে। স্কুলের পড়ার পরেও রাত জেগে জেগে সে নানা বই

পড়ে। এ তার চিরকালের অভ্যাস। বিভূতির বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু শ্যামাচরণের বাবা কৃষ্ণনগরে খুব বড় সরকারী আমলা। অনেক টাকা রোজগার করেন। গ্রামে এবং কৃষ্ণনগর সদরে অনেক প্রতাপ এবং প্রতিপত্তি। বিভূতি শ্যামাচরণদের বাড়ী থেকে অনেক বই এনে পড়েন। বঙ্কিমচন্দ্রের, রমেশচন্দ্র দত্তের বই। "বঙ্গবাসী" বা "হিতবাদী" সংস্করণ। সে সব বই এনে অল্প দীপালোকে রাত জেগে সে বই বিভূতি পড়ে। রাত্রি ভারী হয়ে ওঠে। মধ্যরাতে ইছামতীর ধারে কোনো বন-ঝোপের আড়ালে কোনো গাছের ওপরে পেঁচার ডাক শোনা যায়। মহানন্দ দেখেন বিভূতি তখনো অতন্দ্র হয়ে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। ভারী মায়া হয় তাঁর। সেজন্যে অভাবের সংসারে শত অভাবের মধ্যেও তিনি বিভূতির জন্যে বই কিনে নিয়ে আসেন। বিভূতির হাতে বই তুলে দিলে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জামা কাপড় পেলেও সে অত খুশী হয় না।' (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১ : ৫৭৮)।

চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের মুখে একথাও শুনেছিলেন যে, চোদ্দ পনেরো বছর বয়স হওয়ার আগেই, বাংলাভাষায় প্রকাশিত প্রায় সব নভেল, বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র, দীনবন্ধু, দামোদরের সঙ্গে সঙ্গে তখনকার অখ্যাত, অজ্ঞাত অনেক লেখকের বইও বিভূতিভূষণের পড়া হয়ে গেছে (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১ : ৬১)। এদিকে মহানন্দর সাংসারিক অবস্থা যেমনি হোক, তাঁর লেখা নাটক নাকি ছেপে বেরিয়েছিল। বনগ্রামের স্কুলে যাওয়ার আগে থেকেই বিভূতিভূষণ, পিতার অনুকরণে কিছু কিছু লিখতে শুরু করেন। সেই যে পরিমল গোস্বামীকে বলেছিলেন বিভূতিভূষণ, বাল্যে তিনি নাকি তারাশঙ্কর তর্করত্নের 'কাদম্বরী'র ভঙ্গিতে নিজের খাতায় রচনা লিখতেন, যেমন ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। মুনিগণ যে রক্তচন্দন সংযুক্ত অর্ঘ্য দান করিয়াছেন তদ্দ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া যেন সূর্যদেব রক্তিম বর্ণ ধারণ করিলেন' (যুগান্তর সাময়িকী, রবিবার, নভেম্বর ১২, ১৯৫০, পৃ ৯), এসব মনে হয় তখনকারই ঘটনা।

নতুনের স্বপ্ন সনাতনের দায়িত্ব

১৯১০ সালে মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় গোপালনগর ডাকঘরে একটি অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে মহানন্দর নামে পঞ্চাশ টাকা জমা পড়ল, এরকম নথি আছে। ২১ সেপ্টেম্বর আরও দু'টাকা জমা পড়ে। ২৫ অক্টোবর এবং ১৫ নভেম্বর তারিখে যথাক্রমে কুড়ি টাকা এবং আঠারো টাকা ডাকঘর থেকে

তুলে নেওয়া হয়। সে'বছর ১২ আগস্ট ডাকঘর দু'আনার সুদ দিয়েছিল মহানন্দকে। ফলে ১৯১১ সালের সূচনায় ডাকঘরে মহানন্দর নামে জমা ছিল চোদ্দ টাকা দুআনা। ১৯১১ সালের ৮ মে আরো তেরো টাকা তোলা হয়। ১৯১২ সালে এ পাসবইতে কোনো জমা বা তোলার নথি নেই। সুদ-আসল মিলিয়ে ১৯১৩ সালের ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ডাকঘরে দু'টাকা চার আনা সাত পাই জমা ছিল। ওই ১১ ডিসেম্বর তারিখে দশ টাকা জমা পড়ে এবং ১৭ ডিসেম্বর এগারো টাকা তুলে নেওয়া হয়। বাকি এক টাকা চার আনা সাত পাইয়ের ভবিষ্যৎ কী হল, তা আর ওই শতচ্ছিন্ন পাসবই থেকে উদ্ধার করা যায়নি (অপ্রকাশিত)। মহানন্দর মৃত্যুর বছরটি নিয়েও বিভ্রান্তির কারণ আছে। বিভূতিভূষণের দিনলিপিতেই দেখি, '···পূজোর সময়কার কথা মনে পড়ে। বাবার এই সময়ে প্রতি বৎসর জ্বর হত—ঘরে ধুনোর গন্ধ বেরুতো সন্ধ্যার সময়, বাবা জ্বরের ঘোরে অস্ফুট কাতর শব্দ করতেন—আর আমরা ছেলেমানুষ তখন, ভাবতুম—এবার পূজোর সময় আমাদের কাপড় হল না—। বালক-বালিকারা বড় স্বার্থপর হয়) মায়ের হাতে একদম টাকা পয়সা থাকত না—১৯১৩ সালের পূজোর সময় বাবা কলকাতা না কোথায় ছিলেন, এক পয়সাও পাঠান নি, আমাদের সে কি কষ্ট, মা আমাকে তক্তপোশখানার কাছে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা-বেলায় কি কথা বলেছিলেন সংসার ও বাবা সম্বন্ধে—সে সব কথা মনে আসে কেবলই।' (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৩৯৬)।

বিভূতিজীবন এবং সাহিত্যের গবেষক সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, 'দিনলিপির এই অংশে বিভূতিভূষণ ভুলক্রমে ১৯১৩ সনে মহানন্দর গ্রামে ফেরার কথা উল্লেখ করেছেন। মহানন্দ মারাই যান ১৯১১-১২ সনে।' (সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৭০ : ১১)। কিশলয় ঠাকুর লিখেছেন, ১৩১৮ বঙ্গাব্দে মহানন্দের মৃত্যু হয় (কিশলয় ঠাকুর, ১৯৭৮ : ৪৩)। যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মহানন্দ যখন মারা যান, বিভূতিভূষণ তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ১৯)। অষ্টম শ্রেণীতে বিভূতিভূষণের ১৯১১-তেই পড়বার কথা। সুতরাং মহানন্দর মৃত্যু ১৯১১ সালে হয়েছিল, এরকম অনুমানের অনুকূলেই সবচেয়ে বেশি মত পাওয়া যাচ্ছে। তবে কি ১৯১৩ সালে গোপাল-নগর ডাকঘরের অ্যাকাউন্ট অন্য কোনো নামে বদল করা হয়েছিল? ছেঁড়া, জায়গায় জায়গায় কালি এমনকী ছাপাও অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া পাসবইটি থেকে তেমন কোনো হদিস অবশ্য পাইনি। বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে আছে, 'বাবা

আড়ংঘাটা থেকে ঘোর জ্বরে অভিভূত হয়ে বাড়ি ফিরে দাওয়ায় উঠেই প্রথম কথা বলেছিলেন—খোকা কৈ, খোকা—? অথচ তিনি জানতেন আমি বোর্ডিং-এ আছি। সেই অসুখ থেকে আর তিনি ওঠেন নি।' (তৃণাঙ্কুর, বি র ২ : ২০০)। বোর্ডিং থেকে এসে বিভূতিভূষণ অসুস্থ মহানন্দের সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন। সেই সময়ে মহানন্দ বড়ো ছেলের কাছে বলেন যে, আঙুর ফল খেতে বড় প্রাণ চাইছে। তখনকার বারাকপুর গ্রামে তো বটেই, এমনকী বনগ্রামের মতো মফস্বলেও আঙুর কিংবা আপেলের মতো ফল আদৌ সুলভ ছিল না। বিভূতিভূষণ তখন বনগ্রাম হাইস্কুলের নিচুক্লাসের দু-একটি ছাত্রকে পড়ান। নিজের সেই রোজগারের টাকায় আঙুর কিনে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু বিভূতিভূষণ যখন বাড়িতে ঢুকলেন, তখন মহানন্দ জীবিত নেই। আঙুরফলটি জীবনে আর কখনও খাননি বিভূতিভূষণ (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১ : ৬১-২)।

চলে গেলেন মহানন্দ। অভাব-অনটনের সংসারে অশান্তি হলে, আর কোনোদিন তাকে মানসিক প্রশান্তির খোঁজে নৌকোয় ইছামতী পেরিয়ে মাধবপুর গ্রামে যেতে হবে না (হে অরণ্য কথা কও, বি র ৭ : ৩৯৬)। কিন্তু বিভূতিভূষণ কী করবেন? মহানন্দ বড়ো মেয়ে জাহ্নবীর বিয়ে দিয়ে গেছেন, চালকী গ্রামের চাটুজ্জে বাড়ির ছেলে পঞ্চাননের সঙ্গে। সরস্বতীর বিয়ে তখনও বাকি। নাবালক ছোটভাই নুটুবিহারী, মা মৃণালিনী, এদের সব দায়িত্বই তো মহানন্দর বড়ো ছেলের। মহানন্দর মৃত্যু যদি সত্যিই ১৯১১ সালের শেষদিকে হয়ে থাকে তবে গোপালনগর ডাকঘরের সম্বল তখন দু'টাকা চার আনা সাত পাই। স্কুলে বেতন লাগে না ঠিকই, কিন্তু বোর্ডিং-এর ভাড়া তো দিতে হয়। এতদিন নিচুক্লাসের ছাত্র পড়িয়ে, মাঝেমধ্যে মায়ের কাছে হাত পেতে চলছিল। কিন্তু এবার? বাইরের আকাঙ্ক্ষা তো ঢুকে পড়েছে মনে। ছেলেবেলার মতো যাত্রা-পালা দেখে মেতে থাকার দিন ফুরিয়েছে। পাঠকের এমনকী লেখকেরও তো জানা থাকে না যে, কোন্ মুহূর্ত থেকে তার মনের মধ্যে তৈরি হচ্ছে শৈশবে যাত্রাপালায় দেখা সনাতন নট-অভিনেতাদের স্মৃতিকে "যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ"-এর মতো সাহিত্যিক নির্মাণে উতরে দেওয়ার তাগিদ! সেই কবে প্রথম যাত্রার বেহালা শুনে রোমাঞ্চ জেগেছিল বালক বিভূতির মনে, যাত্রাদলের ছেলে ফণি খেতে এসেছিল বাড়িতে, সেখান থেকে তো পৌঁছতে হবে 'পথের পাঁচালী'র অজয়ে! সংসারে সেই অজয়ের কেউ নেই, নাবালকবেলায় বেরিয়েছে পথে নিজের সংস্থান নিজে করতে। কিন্তু যাত্রাপালায় সে রাজকুমার, গানের গলা

তার অপূর্ব। সেই যে নাবালক বিভূতি কৃষ্ণ ঘোষের তামাকের দোকানের বারান্দায় বসে তার বাবার সঙ্গে যাত্রা দেখতে দেখতে দময়ন্তীর দুঃখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত (তৃণাঙ্কুর, বি র ২ : ১৫৮, ১৭২ , সে কান্না শোনাতে হবে বাংলাসাহিত্যের পাঠককে; এ অঙ্গীকার কোন্ মুহূর্তে বিভূতিজীবনে নিজের উৎস খুঁজে পেয়েছিল, সে খবরও তো জানা নেই লেখক-পাঠক কারোই! কিন্তু নিজের সমকালীন বাহিরকে অন্তত কিছুদূর অর্জন না করলে কি পৌঁছোন সম্ভব তেমন সব সাহিত্যিক অঙ্গীকারের অথবা নির্মাণের নৈর্ব্যক্তিকে?

তাই সমুদ্রভ্রমণের বই পড়ে স্বপ্ন দেখে দেখে, চালপাশে তার বাঁকে চটকা তলার খালের নাম Oysterbrook রেখে (উর্মিমুখর, বি র ৩ : ৫৩৭) আর মন ভরে না বিভূতির, সমুদ্রের আরও কাছে যাওয়ার সাধ হয়। নষ্টচন্দ্রের রাত্রে পাখি এসে বাসা বাঁধবে বলে তুঁততলার স্কুলের বন্ধু কালীর সঙ্গে কুঁড়েঘর বানানোর অনাবিল আনন্দে (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১ : ৩৮-৯) আর ঢেকে রাখা যায় না মনের নিত্যনতুন কৌতূহলকে, জিজ্ঞাসাকে। একদিকে সেই নতুন বিশ্বকে পূর্ণতর অর্জন করবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। সে নতুনের কিছু কিছু ইঙ্গিত তো পেতেও শুরু করেছে বনগ্রাম উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র বিভূতি, কখনও বীজগণিতে, হয়ত ভূচিত্রেও। আর অন্যদিকে, জীবন-জীবিকার যুদ্ধে পরাজিত মহানন্দের সংসার, নিজের সমকালের যুক্তি-প্রগতির হদিস না-জানা মহানন্দের উত্তরাধিকার, অর্থাভাবে-অনটনে ব্যাধিতে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া মহানন্দের অসমাপ্ত দায়ভার। বিভূতিভূষণের ছোটমামা বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'বিভূতি তুমি পড়াশুনো কর, আমি বড়দিকে কিছু করে টাকা দেব, উনি বারাকপুরেই থাকুন।' বসন্তকুমার বিভূতিভূষণের থেকে মাত্র ক'বছরের বড়। তাঁরও সামর্থ্য তখন সীমিত। তবু মৃণালিনীকে কিছু টাকা তিনি দিতেন সংসারখরচের জন্য। বিভূতিভূষণ চলে এলেন বনগ্রামে। স্কুল বোর্ডিং-এর ভাড়া বাকি পড়তে লাগল। হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট কথাটা জানালেন প্রধান-শিক্ষক চারুচন্দ্রকে।

চাদরের খুঁটে, মায়ের লক্ষ্মীর ঝাঁপি শূন্য করা সিঁদুর-মাখা কটা টাকা নিয়ে, যে ছেলে অসীম আগ্রহে ইংরেজি স্কুলে পড়তে এসেছিল, তার লেখাপড়া কেমন করে বন্ধ হতে দেন ছাত্রবৎসল চারুচন্দ্র? বনগ্রামে সরকারি মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে তাঁর ছোট ছেলেমেয়েদের পড়ানোর কাজ ঠিক হল বিভূতিভূষণের জন্য। গার্জেন টিউটর। সেটা ১৯১৩

সাল, গার্জেন টিউটরটি নিজে তখন ফার্স্ট ক্লাসের ছাত্র, পরের বছর তার পরীক্ষা। সরকারি হাসপাতাল (চিকিৎসকের বাড়ি তার লাগোয়াই হবে) আর বনগ্রাম হাইস্কুলের দূরত্ব অল্প। বিধুভূষণের পরিবারে বিভূতির জন্যে আন্তরিক স্নেহ-ভালোবাসারও অভাব নেই। সবদিক থেকেই তবে খানিকটা সুসার হল। (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ১৯ ; চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১ : ৬২-৪)। বিভূতিভূষণের বহু পরবর্তী দিনলিপিতে দেখি, 'অনেককাল পরে গরীবপুরে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে খিনু ও তার বোন রাণীর সঙ্গে দেখা হোল। আজ প্রায় ষোল বছর আগে ওদের বাসাতে বাড়ির ছেলের মত থাকতুম। তখন আমিও বালক, ওরা নিতান্ত শিশু। সেই খিনুকে যেন আর চিনতে পারা যায় না। এত বড হয়ে উঠেচে, এত দেখতে সুন্দর হয়েচে। রাণীও তাই। কতক্ষণ তারা আমাকে কাছে বসিয়ে পুরনো দিনের গল্প করতে লাগলো আপনার বোনেদের মত, ছাড়তে আর কিছুতে চায় না। শেষকালে রাণী তার শ্বশুর-বাড়ির ঠিকানা দিয়ে কলকাতায় গেলেই যেন সে ঠিকানায় গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি, এ অনুরোধ বার বার করলে।' (তৃণাঙ্কুর, বি র ২ : ১৫৮)। চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ও জানিয়েছেন যে, বিধুবাবুর মেয়ে খিনু (ভালো নাম প্রীতিলতা) বিভূতিভূষণকে নিজের দাদার মতো যত্ন করতেন। খিনুর বিয়ে হয়েছিল রানাঘাট-বনগ্রাম রেললাইনে গোপালনগরের পরবর্তী স্টেশন মাঝেরপাড়ার মাঝেরগ্রাম ?) কাছে গরীবপুর গ্রামে। বিভূতিভূষণের মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরেও খিনুদের সঙ্গে বিভূতিভূষণের পরিবারের প্রীতির সম্পর্ক থেকে গেছে (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১ : ৬৪)। 'অপরাজিত' উপন্যাসে অবশ্য এমন স্থায়ী বন্ধন অপুর সঙ্গে নির্মলার ঘটেনি। দেওয়ানপুরে স্কুলে পড়বার সময় ডেপুটিবাবুর বাড়িতে ছেলে পড়ানো এবং থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থায় অপু খুবই উপকৃত হয়েছিল। ডেপুটিবাবুর স্ত্রীর স্নেহ, বড় মেয়ে নির্মলার আন্তরিক যত্ন এবং সখ্য সুবিশাল উপন্যাসটির সামান্য একটু অংশকে ভরাট করে রেখেছে। পরবর্তীকালে নির্মলার কথা অপুর একবার মনে পড়েছিল, যখন সে কলকাতায় সম্পন্ন এক বাড়িতে দাম্ভিক ছাত্রী প্রীতির গৃহশিক্ষকের কাজে কিছুটা অপমানিত হয়। জানি না, 'অপরাজিত' উপন্যাসের ওই অংশটি কোন্ সময়ে লিখছিলেন বিভূতিভূষণ। তা কি উপরের ওই 'তৃণাঙ্কুরে'র অংশটির সমসাময়িক ?

পরিমল গোস্বামীকে বিভূতিভূষণ নিজেই বলেছিলেন, বাল্যে মাঠের কাছে, ঘাসের কাছে, নদীর কাছে, হাওয়ার কাছে গল্পকথনের আখ্যান। তা কি ছিল

কথকতার মহড়া? বেশির ভাগ বালকের মতো বিভূতিও কি তখন ভাবত যে, বড়ো হয়ে বাবার মতো হব? তারপর বনগ্রাম উচ্চবিদ্যালয় পর্যন্ত এগোতে এগোতে কি কিশোর বিভূতির সে স্বপ্ন বদলে গেল? এমন কোনো ভবিষ্যের কল্পনা তাকে পেয়ে বসল, যা কথক মহানন্দের দীর্ণ বর্তমানের থেকে পৃথক? সজনীকান্ত দাসের কাছে চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় শুনেছেন যে, বনগ্রাম হাইস্কুলের ছাত্র বিভূতির আলাদা খাতির ছিল বন্ধুদের কাছে; কারণ সে লিখে দিতে পারত ফরমায়েসি বিয়ের পদ্য কিংবা প্রীতিউপহারের বয়ান। আর বনগ্রামে পড়বার সময় যে স্কুল ম্যাগাজিনে তাঁর কিছু কিছু লেখা বেরিয়েছিল, এ গল্প বিভূতিভূষণ নিজেই করেছেন চণ্ডীদাসের কাছে। খেলাধুলোয় তেমন দক্ষ অথবা আগ্রহী বিভূতিভূষণ কোনোকালেই ছিলেন না। চাল্‌কীর বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর স্কুলজীবনের সহপাঠী এবং আজীবনের সুহৃদটিকে নিয়ে অনেক কথা বলেছেন চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়কে—'বিকেলে স্কুল ছুটি হোলে স্কুলের মাঠে আমরা খেলাধুলা করতাম। আর বিভূতিকে দেখতাম বই হাতে তন্ময় হয়ে মাঠের একধারে বসে আছে। অতি অল্প বয়সে সে যে কত বই পড়তো তার সীমা সংখ্যা নেই। স্কুল পাঠাগারের সব বই সে শেষ করে ফেলেছিল। মন্মথবাবু মোক্তারের বাড়ী থেকে "প্রবাসী", "ভারতবর্ষ" নিয়ে আসতো। বারাকপুর আর গোপালনগরও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। তখন সম্পন্ন গৃহস্থরা গৃহাভিমুখী—কোলকাতা বা অন্যত্র উপার্জ্জন করলেও দেশের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতেন না। প্রত্যেকের বাড়ীতেই বই থাকতো। "বঙ্গবাসী", "হিতবাদী" এবং সদ্য প্রকাশিত "বসুমতী" সংস্করণের উপহারের বই। বিভূতি সে সব পড়তো। তাছাড়া শনি / রবিবারের ছুটীতে প্রায় একত্রেই আমরা বাড়ী ফিরতাম। দেখতাম বিভূতি তন্ময় হয়ে প্রকৃতি দেখছে। তখন বুঝিনি। এখন বুঝি ও অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ ছিল।' 'যমুনা', 'প্রকৃতি' কিংবা 'বালক'-এর মতো সাময়িক পত্রিকা, টড্-এর 'রাজস্থান', পাঁচকড়ি দের ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস, অলৌকিক রহস্যকাহিনী—এসবই ছিল বিভূতিভূষণের অবসরের সঙ্গী। বোর্ডিং-এ তার ঘরের সামনে সহপাঠীদের মাতামাতি যে তুঙ্গেই উঠুক, বিভূতিভূষণের অভিনিবেশ অটুট থাকত। আর শনি-রবির ছুটিতে বাড়ি ফেরার পথে, চাল্‌কীর বিভূতি কতদিন তার মিতের অনবদ্য গল্প বলায় মুগ্ধ হয়ে নিজের গ্রাম ফেলে রেখে চলে যেত বারাকপুর পর্যন্ত। (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১ : ৬৪-৫, ৬৮-৭০)।

১৯১৪ সালে বিভূতিভূষণ বনগ্রাম হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস

করেন। পরীক্ষার ফিস জোগাড় করতে মায়ের কোমরের বিছে বেচতে হয়েছিল (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ১৯)। ম্যাট্রিক পাস করে বিভূতিভূষণ পড়তে এলেন কলকাতায়। এই কলকাতায় বাল্যকালে মদনমোহনতলায় কিংবা আরপুলি লেনে বাবা-মার সঙ্গে থেকেছেন বিভূতিভূষণ, পড়েছেন প্রথমে বাগবাজারে শুভঙ্করী পরে বৌবাজারের অন্য এক পাঠশালায়, বাবার হাত ধরে চড়েছেন কলকাতার ট্রামগাড়িতে, দেখেছেন চিড়িয়াখানা, জাদুঘর। কিন্তু, এই ১৯১৪-তে কুড়িবছরের বিভূতি শহর কলকাতায় একেবারে একা। নবজাগ্রত বাঙালির আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতির নতুন যুক্তিতে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ একটা মানুষ যে নিজের সাবেকি জানাচেনার পুঁজিটুকু সম্বল করেই একটা আশ্রয় সাধ্যমতো বানাতে চাইবে তার আদরের বড়ো ছেলের জন্য, সে অবলম্বনের দিন তো বিভূতির ফুরিয়ে গেছে। এই কঠিন দিনের স্মৃতিরোমন্থনে বিভূতিভূষণ পরিণত বয়সেও বারবার ফিরে যেতেন ছোটমামা বসন্তকুমারের কাছে কৃতজ্ঞতায়, 'ছোট মামা যদি তখন টাকা না দিতেন তাহলে আমার পড়াশুনো হতো না, আলু-পটল বিক্রি করতে হতো, এতদিনে গ্রামের আর সকলের মত জমি-জমা গরু-বাছুর নিয়ে ঘোর সংসারী হতাম।' (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ১৯-২০)। 'অপরাজিত'র পাঠক জানেন, আড়াইদশক বাদে গ্রামে ফিরে অপু দেখছে, '...ছেলেবেলায় যারা ছিল সাথী—এখন তাদের সঙ্গে আর অপুর কোনোদিকেই মিশ খায় না—তাদের সঙ্গে কথা কহিয়া আর সে সুখ নাই, তারা লেখাপড়া শিখে নাই, এই পঁচিশ বৎসরে গ্রাম ছাড়িয়া অনেকেই কোথাও যায় নাই—সবারই পৈতৃক কিছু জমি-জমা আছে, তাহাই হইয়াছে তাহাদের কাল।' (বি র ৩ : ১৭২)। বিভূতিভূষণ যখন ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় চলে গেলেন, দিদির সংসারের দেখাশোনা, সাধ্যমতো অর্থসাহায্য, সবই করতেন বসন্তকুমার।

কলকাতায় পড়বার সিদ্ধান্ত বিভূতিভূষণ নিজেই নিয়েছিলেন। বনগ্রাম হাইস্কুলের ছাত্রবৎসল প্রধানশিক্ষক চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়েরও ইচ্ছা, বিভূতি কলকাতায় পড়েন। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের সেই প্রথমভাগে কলকাতা মহানগরী ভারতের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক রাজধানীর উপমায় চিহ্নিত। শাসকের সাজানো বাগানকে কলকাতার জলুসে বড় উজ্জ্বল মনে হয়। ১৯১১-তে দিল্লি-দরবারের পরে পঞ্চম জর্জের ভারতপরিদর্শনকালে রাজধানী দিল্লিতে সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া সবেমাত্র শুরু হয়েছে। তা শেষ হতে হতে ১৯১৬। কলকাতায় তখন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। অরবিন্দ এবং

নিবেদিতার ভূমিকা সেখানে কখনও পরোক্ষ, কখনও বা প্রত্যক্ষ। ১৯১৩ সাল বিভূতিভূষণ যখন বনগ্রামে বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গার্জেন-টিউটর-শিপের আনুকূল্যে ফার্স্ট ক্লাসের প্রাত্যহিক বাধাবিপত্তি পার করছেন, সেইবছর রবীন্দ্রনাথ পেলেন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আর অধ্যাপনায় বিজ্ঞানচর্চা কলকাতায় বহুদূর এগিয়ে গেছে। বনগ্রাম হাইস্কুলের ছাত্রবৎসল চারুচন্দ মুখোপাধ্যায় কিংবা তাঁর জ্ঞানপিপাসু ছাত্র বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অনেকেরই মনে বুঝি আশা জাগত তখন যে, কলকাতা সত্যিই লন্ডন হল বলে! যুক্তির যে প্রস্তনায়, বিজ্ঞানের যে জয়যাত্রায় ইংরেজ তার স্বদেশে উন্নয়নের বনিয়াদ গড়েছে, সেই একই বিজ্ঞানে, যুক্তিতে তার উপনিবেশকেও ইংরেজ আলোকিত করে দিতে চায়—উনিশ শতকের ওই নবজাগ্রত বিশ্বাস এক শতাব্দী পেরোতে পেরোতে কিছুটা অনিশ্চিত। তবু সন্ত্রাসবাদে অথবা অন্য কোনো আদর্শের জোরে যদি পরাধীনতা থেকে মুক্তি মেলে, তবে ইংরেজের ছড়িয়ে দেওয়া আলোর স্বাধীন, স্বাবলম্বী উপভোগ যেন সম্ভব হবে এই ভারতে, এই নবজাগরণের বাংলায়, সেই বাংলার পীঠস্থান কলকাতায়। তবে চারুচন্দ্রর ছাত্রটির মূল সমস্যা হল এই যে, শহর কলকাতায় আর একজন চারুচন্দ্র খুঁজে পাওয়া খুব সহজ নয়।

বঙ্গবাসী কলেজের পরিবেশ বিভূতিভূষণের ভালো লাগল না। সেন্ট পল্‌স কলেজ আর সিটি কলেজেও গিয়েছিলেন তিনি। কলকাতার কোনো একটা ভালো কলেজে ভরতি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল, আশা ছিল ফ্রি স্টুডেন্টশিপ পাবেন। রিপন কলেজে যে তিনি ভরতি হলেন, তার একটি মূল কারণ হল, এ কলেজের বেতন তুলনায় কম। পরিচিতজনের পরামর্শে বিভূতিভূষণ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন ফ্রি স্টুডেন্টশিপের আবেদন নিয়ে। কারণ যাই হোক, তাঁর আবেদন নামঞ্জুর হয়ে গেল। অবশ্য তা নিয়ে কোনো ক্ষোভ ছিল না বিভূতিভূষণের মনে। সুরেন্দ্রনাথের সময়জ্ঞান, কর্তব্যনিষ্ঠা, ইংরেজিতে ব্যুৎপত্তি, বাগ্মিতা, এসবকিছুতেই তাঁর মুগ্ধতা ছিল অন্তহীন। রিপন কলেজের অধ্যক্ষ তখন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের মুখে অধ্যক্ষের বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বলতার কথা বহুবার শুনেছেন। শুনেছেন, স্যার আশুতোষের প্রতিভাদীপ্ত চোখদুটির দিকে নাকি তাকানো যেত না (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১ : ৬৯-৭১)। এই যে এত আলো মহানন্দ শাস্ত্রীর সহায়সম্বলহীন পুত্রটির চোখে এসে লাগল, সে আলোকে

নিজের মধ্যে ধরিয়ে নেওয়ার, ভরিয়ে নেওয়ার পথ তো সহজ নয়। ১৯২৮ সালের ১৬ জানুয়ারি দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ লিখেছিলেন, 'বহুদিনের কথা মনে পড়ে। ৬০ মির্জাপুরের কলেজ হোস্টেল এই শীতের দিনের যে অপূর্ব দিনগুলো —সেই প্রথম যৌবনের দীপ্ত উৎসাহ, মায়াজগতের স্বপ্ন, শিশিরবাবুর অভিনয় "ইন্‌স্টিটিউটে" দেখে এসে পথের মোড়ে ফুটপাথে তাই নিয়ে যে মেতে থাকা।' (স্মৃতির রেখা, বি র ১ : ৩৯৬-৭)। 'উৎকর্ণ' দিনলিপিতে দেখি, 'ট্রাম লাইনের কাছে সেনেটের সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়েই দেখি…কালপুরুষ উঠেচে বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তির মাথার ওপরকার আকাশে। এই পাশের কার্নিসে বসে মাধববাবুর বাজার থেকে ফুলুরি কিনে খেতুম যখন ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র—সে কথা মনে পড়ল।' এ দিনলিপি সেই ১৯৩৮-এর বিজ্ঞান কংগ্রেসের সময়কার। জিন্‌সের বক্তৃতা শুনে বেরোনর মুখে দেখা হয়েছে মেঘনাদ সাহার সঙ্গে, বিভূতিভূষণ জিজ্ঞাসা করেছেন, 'মেঘনাদদাদা, ময়দান ক্লাবের কথা মনে আছে? ১৯১৪ সালের?' (বি র ৪ : ৩৪৫)।

সেই ১৯১৪ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতি সন্ধ্যায় জুড়িগাড়ি চেপে বেড়াতে যেতেন গড়ের মাঠে। লর্ড রবার্টসের প্রস্তরমূর্তির তলায় অয়েলক্লথ বিছিয়ে বসতেন। জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, মেঘনাদ সাহা, চন্দ্রশেখর রমন, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকেই আসতেন সেই আড্ডায়। এই হল ময়দান ক্লাব। বিভূতিভূষণের এই আসরে যাতায়াত ছিল (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১ : ৮০)। যশোর খুলনার বহু ছাত্রের মতো বিভূতিভূষণও প্রফুল্লচন্দ্রের বদান্যতার আনুকূল্য পেয়েছিলেন। যদিও মূলত ছাত্র পড়িয়েই বিভূতিভূষণ নিজের কলেজজীবনের খরচ চালাতেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কিছু অর্থসাহায্য করতেন তাঁকে। 'উৎকর্ণ' দিনলিপিতে আছে, 'কাল সায়েন্স কলেজের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে আচার্য্য পি. সি. রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম অনেককাল পরে। বয়স হয়েচে, কোন্‌দিন মারা যাবেন—আর অনেকদিন যাওয়া হয়নি—এইসব ভেবেই দেখা করতে গেলাম।…বললুম—মাঠে যান এখনও? বল্লেন—ও বাবা, না গেলে কি বাঁচি?…তুমি আর যাও না কেন?…গ্রিন্ বোট করেচি, শ্রীপুরের ঘাটে বাঁধা রয়েচে। একবার তোদের বারাকপুরে যাব গ্রিন্ বোটে করে ইছামতী দিয়ে। …অনেকদিন পরে বুড়োর সঙ্গে গল্প করে বড় আনন্দ পেলুম। বুড়ো কবে মরে যাবে, একটা অনুতাপ থেকে যাবে মনে।' (বি র ৪ : ৩৬৯)। দুয়ের দশকের প্রথমদিকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আনকোরা নতুন লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যো-

পাধ্যায়ের প্রথম গল্প "উপেক্ষিতা" 'প্রবাসী' পত্রিকায় পড়ে খুশি হয়ে চিঠি লিখেছিলেন লেখককে। ওই বিনিময়ের সূচনা এই ১৯১৪ সালে, লেখকটির কলেজজীবনের প্রথম বছরে। সেই প্রথম বছরটির টুকরো টুকরো স্মৃতি ছড়িয়ে আছে বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে, 'আজ সুধীরবাবুদের বইয়ের দোকান থেকে বার হয়ে গোলদীঘিতে গিয়ে যখন বসেচি, তখন রাত সাতটা। ধোঁয়া এত বেশী, যে আকাশে সপ্তমীর চাঁদকে ঢেকে ফেলেচে; ট্রামের আলো, বাড়ির আলো, রাস্তার আলো, ধোঁয়ার জালের মধ্যে মিটমিট করচে। মনে পড়ল ১৯১৪ সালের এমন দিনের কথা···আমি তখন ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র, সবে কলকাতায় এসেচি—এই রকম ধোঁয়া দেখে মন তখন দমে যেত। নতুন এসেচি গাছপালা ও ইছামতী নদীর সংসর্গ ছেড়ে। তারপর কতদিন কেটে গেল—কত বিপদ আনন্দ, দুঃখ ও আশার মধ্যে দিয়ে। তখন আমরা সবাই তরুণ। The world was very young then—মামাদের তখনও বিয়ে হয় নি। এই বৈশাখে ছোট মামার বিয়ে হোল। এখন মন পরিণত হয়েচে—কত ভুল শুধরে নিতে পেরেচি, অপরের মত সহ্য করবার ক্ষমতা অভ্যাস করেচি—আমার মনে হয় জীবনে এই জিনিসটাই সবচেয়ে বড়। Intolerance-এর চেয়ে বড় শত্রু জীবনে আর কিছু নেই। ইউনিভার্সিটির আলোগুলোর দিকে চেয়ে সেইসব দিনের কথাই মনে পড়ছিল···।' (ঊর্মিমুখর, বি র ৩ : ৫০৮-৯)।

কলকাতায় এসে বিভূতিভূষণ প্রথম উঠেছিলেন বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটের এক বাড়িতে। বাড়িটা বারাকপুর গ্রামের গিরীন ডাক্তার অর্থাৎ গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নিজের বাড়ির ছেলেদের লেখাপড়ার সুবিধার কথা ভেবে ভাড়া নিয়েছিলেন। বিভূতিভূষণের বন্ধু ক্যাপ্টেন সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই বাড়িতে থেকে কলকাতায় ডাক্তারি পড়তেন। পরে বিভূতিভূষণ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটের এই বাড়ি থেকে ৬০ মির্জাপুর স্ট্রিটে রিপন কলেজ হোস্টেলে চলে যান (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ২০)। এই ঠিকানায় তাঁর কলেজজীবনের কিছু সময় কেটেছিল। মির্জাপুর স্ট্রিট-আমহার্স্ট স্ট্রিট এলাকার একটি মেসে তিনি কিছুদিন থেকেছেন, থেকেছেন শ্রীগোপাল মল্লিক লেন আর মদনমোহন সেন লেনের মেসবাড়িতে। চাকরিজীবীদের সঙ্গে মেসবাড়িতে থাকবার অসুবিধা, অপরিচ্ছন্নতা, গ্লানি, সময়ের অপচয়, লেখাপড়া কিংবা তার আনুষঙ্গিক চিন্তাভাবনার প্রায় সুযোগবিহীন প্রাত্যহিক বিভূতিভূষণের ছাত্রজীবনে, হয়ত কর্মজীবনেও আনবার্য বাস্তব হয়েই ছিল। 'ইনটলারেন্স'-এর কোনো অবকাশ বা উপায় তাঁর

আর্থিক, সামাজিক নাগালের বাইরে। প্রসঙ্গত বিভূতিসাহিত্যের পাঠকের মনে পড়বে 'অপরাজিত' উপন্যাসে অখিলবাবুদের মেসের বিস্তৃত বর্ণনা। কেরানি-বাবুদের মেস ছেড়ে অন্য একটি মেসেও গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। সেটা মূলত ছাত্রদের মেস। কয়েকজন ছাত্র নিজেদের জলপানি আর ছেলে পড়ানোর টাকায় মেসটি চালাত। 'অপরাজিত'তে সুরেশ্বরদের মেসবাড়িতে এর আদল হয়ত আছে। ওই মেসবাড়িতে যে সন্ত্রাসবাদীদের আনাগোনা ছিল, তা প্রথমে জানতেন না বিভূতিভূষণ। এখানকার অভিজ্ঞতা থেকেই নাকি ১৯৪০ সালে "সুলোচনার কাহিনী" লেখা হয়েছিল (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় ১৯৯১ : ৭৩-৪)। ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে বিভূতিভূষণও অপুর মতো ইতিহাস, লজিক ইত্যাদি বিষয় পড়েছিলেন কিনা, সত্যিই তিনি লিখেছিলেন কিনা "নূতনের আহ্বান" নামে কোনো প্রবন্ধ তখনকার রিপন কলেজ পত্রিকায়, নাকি পরিমল গোস্বামীকে নিজের জীবনের গল্প বলতে বলতে অপুকে আর নিজেকে মিলিয়ে ফেলেছিলেন, এইসবই আজও নিরুত্তর জিজ্ঞাসামাত্র। তবে ছাত্রজীবনের এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখা বিভূতিভূষণের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

তুঁতলার স্কুলে প্রধানশিক্ষক গগনচন্দ্র পালের মুখে "বঙ্গে শরৎ" কবিতা শোনার আশ্চর্য অনুভব কখনও ছেড়ে যায়নি বিভূতিভূষণকে। ১৯১৩ সালে বিভূতিভূষণ যখন বনগ্রাম হাইস্কুলে ফার্স্টক্লাসের ছাত্র, তখন রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার পাওয়ার খবরে তাঁর মনে হয়েছিল. '…আমাদেরই একজন আজ বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উচ্চ সম্মান লাভ করেছেন, সাহেবরা দেখুন আমরা ছোট নই। রবীন্দ্রনাথের সম্মান সারা বাংলা দেশের তথা সারা ভারতবর্ষের সম্মান—আমাদের সম্মান।' তবে বিভূতিভূষণই লিখেছেন, '…তাঁর কবি-খ্যাতির কথা যথেষ্ট শুনলেও, তাঁর রচনার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ঘটে নি তখনও, কারণ…মফঃস্বলের একটি ক্ষুদ্র শহরে রবীন্দ্রনাথের রচনা তত প্রসার লাভ করে নি সে সময়ে।' একই লেখাতে আছে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখবার বর্ণনা—'কলকাতায় সবে এসেছি কলেজে পড়তে। রাস্তাঘাট তখনও ভাল চিনি না, একদিন দুপুরবেলা কলেজে কে বললে, আজ সেণ্ট পল্‌স কলেজ হোস্টেলে রবিবাবু আসবেন—দেখতে যাবে ?…রবীন্দ্রনাথ…এলেন সেণ্ট পল্‌স কলেজের হোস্টেলের সামনের মাঠে—ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ, বেলা বিশেষ পড়ে নি—তিনটে হবে। মাঠে তাঁর জন্যে চেয়ার টেবিল পড়েছে। আমরা সেই টেবিলের দুই পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছি…রবীন্দ্রনাথ ঢুকলেন পেছনে ছাত্রদের ভিড়ের

মধ্যেকার সরু পথ দিয়ে। দীর্ঘ দেহ, দীর্ঘ শ্মশ্রু, সৌম্যসুন্দর মূর্তি।...ছবিতে তাঁর চেহারা দেখেছি অনেকবার, কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হল কোন ফোটোই তাঁর প্রতি সুবিচার করে নি।...একেবারে তাঁর কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়েছি, তাঁর অতটা নিকট সান্নিধ্য-লাভের আনন্দে তখন আমি আত্মহারা। দেশে গিয়ে গল্প করবার মত একটা ঘটনা বটে আজ।...হোস্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেট(ণ্ট ?) কেনেডি সাহেব রবীন্দ্রনাথের সামনের টেবিলে বড় একটা কাঁচের জগ ভর্ত্তি করে জল ও একটা গ্লাস রাখলেন...সকৌতুকে ভাবলাম, দেখ কেনেডি সাহেবের কাণ্ড! অতটা জল কি খাওয়ার দরকার হবে ওঁর?...বক্তৃতা দিতে উঠলেন...এমন কণ্ঠস্বর আর কখনও শুনি নি. মনে হল এ কণ্ঠস্বর অসাধারণ...যা হাজার লোকের মধ্যেও পৃথক করে চিনে নেওয়া চলবে।...বক্তৃতার আর কোন কথা আমার মনে নেই ..কেবল মনে আছে...অনবদ্য ভঙ্গিতে ডান হাত নেড়ে চাঁপার কলির মত অঙ্গুলির সাহায্যে (যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন. সবাই জানেন তাঁর আঙ্গুল দেখলে চাঁপার কলির কথা মনে হত) একটি সুশ্রী মুদ্রা রচনা করে বললেন, "কল্পলোক...কল্পলোক" - কয়েকবার তিনি কথাটি ব্যবহার করলেন বক্তৃতার মধ্যে. আরও অনেক কিছু বলেছিলেন মনে নেই।...হোস্টেলের মাঠে...ছায়া পড়ে এল। বক্তৃতা শেষ হয়ে গেল। আমরা সবাই ঠেলাঠেলি করে তাঁর পায়ের ধূলা নিলাম. পায়ে তাঁর চকচকে বাদামী চামড়ার জুতো ছিল—সে কথা আজও ভুলি নি।' (প্রথম দর্শন, বি র ১২ : ৩৫৪-৫)।

রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেছিলেন বিভূতিভূষণ. সেটা ১৯১৫ সাল। ১৯১৬-তে বিভূতিভূষণ রিপন কলেজ থেকে যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। একই কলেজে বি.এ. ক্লাসে ভরতি হন ইতিহাস আর দর্শন নিয়ে, তাছাড়া ইংরেজি, বাংলা তো আছেই। রিপন কলেজের লাইব্রেরি থেকে ইতিহাস আর দর্শনের বই নিয়ে সযত্নে পড়তেন তিনি। গিবন, মমসেন, বিউরি এবং লর্ড অ্যাক্টনের লেখার একান্ত মনোযোগী পাঠক ছিলেন বিভূতিভূষণ। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার আগেই নাকি ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত লেখকদের বেশিরভাগ বই তাঁর পড়া হয়ে গিয়েছিল। কবি কৃষ্ণধন দে, কবি কৃষ্ণদয়াল বসু এবং রাধারমণ মিত্রের মতো যাঁরা বিভূতিভূষণের নিকটজন, তাঁদের কাছেই এসব গল্প শুনেছেন চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১ : ৭৮)। বিভূতিভূষণ যে সময়ে কলকাতায় এসেছিলেন, যুদ্ধের আশঙ্কা তখন ইয়োরোপকে ঘিরে রয়েছে। সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে ১৯১৬-১৭-তেও। বারাকপুর গ্রামে

ছেলে হুটু আর মেয়ে মণিকে নিয়ে সংসার চালাতে মৃণালিনীকে সেই যুদ্ধের খরচ একভাবে গুনতে হচ্ছে। যুদ্ধের বাজারে চালের দাম চড়ছে, বাড়ছে কাপড়ের দাম। ছেলে পড়িয়ে কলকাতা থেকে বিভূতি যে টাকা পাঠাতে পারেন, তার না আছে স্থিরতা, না আছে নিশ্চয়তা। ছোটভাই বসন্তকুমারের উপরেই মৃণালিনীর ভরসা। মাঝেমধ্যে বড়ো ছেলেকে চিঠি লেখেন, কিছু যদি পাঠাতে পারে সে। হাতে যা থাকে, পাঠিয়ে দেন বিভূতিভূষণ। এদিকে তৃতীয় কি চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রটি যেদিন নিজের জামাকাপড় কাচে, সেদিন কলেজে যেতে অনেক দেরি হয়ে যায় তার। কাপড়জামা সময়মতো শুকোতে চায় না। জামা তখন তার একটার উপর দুটো নেই। অথচ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সেই কঠিন প্রাত্যহিকেও বিভূতিভূষণের নিত্য যাতায়াত। সেখানকার আবৃত্তি, অভিনয়, বিতর্কের আসরে তাঁর নিয়মিত যোগদান। প্রায়ই দেখতে পান সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অনেকের মতো বিভূতিভূষণও বিশ্বাস করেন, এ যুদ্ধ শেষ হলে ইংরেজ ভারতকে স্বাধিকার দেবে, দেবে শাসনের অধিকার।

এদিকে গরিবের ঘরে মেয়ের বিয়ে সহজ নয়। বিভূতিভূষণের ছোটবোন মণির তখন বিয়ের চেষ্টা চলছে। মায়ের বড়ো সাধ, আগে বড়ো ছেলের বিয়ে দিয়ে, তবে মেয়ের বিয়ে দেন। বিভূতিভূষণ যখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, সেই ১৯১৬ থেকেই মৃণালিনীর কাছে পাত্রীপক্ষের আনাগোনা। ইন্টারমিডিয়েট পাস বি.এ. পড়া কলকাতার ছাত্র বিভূতি—এমন পাত্র খুব সুলভ নয় তো! বহুদিন পরে চন্দননগরে যে সভায় ব্রাউনিং-এর অনুবাদ নিয়ে কথাবার্তা হয়েছিল, সেই সভা উপলক্ষে চন্দননগরে যাওয়ার সূত্রে তিনের দশকে বিভূতিভূষণ ভেবেছেন, '…গোপীর সঙ্গে কুড়ি বছর আগে একবার এসেছিলুম চন্দননগরে তারপর আর কখনও আসিনি। বিয়ে করব বলে মেয়ে দেখতে এসেছিলুম, তখন আমি কলেজে পড়ি, ১৮ বছর বয়স। (কুড়ি বছর বয়সের আগে বিভূতিভূষণ অবশ্য কোনো কলেজেই পড়েননি; এ কি তবে তাঁর বিখ্যাত মিথ্যা-রসিকতা, যার সূত্রে অনেকসময়ে যেন সত্যই খুঁজতেন তিনি? নাকি স্মৃতির ভ্রান্তি?) অবিশ্যি সে মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হয়নি। মনে আছে, মেয়েটি ছিল খুব ছোট, বারো বছর বয়স, অত ছোট মেয়ে আমি পছন্দ করিনি।' (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৩০৭)। ১৯১৭ সালে, অর্থাৎ ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ৩২ শ্রাবণ বিভূতিভূষণের বিয়ে হল। চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাটে মোক্তার ছিলেন পানিতর গ্রামের জমিদার কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়। তাঁর চোদ্দবছরের মেয়ে গৌরী এলেন তেইশ

বছরের যুবক বিভূতিভূষণের বউ হয়ে। মেয়েটি রূপসী, গৌরবর্ণা। 'ঊর্মিমুখর' দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ লিখেছেন, 'আজ ৩২শে শ্রাবণ বলেই মনটা মাঝে মাঝে অনেক দূরে চলে যাচ্ছিল, অনেক দিন আগেকার এই সন্ধ্যা-গোধূলির একটা ছবি পর-পর আমার মনে আসছিল।' (বি র ৩ : ৫৪৮)।

গৌরীর সঙ্গে বিভূতিভূষণের বিবাহ গোধূলি লগ্নে হয়েছিল। চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় আছে, 'বিভূতিভূষণের দ্বিতীয় বিবাহও গোধূলি লগ্নে স্থির হয়েছিল ; কন্যাপক্ষ থেকে সন্ধ্যায় প্রথম লগ্নেই বিবাহের সমস্ত আয়োজন স্থির করে রাখা হয়েছিল, অপরাহ্নে বেলা ৫টা ৫॥টার সময় বিভূতিভূষণেব কনিষ্ঠ ভ্রাতা নুটুবিহারী এসে খবর দিলেন বিবাহ হবে একটু বেশী রাত্রিতে—কাবণ প্রথম বিবাহ হয়েছিল গোধূলি-লগ্নে, যার ফল শুভ হয়নি ; প্রথম বৌদি দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন না। স্বভাবতই কন্যাপক্ষের মনে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা এবং আশঙ্কার কারণ জেগেছিল। সে কথা আমি জানি।' (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১ : ৮২)। প্রথম যৌবনের সেই গোধূলি-লগ্নের স্মৃতি খুবই সম্ভব বিভূতিজীবনকে ছুঁয়ে থেকেছে উদ্বেগে, অপূর্ণতায়, বিষাদে। তার রেশ থেকে বিভূতিসাহিত্যও কি মুক্ত থেকেছে সবসময়ে? চন্দননগরে যে মেয়েটিকে দেখে বিবাহ করেননি বিভূতিভূষণ, তিনের দশকে তাকে নিয়ে দিনলিপিতে লেখেন, 'মেয়েটি বেশ ফর্সা, একহারা চেহারা, তাও আজও মনে আছে। এখন গিন্নীবান্নী হয়ে নিশ্চয়ই কোথাও ঘর-সংসার করচে—যদি বেঁচে থাকে।' (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৩০৭)। সেই মেয়েটিকে বিভূতিভূষণের "পারমিট" গল্পের উৎসে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু "পারমিট" তো বিভূতিসাহিত্যে গ্রথিত হল ১৯৪৪ সালে, যখন বাইশ বছরের বিপত্নীক জীবন পেরিয়ে, কল্যাণীকে নিয়ে স্থিতু সাংসারিকতায় চিহ্নিত হয়েছেন বিভূতিভূষণ, মাত্র কয়েকবছর আগে। ১৯১৬-১৭-র সেই অভিজ্ঞতা যে সাহিত্যে তার প্রত্যক্ষ না হোক পরোক্ষ রেশ ফেলতে সময় নিল সাতাশ বছব, এ তো শিল্পের অনেক নিয়মের একটি। এমনও ভাবা যায়, একধরনের অপূর্ণতার বোধ বিভূতিভূষণের গৃহহীন, স্থিতিহীন জীবনযাত্রায় সংলগ্ন ছিল। জীবনে যখন সেই না-পাওয়ার গ্লানি থেকে পরিত্রাণ মেলে, তখনই হয়তো সাহিত্যে "পারমিটে"র মতো গল্পকে অর্জন করা যায়!

বিভূতিভূষণ-গৌরীর ফুলশয্যা হয়েছিল বিভূতিভূষণের মামাবাড়িতে, মুরাতিপুর গ্রামে। যে শয্যার অনেকখানি জুড়ে ছিল চাঁপাফুল। গৌরীর অকালমৃত্যুর পরে বিভূতিভূষণ যতবার চেতনে-অবচেতনে গৌরীকে মনে করেছেন, তাঁর সে

আকুলতা। চাঁপাফুলের বর্ণে-গন্ধে প্রায়ই আশ্রয় খুঁজেছে। 'বঙ্গশ্রী'র আড্ডার আমলের কথায় পরিমল গোস্বামী লিখেছেন, 'ধর্মতলার বৈঠক থেকে নেবুতলা হয়ে সোজা হ্যারিসন রোডে যেতাম মাঝে মাঝে। বিভূতিবাবুও মির্জাপুর স্ট্রীটে যেতেন এই পথে। এক গ্রীষ্মকালে রাত আটটায় সে পথে যেতে দেখি শশীভূষণ দে স্ট্রীটের ফুটপাথ থেকে বিভূতিবাবু চাঁপাফুল কিনছেন। তাঁর অগোচরে পিছনে দাঁড়িয়ে দেখলাম, দুটি চাঁপা তিনি একপয়সা দিয়ে কিনলেন। তাঁকে চমকে দিয়ে বলে উঠলাম, "বিভূতিবাবু, এ কি ব্যাপার?" বিভূতিবাবু একটুখানি সলজ্জ হাসি হেসে বললেন, "রোজ কিনি।"' (পরিমল গোস্বামী. ১৪০০ ব : ১৫৪)। যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন 'দিদির (রমা/কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়) কাছে শুনেছি ওঁদের ফুলশয্যার রাত্রে বড়ঠাকুর শুধু মার কথা ও প্রথমা স্ত্রী গৌরীদির কথা বলেছিলেন এবং বলতে বলতে তাঁর চোখ জলে ভরে এসেছিল। দিদিও না কেঁদে থাকতে পারেননি। বড়ঠাকুর বলেছিলেন, জানো কল্যাণী. গৌরীর ফুলশয্যা প্রচুর চাঁপাফুল দিয়ে হয়েছিল। ··চাঁপাফুলের প্রতি বড়ঠাকুরের একটি অসীম ভালবাসা ও মমত্ববোধ ছিল। ঐ ফুল তাঁর প্রিয় ছিল বলে আমরা ঘাটশিলাতে এবং দিদি বারাকপুরের বাড়িতে চাঁপাগাছ লাগিয়েছিল।' (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ১৪)। কিন্তু তখন তো চারের দশক পড়ে গেছে। তিনের দশকের শুরুতে অপুর পছন্দের কথা মনে করে অপর্ণা চাঁপাগাছ পুঁতে-ছিল মনসাপোতায়। আর সে গাছ যখন ফুলে ফুলে ভরে গেল, তখন অপর্ণা নেই। অপু-অপর্ণার ছেলে কাজল, যার কাছে মা কোনো বাস্তব ধারণাই নয়, মাকে যে দেখেনি তার জ্ঞানে, সেই কাজল ফুলেভরা চাঁপাগাছের ডাল নাড়া দিয়ে ফুল পাড়তে চাইল। এই বিন্যাস যখন 'অপরাজিত' উপন্যাসে গ্রথিত হচ্ছে তখন বিভূতিভূষণের গৌরী নেই, বিভূতিজীবনে সে তো কাজলের মতো কোনো চিহ্নও রেখে যায়নি। আর কল্যাণীর কাছে পৌঁছতে বিভূতিভূষণের তখনও প্রায় একদশক দেরি। অন্যদিকে, বিভূতিভূষণকে চিনবার আগেই, 'অপরাজিত'র ওই গ্রন্থনা তো কিশোরী কল্যাণীর নিশ্চয় জানা হয়ে গিয়েছিল।

১৯১৮ সালে গৌরীকে বিভূতিভূষণ বারাকপুর গ্রামে নিয়ে এসেছিলেন (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৩৯০)। ১৬ এপ্রিল ১৯৪৩ তারিখে ডায়েরিতে বিভূতিভূষণ লিখেছেন, 'দূর থেকে সিদ্ধেশ্বর শৈলশৃঙ্গ থেকে ভাবলুম—দেশে এসেচি। কল্যাণীকে বলি—ওই দ্যাখো দেশে এসেচি। বহুদিন আগে শরতের সন্ধ্যায় ইছামতীতে নৌকায় বসে গৌরীকে একথা বলেছিলুম মনে পড়ে। কোথায়

পানিতরের নদীতীর, আর কোথায় সিংভূমের শৈলশৃঙ্গ।' (অ. র. : ৬২-৩)। তিনের দশকের মাঝামাঝি একবার বসিরহাট গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। বাঁধানো জেটির ঘাটে বসে, রাঙা রোদ মাখানো ইছামতীর ওপারে দৃশ্য দেখতে দেখতে মনে হয়েছিল, 'এই স্থানটিতে দাঁড়িয়ে একদিন গৌরী বলেছিল—"গাড়িতে কেমন কলের গান হচ্ছিল, শুনছিলাম মজা করে"; ঘোষপাড়ায় ছোটমাসীমার সঙ্গে ছাদে বসে মনে পড়ল, এই ছাদে গৌরীর সঙ্গে তাসখেলার কথা' (ঊর্মিমুখর, বি র ৩ : ৫১৯, ৫২১)। আরও আগে, ভাগলপুর জঙ্গলমহালে বসে, ১৯২৭ সালের ১৮ নভেম্বর বিভূতিভূষণ লেখেন, 'ঠিক এই সময়ে—"যতবার আলো জ্বালাতে যাই—নিভে যায় বারে বারে"—সেই শীতের বিষণ্ণ প্রভাতে গানটির কথা মনে আসে···গৌরী, সেই বনগাঁয়ের গাড়ীতে বসা, সেই বেলেঘাটা ব্রিজ স্টেশনে আমাদের প্রথম ও শেষ ঘরকন্না, সেই আয়না বার করে দেওয়া, সেই চিঠি বুকে করে মাথায় কপালে ঠেকানো···' (স্মৃতির রেখা, বি র ১ : ৩৮১-২)। অপর্ণার মৃত্যুর পরে প্রথম যখন অপু শ্বশুরবাড়িতে যায়, কাজল তখন তিন-বছরের। ফিরবার পথে নৌকোয় 'অপুর হঠাৎ মনে হইল, জায়গাটা সে চিনিতে পারিয়াছে—একটা ছোট খাল, ডাঙার উপরে একটা হিজল গাছ। এই খালটিতেই অনেকদিন আগে অপর্ণাকে কলিকাতা হইতে আনিবার সময়ে সে বলিয়াছিল—ও কলা-বৌ, ঘোমটা খোল, বাপের বাড়ির দ্যাশটা চেয়েই দ্যাখো···তারপর স্টীমার চড়িয়া···বাঁদিকে···ওই যে ছোট্ট খড়ের ঘরটি—প্রথম যেখানে সে ও অপর্ণা সংসার পাতে···অপুর কেমন এক দুর্দমনীয় ইচ্ছা হইতে লাগিল—একবার ঘরখানার মধ্যে যাইতে···হয়তো অপর্ণার হাতের উনুনের মাটির ঝিঁকটা এখনও আছে—আর যেখানে বসিয়া সে অপর্ণার হাতের জলখাবার খাইয়াছিল। প্রথম যেখানটিতে অপর্ণা ট্রাঙ্ক হইতে আয়না-চিরুনি বাহির করিয়া তাহার জন্য রাখিয়া দিয়াছিল···' (অপরাজিত, বি র ৩ : ৬৪-৫)।

কিশোরী গৌরীর লেখা চিঠিগুলি বিভূতিভূষণ অতি যত্নে রেখে দিয়েছিলেন। বলতেন, '···ওসব কি হারানো যায়?' যমুনা এবং কল্যাণী সেই চিঠি দেখেছেন—'···খুব পাতলা পাঁজির কাগজের মত সাদা পেডের কাগজে গৌরীদি বড়ঠাকুরকে চিঠি লিখেছিলেন। সেই পেডের কাগজের উপর আবার একটি ডানা মেলে উড়ে যাওয়া পাখীর ছাপ ছিল আর তার নীচে লেখা ছিল "যাও পাখি বোল তারে/সে যেন ভোলে না মোরে।"···এই চিঠি পড়ে আমি আর দিদি সেদিন খুব হাসাহাসি করেছিলাম।' তেমনি একটি চিঠিতে লেখা ছিল 'শ্রীচরণ-

কল্যাণেষু, আপনাকে অনেকদিন দেখিনি। আপনাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আপনি এসে মাকে যেন বলবেন না যে আপনাকে আমি চিঠি লিখেছি। আপনি বলবেন, আমি নিজেই এসেছি। গুরুজনদের প্রণাম। ছোটদের আশীর্বাদ। ইতি—গৌরী।' (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ১৪ ; উমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৫ : ৯৪)। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর লেখায় আছে, 'I always noticed a packet of papers in his breast pocket, and an embroidered hand-made fan by his pillow. He never referred to them, nor did I ask. But I could easily guess that the packet contained the few letters his wife had written to him, and that the fan was made by her.' (Chaudhuri, 1987 : 89)। গৌরীর মৃত্যুর বহুদিন পরে বারাকপুর গ্রামের প্রতিবেশিনী ন'দি গৌরীর একটি গানের খাতা বিভূতিভূষণকে দিয়েছিলেন। দিনলিপিতে আছে, 'আজ অনেক কাল পরে ন'দির কাছ থেকে গৌরীর হাতের লেখা একখানা গানের খাতা পেয়েচি! এতদিন কোথায় এখানা পড়েছিল, বা কি করে ন'দির হাতে এল—তার কোন খবর এরা দিতে পারলে না। Appropriately enough, খাতায় প্রথম গানটিই হচ্চে—ঐ নীল উজ্জ্বল তারাটি/করুণ, অরুণ তরুণ কিরণ অমিয় মাখান হাসিটি/বহুদূর জগতে গিয়েছে গো চলি প্রণয়বৃন্ত ছিঁড়িয়া/ভালবাসা সব ভুলে গেছে…' (তৃণাঙ্কুর, বি র ২ : ২৩৪-৫)।

১৯১৮ সাল বিভূতিভূষণের বি. এ. পরীক্ষার বছর। গৌরীর সঙ্গে বিয়ের সময়কার কথা জিজ্ঞাসা করলে পরবর্তী জীবনে বিভূতিভূষণ বলতেন, 'গৌরীর সঙ্গে যখন আমার বিয়ের কথা হল, তখন গৌরী কেমন দেখতে ইত্যাদি কোন কথাই আমার মনে উদয় হয়নি, শুধুমাত্র তারা আমায় পড়াবেন, ব্যাস এতেই আমি রাজী হয়েছিলাম।' কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের অবস্থা ভালো, পাত্রের পড়ার খরচ দিতে তিনি রাজি। সুন্দরী গৌরীর লেখাপড়াতেও আগ্রহ ছিল। যখন তিনি বারাকপুরে দেশের বাড়িতে থাকতেন, বিভূতিভূষণ রবীন্দ্রকাব্যগ্রন্থ, গল্পের বই নিয়ে যেতেন কিশোরী পত্নীর জন্য। বিভূতিভূষণ আর গৌরীর রাতগুলি গানে, গল্পে, কবিতায় ভরে থাকত। বাড়ির একটিমাত্র শোবার ঘর ছেলে-ছেলের বউকে ছেড়ে দিয়ে মৃণালিনী রাত্রে শুতে যেতেন সই হেমাঙ্গিনীর বাড়িতে। ধনীর কন্যা গৌরী গরিবের সংসারে অনায়াসে মানানসই হয়ে গিয়েছিলেন স্বভাবের গুণে। বারাকপুর গ্রামে সকলের মুখেই তার সুখ্যাতি (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ২১)। কিন্তু এ সুখ, এ আশ্রয় স্থায়ী হয়নি

বিভূতিভূষণের জীবনে। গৌরীর মৃত্যুর কত পরেও, গাঁয়ে কোনো নতুন বউ এলে ন'দি যদি প্রশ্ন করেন বিভূতিকে 'হ্যাঁরে, কেমন দেখলি বউ?' বিভূতিভূষণ উত্তরে বলেন, 'গৌরী যেমন নিচু মুখে সন্ধেবেলায় তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালত, পায়ে তোড়া মাথায় আঁচল তেমন মুখ আর দেখলাম কই?' (উমা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৫ : ৯৪)। 'উৎকর্ণ' দিনলিপিতে আছে, 'জন্মাষ্টমীর ঠিক তেমনি মেঘান্ধকার সন্ধ্যা—অনেক বছর আগে বারাকপুরের বাড়িতে যে রকম ছিল ১২ ভাদ্র, জন্মাষ্টমীর দিন। মণি চালে প্রদীপ দেখাচ্ছিল, গৌরী আমায় বললে—এসো, এসো, ও কিছু না—কোথায় আজ ওরা সব? কতকাল আগে এমনি বেলাটিতে আমি কত আগ্রহের সঙ্গে বাড়ি গিয়েছিলুম সে কথা মনে পড়ল।' (বি র ৪:৩৯৫)।

এমন একটি জন্মাষ্টমীও কি গেছে বিভূতিভূষণের ১৯১৮-পরবর্তী জীবনে, যেদিন ওই ১৯১৮-র জন্মাষ্টমীর স্মৃতি তাঁকে বিষাদে ব্যাকুল করেনি? ১৯৪৫ সালের ২৯ অগাস্ট দিনলিপিতে লিখেছেন, '...বহুদিন আগে...আজ অশ্বিনীবাবুর বোর্ডিং থেকে রাত্রে ভীষণ গরমে নিদ্রাহীন অবস্থায় সকালে উঠে রওনা হয়েছিলুম বারাকপুরে গৌরীর সঙ্গে দেখা করতে জন্মাষ্টমীর ছুটিতে।' (অ. র. : ২৩৮)। ১৯৩৩ সালের ২৯ অগাস্টের দিনলিপিতে আছে, 'মনে ছিল না যে এই সেই জন্মাষ্টমীর রাত্রির পরদিন। সেই বারাকপুরের ভাঙা ভিটে বাড়িতে আজ—না জানি কত গাছই গজিয়েচে!' (অ. দি. : ১৩৬)। ১৯৩৩-এর ২০ অক্টোবর বিভূতিভূষণ লিখেছেন, 'ট্রেন যখন বারাসতে এল—তখন মার্টিন লাইনের ছোট গাড়ীর দিকে চেয়ে মনে পড়ল ১৯১৮ সালে ঠিক এই দিনেই বোধ হয় আমি এখান থেকে সন্ধ্যার ট্রেনে বনগাঁ গিয়েছিলুম রবীন্দ্রনাথের "পুরাতন ভৃত্য" আবৃত্তি কর্ত্তে কর্ত্তে।' (অ. দি. : ১৬০-৬১)। 'উৎকর্ণ' দিনলিপি শুরু হওয়ার দিন যদি সত্যিই ২৫ আশ্বিন, অর্থাৎ ১৯৩৬-এর ১১ অক্টোবর হয় (বি র ৪ : ৪১৯), তবে অবশ্য সঠিক নির্ধারণ করা যায় না যে কবে বিভূতিভূষণ গৌরীকে দেখবার আগ্রহ নিয়ে বারাকপুরে ফিরেছিলেন, গৌরীর মৃত্যুর সেই বছরটিতে। 'উৎকর্ণ'র সূচনাতেই দেখছি, 'অনেককাল আগে, আজ প্রায় আঠারো বছর আগে এই দিনটিতে পূজোর ছুটি উপলক্ষ্যে গৌরীর সঙ্গে দেখা করতে বাড়ি গিয়েছিলুম, তখন নতুন বিয়ে হয়েচে, তার আগে কতকাল দেখা হয়নি। গিয়েছিলুম অবিশ্যি আগের দিন, কিন্তু দেখা হয়নি, বেশী রাত হয়ে গিয়েছিল বলে। আজই রাত্রে প্রথম দেখা হয়। সেই পূজোর সময়েই তার বাপের বাড়ী থেকে নিতে এল তাকে, আমরা পাঠিয়ে দিলুম, কিন্তু মাসখানেক পরে বাপের

বাড়িতে সে মারা গেল।' (বি র ৪ : ২৯৫)। 'হে অরণ্য কথা কও'তে বিভূতিভূষণ লিখছেন, 'গৌরীর কথা—আজ ২১শে নভেম্বর, সেই ২০ নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে এই সময় প্রথম গিয়েচি, সেই উদ্বেগ, "যতবার আলো জ্বালাতে যাই" সেই গানটার কথা। এই সময়েই সে মারা যায়।' (বি র ৭ : ৪৩৯)।

গৌরীর মৃত্যুর তারিখটি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৯১৮ সালের ২১ নভেম্বর, ১৩২৫ বঙ্গাব্দের ৬ অগ্রহায়ণ। যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় আছে, 'গৌরীদি তখন বাপের বাড়ি আছেন, সংবাদ এলো তিনি অসুস্থ। বড়ঠাকুর দেখতে গেলেন। পথে যেতে যেতে এক মুদি দোকানীর কাছে শুনলেন গৌরী মারা গেছে এবং তার শেষ কাজও সমাধা হয়ে গেছে।···ওদের বাড়িতে কলেরা দেখা দেয়, পাঁচজনের কলেরা হয়। গৌরীদির মা ও গৌরীদি দু'জনে কলেরাতেই মারা যান। অতর্কিত আঘাতের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। শ্বশুরবাড়ি না ঢুকেই তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মত বাড়ি ফিরে এলেন। মা উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন, বাড়ি আসতেই জিজ্ঞাসা করলেন, "খোকা, বৌমা কেমন আছে?"···একটু ম্লান হেসে বলেছিলেন, "গৌরী মারা গেছে মা।"' (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ২২)। চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় লিখছেন, 'বিভূতিভূষণের প্রথমা পত্নী গৌরীদেবী··· পিত্রালয়ে কলেরা রোগে দেহত্যাগ করেন। বিভূতিভূষণের শাশুড়ীও কন্যার সঙ্গে কলেরা রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান। বিভূতিভূষণ খবর পেয়ে শ্বশুরালয়ে গিয়ে আর তাঁকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পাননি।' (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯১ : ৮৩)। যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের সান্নিধ্যে এসেছিলেন তিনের দশকের শেষে। গৌরীর মৃত্যু তখন বিভূতিভূষণের খুব নিকট স্মৃতি নয়। তবে বিভূতিভূষণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অযাচিত সুযোগ তাঁরা দুজনেই পেয়েছেন। গৌরীর মৃত্যুর কারণ তাঁরা বিভূতিভূষণ অথবা তাঁর কোনো নিকটজনের মুখেই শুনে থাকবেন। অন্যদিকে, বিভূতিজীবন নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁরা যে ওই মৃত্যুর কারণ হিসেবে কলেরার বদলে নিমোনিয়া (সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৭০ : ১৫) অথবা ইনফ্লুয়েঞ্জা (কিশলয় ঠাকুর, ১৯৭৮ : ৫৬) কোন সূত্রে জানলেন, তা বোঝা যায় না। আর ১৯১৮তে বা তার কাছাকাছি সময়ে বিভূতিভূষণের নিকটজন যাঁরা ছিলেন, যেমন নীরদচন্দ্র চৌধুরী, তাঁদের লেখায় গৌরীর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ কারণটির উল্লেখ নেই। কিশোরী গৌরীর মৃত্যুর মর্মান্তিক সত্যকে পেরিয়ে সে মৃত্যুর হেতু কখনোই মুখ্য হয়ে ওঠে না। কলেরা কি নিমোনিয়া কি ইনফ্লুয়েঞ্জার কোনো একটি

যদি নির্ভুল হয়, অথবা তিনটিই যদি হয় ভুল. তাহলেও কি যায়-আসে কিছু? বিশেষত এমনি এক মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে? যে মরণ বিভূতিজীবনকে বিষাদ আর অপূর্ণতার অনুভবে বারেবারে দীর্ণ করেছে?

গৌরীর মৃত্যুর অল্প পরেই মারা গেলেন বিভূতিভূষণের ছোটবোন মণি, যার ভালো নাম সরস্বতী। সরস্বতীর বিয়ে হয়েছিল বনোয়ারিলাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বিয়ের পর খুব কম দিনই সরস্বতী জীবিত ছিলেন. কোনো সন্তানও তিনি রেখে যাননি (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ১৫)। মেয়ের শোকে, বউমার শোকে কাতর মৃণালিনী ছোট ছেলে নুটুবিহারীকে নিয়ে আছেন বারাকপুর গ্রামে, বিভূতিভূষণ কলকাতায়। ১৯১৮ সালে ডিস্টিংশনে বি.এ. পাস করেছেন বিভূতিভূষণ। এম.এ. ক্লাসেও কিছুদিন গেছেন, যাতায়াত করেছেন ল' কলেজেও। যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় আছে, এম.এ.তে বিভূতিভূষণের বিষয় ছিল দর্শন; আবার পরিমল গোস্বামীকে নাকি বিভূতিভূষণ ইংরেজিতে এম.এ. পড়বার কথা বলেছিলেন (যুগান্তর সাময়িকী, রবিবার, নভেম্বর ১২, ১৯৫০)। যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও লিখেছেন, 'শুনেছি গৌরীদি বেঁচে থাকতেই বড়ঠাকুর বি-এ পরীক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু বড়ঠাকুরের পাশ করার খবর গৌরীদি শুনে যেতে পারেননি।...গৌরীদির বাবার কাছে পড়ার জন্য যে টাকা নেওয়ার কথা ছিল বোধহয় উনি কোনদিন তা নেন নি, কারণ এ সম্বন্ধে আমার শ্বশুর পরিবারে আর কারো কাছে কখনো কোন কিছু শুনিনি, বরং বড়ঠাকুর আর্থিক অনটনের কথাই বলতেন।' (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ২২)। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর লেখাতেও আছে যে, বিভূতিভূষণের কাছে তিনি শুনেছেন, এম.এ. পড়া বিভূতিভূষণকে অর্থাভাবেই ছাড়তে হয়েছিল (Chaudhuri, 1987 : 86)। গৌরীর মৃত্যুর পরে কলকাতায় যে ক'দিন ছিলেন, বিভূতিভূষণের দিন ছাত্র পড়িয়েই চলত। 'উৎকর্ণ' দিনলিপিতে আছে, '১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে আমি মীর্জাপুর স্ট্রীটের একটা উড়ে ঠাকুরের হোটেলে দিনকতক খেতুম। উড়ে ঠাকুরটার নাম সুন্দর ঠাকুর।...১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে আমার জীবনে বড় শোকাবহ দুর্দ্দিন–হাতে নেই পয়সা, মনেও যথেষ্ট অবসাদ ও হতাশা। গৌরী সেবার মারা গিয়েচে। সুন্দর ঠাকুরের দোকানে রাত্রে গিয়ে লুচি খেতুম–কোথা থেকে যে দাম দেব না ভেবে খেয়েই যাচ্ছি...তারপর সুন্দর ঠাকুরের হোটেল উঠে গেল, সেখানে অন্য কি দোকান হল। আমিও চলে গেলুম কলকাতার বাইরে।' (বি র ৪ : ৩৪৬)।

নাবালকের বিস্ময় সাবালকের অর্জন

১৯১৯-এ একদিন 'সকালে উঠে শিয়ালদহে ট্রেনে চড়ে ৬০, মির্জাপুরের কাছে শেষ রাত্রির জ্যোৎস্নায় বিদায় নিয়ে ভোরের বাতাসে কচিপাতা ওঠা বসন্ত দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে রওনা' হয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। সঙ্গে ছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অযাচিত বদান্যতার সম্পদ, সামনে ছিল হুগলির জাঙ্গিপাড়ায় অজানা ভবিষ্যৎ (স্মৃতির রেখা, বি র ১ : ৪২১)। এই ঘটনার এক দশক বাদে লেখা হবে সেই 'অপরাজিত', যে উপন্যাসের নাম প্রথমে বিভূতিভূষণ দেবেন 'আলোক-সারথি', তারপর বদলাবেন, পাবেন 'অপরাজিত'কে। সে উপন্যাসে বিভূতিভূষণের অপু অপর্ণার মৃত্যুর আঁধারে কলকাতা ছাড়ে। চলে যায় চাঁদনির কাছে চাপদানিতে. স্কুলমাস্টার হয়ে। অপর্ণা তো তবু নিজের রেশটুকু রেখে গিয়েছিল কাজলে। সেই কাজলের হাত ধরেই অপু আবার একদিন তার নিশ্চিন্দিপুরে ফিরবে। কাজলের অনাহত বাল্যের নিশ্চিতিতে ভর করেই, অপুর স্রষ্টা উপন্যাসের নামকরণে 'অপরাজিত'র ভরসা পেয়ে যান। কিন্তু ১৯১৮-১৯-এ বিভূতিভূষণ সম্পূর্ণ একা, কী বারাকপুরে, কী জাঙ্গিপাড়ায়, কী কলকাতায়। ১৯৪০-এর গার্হস্থ্য অথবা ১৯৪৭-এর পিতৃত্ব তখন বিভূতিভূষণের স্বপ্নেরও নাগালে আসে না। এ বিষাদ, এ শূন্যতা মায়ের সঙ্গে তেমনভাবে ভাগ করে নেওয়া যায় না। মৃণালিনী তো নিজেই আকুল গৌরীর শোকে, মণির শোকে। আর নুটুবিহারী তো তখন নেহাতই নাবালক। এই সময়েই পরলোকতত্ত্বের দিকে প্রথম মন গেল বিভূতিভূষণের। চক্রাধিবেশনে আত্মাকে ডাকা, থিওসফিকাল সোসাইটিতে যাতায়াত, প্যারীচাঁদ মিত্রের 'অন দ্য সোল' পড়তে পড়তে শূন্য মনের আশ্রয় খোঁজা, এসব তখনকারই ঘটনা।

১৯১৯ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি বিভূতিভূষণ কলকাতা ছেড়ে রওনা হলেন হুগলির জাঙ্গিপাড়ায়। ৭ ফেব্রুয়ারি যোগ দিলেন জাঙ্গিপাড়ার দ্বারকানাথ হাইস্কুলে সহকারী প্রধানশিক্ষকের কাজে, মাসিক বেতন পঞ্চাশ টাকা। কলকাতার মেস-বাসকালে বৃন্দাবন সিংহরায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাঁর দেশ হুগলির জাঙ্গি-পাড়া। আইন পরীক্ষা দিয়ে দেশে গিয়েছিলেন বৃন্দাবন। সেখানে সম্পন্ন ব্যবসায়ী মাখনলাল দের অনুদানে মাখনলালের পিতার নামে গড়ে উঠছে দ্বারকানাথ হাইস্কুল। তখনও দশম শ্রেণী হয়নি। বিদ্যায়তনটি গড়ে তুলতে

বৃন্দাবন সিংহরায় নিজেই নিয়েছেন অস্থায়ী প্রধানশিক্ষকের দায়িত্ব। কী কাজে যেন কলকাতায় আসতে হয়েছিল তাঁকে। বিভূতিভূষণের প্রথম চাকরির যোগাযোগটি তিনিই করে দিলেন। চাকরির মেয়াদ অবশ্য খুব দীর্ঘ হল না, মাত্র একবছর তিনমাস। ১৯২০ সালের ৩১ মে বিভূতিভূষণ জাঙ্গিপাড়ার স্কুলের কাজে ইস্তফা দিলেন। যখন তিনি পড়াতে গিয়েছিলেন সেখানে, তার অল্পদিন আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী স্কুলটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন। স্কুলে তো পড়াবেনই বিভূতিভূষণ, তাছাড়া বিদ্যালয়ের সভাপতি শশিভূষণ দীর্ঘাঙ্গীর পুত্র সমরেন্দ্রকে বাড়িতে পড়াবেন—সেখানেই হবে আহার এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা। জাঙ্গিপাড়ায় নৃসিংহ ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারি, হাটের ময়রা ফকির মোদকের বাড়ি, সর্বত্রই থাকবার জন্য অবারিত দ্বার বিভূতিভূষণের কাছে। কিন্তু আছেন রাজকুমার ভড় এম.এ., বলা চলে বিভূতিভূষণের প্রতিযোগী এই দ্বারকানাথ হাইস্কুলে। বৃন্দাবন সিংহরায়ের ইচ্ছা, বিভূতিভূষণকে প্রধানশিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত করে চলে যাবেন আইনব্যবসায়। কিন্তু ওই পদে রাজকুমার ভড়েরও বড় আকাঙ্ক্ষা। জাঙ্গিপাড়ার স্থানীয় লোক তিনি, শিক্ষাগত যোগ্যতাও বিভূতিভূষণের থেকে বেশি। শেষ পর্যন্ত রাজকুমারই জিতলেন। ছাত্রদের আকুলতা, প্রতিরোধ, বন্ধু বৃন্দাবন সিংহরায়ের অস্বস্তি, বিষাদ, সব সত্ত্বেও সহকারী প্রধানশিক্ষক থেকে পদাবনত অস্থায়ী সাধারণ শিক্ষক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় জাঙ্গিপাড়া ছেড়ে চলে গেলেন ১৯২০-র মে মাসের শেষে (সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৭০ : ১৬-৭ ; কিশলয় ঠাকুর, ১৯৭৮ : ৫৯-৬৭)। অনেকদিন পরে জাঙ্গিপাড়ায় গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ, ডায়েরিতে তখন লিখেছিলেন, '…রাজকুমার ভড় জীবনে বড় বন্ধু ছিল, তার জন্যেই এখান থেকে যাওয়া, সে না থাকলে হয়তো এতদিন পরে এখনও জাঙ্গিপাড়ায় সম্পন্ন গৃহস্থ হয়ে বসে থাকতাম।' (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৩১৩)।

১৯২০ সালে অবশ্য এমন কথা বলা কিংবা ভাবা, কোনোটাই সম্ভব ছিল না বিভূতিভূষণের পক্ষে। বাড়িতে ছোট ভাই নুটুবিহারী আছে, আছে তার লেখাপড়া, মা মৃণালিনী আছেন। কী হবে মহানন্দ কথকের ফেলে যাওয়া সংসারটার, যদি ইংরেজি শিক্ষিত বিভূতিভূষণের রুজির কোনো উপায় না থাকে? প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য তখন স্বগ্রাম সোনারপুর-হরিনাভিতে অ্যাংলো স্যান্‌সক্রিট ইন্‌স্টিটিউশনের সেক্রেটারি। শিক্ষাগুরু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সুপারিশের পরে চারুচন্দ্রের কাছে আর সব কথাই গৌণ। স্কুলকমিটির

সভাপতি অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় চারুচন্দ্রের চিঠিতে সব জানলেন। তিনি বিভূতিভূষণকে নিতে সম্মত, কেবল একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাবের অপেক্ষা। বিভূতিভূষণ দরখাস্ত করলেন। এই স্কুলে বিভূতিভূষণের চাকরির মেয়াদ ১৯২০-র ২১ জুন থেকে ১৯২২-এর ১৭ জুলাই। সহকারী শিক্ষকের চাকরি, প্রারম্ভিক বেতন মাসিক পঞ্চাশ টাকা, বছরে দু'টাকা করে বেড়ে ষাট টাকা পর্যন্ত যেতে পারে। অ্যাংলো স্যানসক্রিট ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠাতা সোমপ্রকাশ-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। কাশীবাসী হওয়ার আগে স্কুলের দায়িত্ব তিনি দিয়ে যান শিবনাথ শাস্ত্রীকে। শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রধানশিক্ষকতার আমলে সহকারী প্রধানশিক্ষক ছিলেন প্রকাশচন্দ্র রায়। পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বনামধন্য চিকিৎসক বিধানচন্দ্র রায় প্রকাশচন্দ্রেরই পুত্র।

শিবনাথ শাস্ত্রীর উদ্যোগে হরিনাভিতে গড়ে উঠেছিল দাতব্য চিকিৎসালয় —বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ম্যালেরিয়ায় ভুগছে, প্রতিকার চাই। হয়েছে পৃথক মিউনিসিপ্যালিটি, শিবনাথ শাস্ত্রীর ধর্মসভায় এসেছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব-চন্দ্র সেন। উমেশচন্দ্র দত্ত পড়িয়েছেন এই স্কুলে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় অ্যাংলো স্যানসক্রিট ইনস্টিটিউশনের ছাত্ররাই একবার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে হরিনাভিতে নিয়ে এসেছিলেন। এই স্কুলেরই ছাত্র নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং হরিকুমার চক্রবর্তীর নাম ছিল স্বদেশী আন্দোলনের নেতা হিসেবে। নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীই পরবর্তী কালের বন্দিত বিপ্লবী মানবেন্দ্র বা এম. এন. রায়। ১৯২০ সালে বিভূতিভূষণ যখন এই স্কুলে পড়াতে আসেন, তখনকার প্রধানশিক্ষক কিশোরীলাল ভাদুড়ী। কিশোরীলালের শ্বশুর নগেন্দ্রনাথ বাগ্‌চীর বাড়িটা রাজপুরে খালি পড়েছিল। বিভূতিভূষণের থাকার জন্য সে বাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন কিশোরীলাল। কিছুদিন অবশ্য জ্ঞান লাহিড়ীর বাড়িতেও ছিলেন বিভূতিভূষণ। কিন্তু সাংসারিক পরিবেশের বন্ধন থেকে দূরেই থাকতে চাইছিলেন। চক্রে আত্মার সঙ্গে কথোপকথন, আশেপাশের বনেবাদাড়ে ঘোরা, সবের পক্ষেই ওই দূরত্ব সুবিধাজনক। ইতিমধ্যে আবার জ্ঞান লাহিড়ীর ভাইঝি ফুলি মাস্টারকাকুর যৎসামান্য জিনিসপত্রের মধ্যে আবিষ্কার করেছে কয়েকটি চিঠি; লিখেছেন যিনি, নাম তাঁর গৌরী। সঙ্গে কয়েকটা বাসি ফুলের পাপড়ি। হরিনাভিরই মেয়ে জ্যোতিপ্রভার কাছে ফুলির মা নিভাননী জানতে পেরেছেন, বিভূতিভূষণের অতীত জীবনের কিছু কাহিনী, এমনকী মানুষটা যে চক্রে বসে আত্মা আনে, কথাবার্তা বলে গৌরীর সঙ্গে, সেই কথাও।

আসলে এই জ্যোতিপ্রভা বিভূতিভূষণের কলকাতার বন্ধু ননীমাধবের স্ত্রী। মেসের বন্ধু ননীমাধব বিভূতিভূষণেরই সুপারিশে চাকরি নিয়ে এসেছিলেন হরিনাভির স্কুলে। ঘটনাচক্রে এ জায়গাতেই তার শ্বশুরবাড়ি জুটে গেল। ননী-মাধবের সঙ্গে বিভূতিভূষণের জানাশোনা আজকের নয়। ১৯১৯ সালে যখন কলকাতা ছেড়ে প্রথম চাকরি নিয়ে জাঙ্গিপাড়ায় গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ, ননীমাধব গিয়েছিলেন বন্ধুকে পৌঁছে দিতে। বিভূতিভূষণের দুঃখশোকের বেশ অনেকখানিই ননীমাধবের জানা, স্বামীর কাছে জেনেছেন জ্যোতিপ্রভা। সেই সূত্রে জানলেন নিভাননী (কিশলয় ঠাকুর, ১৯৭৮ : ৬৭-৭৫)। এই ননীমাধব, জ্যোতিপ্রভাদের কথা আছে 'উর্মিমুখর' দিনলিপিতে, 'আজ ৩২শে শ্রাবণ বলেই মনটা মাঝে মাঝে অনেক দূরে চলে যাচ্ছিল···জতু দেখলুম মনে করে রেখেচে, সে ননীকে বললে—কোন্ গানটা গাওয়া যেত না বিভূতির সামনে, মনে আছে? ননীরও মনে আছে। সে বললে—জানি : "সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে" এই গানটা। আমি হাসলুম। এরা বেশ লোক। আমার জীবনের কতদিন আগেকার কথা এরা কেন মনে রেখেচে, কি দরকার এদের!' (বি র ৩ : ৫৪৮)। সত্যিই, ১৯১৮ থেকে 'উর্মিমুখরে'র ১৯৩৫-৩৬ অনেকখানি সময়!

হরিনাভিতে স্কুলে পড়ানোর সময়েই ১৯২১ সালে কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন বিভূতিভূষণ। ১৯১৫তে রবীন্দ্রনাথকে যখন প্রথম দেখেছিলেন সেন্ট পল্স কলেজের হোস্টেলের মাঠে, তখনকার বর্ণনা দিতে বিভূতিভূষণ লিখেছেন, 'সেদিন সেণ্টপল্স হোস্টেলের মাঠে কিন্তু তেমন ভিড় হয় নি, অন্তত যেমন ভিড় দেখেছিলুম ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে তাঁর বক্তৃতার সময়, ইউরোপ থেকে তাঁর প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরেই কৌতূহলী জনতার চাপে ইনস্টিটিউটের দরজা ও রেলিং সেদিন ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল।' (প্রথম দর্শন, বি র ১২ : ৩৫৫)। হরিনাভিতে থাকাকালীন আর একবার কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে আসবার সময়, শিয়ালদহ স্টেশনে পায়ের উপরে মুটের বোঝা পড়ে বিভূতি-ভূষণের পায়ের লিগামেণ্ট ছিঁড়েছিল। হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল প্রায় দিন পনেরো। ফুলি, নিভাননী, জ্যোতিপ্রভা থেকে শুরু করে অনুগত ছাত্ররা সবাই তাঁর দেখাশোনা করেছিল। নিভাননীবৌদির অনুরোধে মাকে হরিনাভিতে নিয়ে আসেন বিভূতিভূষণ। নুটুবিহারী তখন বনগ্রামে বোর্ডিং-এ থাকেন। নুটুকে নিয়ে বারাকপুরের ভিটা ছেড়ে মৃণালিনী এলেন বড়োছেলের

কাছে। নগেন্দ্রনাথ বাগ্‌চীর রাজপুরের বাড়িতেই মৃণালিনী ছিলেন। মা-বৌদির দল স্বভাবতই চান, আবার সংসারী হন এই একাকী মানুষটি। কিন্তু তা আর দেখা হল না মৃণালিনীর। স্বামীর ভিটে ছেড়ে আসার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। এসেছিলেন বড়োছেলের অনুরোধে, কিছুটা ছেলের সুবিধার জন্য। বারাকপুর গ্রামে আর ফেরা হল না তাঁর। রাজপুরেই তাঁর টাইফয়েড হল, চলে গেলেন ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (কিশলয় ঠাকুর. ১৯৭৮ : ৭৪-৫, ৭৯)।

ছেলেকে আবার সংসারী দেখে যেতে গেলে অবশ্য অন্তত আরও উনিশ বছর বাঁচতে হত মৃণালিনীকে! কিন্তু একটি অসামান্য সূচনা আর মাসকয়েক থাকলেই দেখতে পেতেন তিনি। দেখলেও তিনি নিশ্চয় সম্পূর্ণ বুঝতেন না সে সূচনার গুরুত্ব। কজন পাঠকই বা বুঝেছিলেন 'প্রবাসী' পত্রিকার মাঘ ১৩২৮ সংখ্যায় নতুন লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "উপেক্ষিতা" গল্পটি পড়ে যে কী সম্পদ বাংলাসাহিত্যে গ্রথিত হবে আর মাত্র কয়েকবছরের মধ্যে? ১৯২২ সালের ২৫ জানুয়ারি, 'প্রবাসী'তে "উপেক্ষিতা" পড়বার পরে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় চিঠি লিখেছিলেন বিভূতিভূষণকে. 'তোমার গল্পটি বড়ই মনোরম হইয়াছে। রচনা যেমন সুললিত তেমনি প্রাঞ্জল। পড়িতে আরম্ভ করিলে আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। দুঃখ হয় যে শীঘ্র ফুরাইয়া গেল। রুচিও সুমার্জিত। তুমি চেষ্টা করিলে এ বিষয়ে সুনাম অর্জন করিতে পারিবে।' কিন্তু সে সুনাম যে 'পথের পাঁচালী'কারের তুলনীয় সুনাম, তা কি প্রফুল্লচন্দ্রেব কল্পনায় ছিল? কেমন করে হঠাৎ গল্পলেখক হলেন বিভূতিভূষণ? হলেন সোনারপুর-হরিনাভির বালক কবি পাঁচুগোপাল চক্রবর্তীর আসল নাম যতীন্দ্রমোহন রায়) তাড়নায়। নিজে সে কবিতা লেখে, তাদের গ্রাম থেকে 'বিশ্ব' বলে যে পত্রিকা বেরোয়, সেখানে "মানুষ" নামে কবিতা লিখেছে পাঁচুগোপাল। বিভূতিভূষণের লেখা থেকে মনে হয়, অ্যাংলো স্যানসক্রিট ইনস্টিটিউশনে পড়ানোর সময় হরিনাভি-রাজপুরের প্রবাসে পাঁচুগোপাল বিভূতিভূষণের দেখা এমন একজন মানুষ, যার সঙ্গে গ্রন্থাগার, গ্রন্থ, সাহিত্য, এসব নিয়ে কিছুদূর বিনিময় সম্ভব। এইসময় নাকি কলকাতার কোন্ প্রকাশক ছয়-আনা গ্রন্থাবলী বের করার উদ্যোগ নিল, প্রথম লেখক রবীন্দ্রনাথ। স্থানীয় পাঠাগার থেকে সে বই নিয়ে এসে পাঁচুগোপাল দিল বিভূতিভূষণকে; সঙ্গে সঙ্গে জানাল, ডিটেকটিভ উপন্যাস ছাড়া লাইব্রেরি অচল—রবীন্দ্রনাথের বইয়ের জন্য দু'আনা চাঁদা পাঠকেরা নাও দিতে পারে।

এরপরই বালক-কবির সেই প্রস্তাব, '···আসুন আপনাতে আমাতে এই রকম উপন্যাস সিরিজ বের করা যাক। খুব বিক্রি হবে···আপনি যদি ভরসা দেন, আমি উঠে পড়ে লাগি।···বই লিখবেন আপনি, আমিও দু-একখানা লিখব। পরকে টাকা দিতে যাব কেন···আপনি যখন বি-এ পাস, তখন আপনার কাছে এমন কিছু কঠিন হবে না।' কলেজ ম্যাগাজিনে দু-একটা প্রবন্ধ, কবিতা, বিবাহের প্রীতি উপহার কবিতা, এসব ছাড়া বিভূতিভূষণ তখনও কিছুই লেখেননি। কিন্তু বি. এ. ডিগ্রির উপর পাঁচুগোপালের অগাধ শ্রদ্ধা। তাই দশ দিনের মধ্যে স্কুলের নোটিস-বোর্ডে, দেওয়ালের গায়ে, নারকেল গাছের গুঁড়িতে ছাপানো কাগজের ছড়াছড়ি 'বাহির হইল! বাহির হইল!! বাহির হইল!!! এক টাকা মূল্যের গ্রন্থমালার প্রথম উপন্যাস!' লেখকের নাম অবশ্যই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাভাবিক যে ছাত্রশিক্ষক সকলেরই এক জিজ্ঞাসা, 'আপনি লেখক তা তো এতদিন জানতাম না মশাই? বেশ! তা বইখানা কি বেরিয়েছে নাকি? আমাদের একবার দেখিয়ে যাবেন।' পাঁচুগোপাল বিভূতিভূষণের প্রকাশিতব্য না-লেখা উপন্যাসটির নামও ঠিক করে ফেলেছিল 'চঞ্চলা'। হেডমাস্টারমশাই কিশোরীলাল ভাদুড়ী স্কুল-লাইব্রেরির জন্য অগ্রিম একখানা বই চেয়ে রাখলেন। পাঁচুগোপাল বিভূতিভূষণের ধমক খেয়ে হাসল, যেন তার কাজটাই স্বাভাবিক, বকুনিটা অকারণ। বই নিয়ে চতুর্দিকের অনুসন্ধিৎসায় বিভূতিভূষণ যেন মরিয়া হয়ে উঠলেন—পাঁচুর টাকা নেই, একটাকার সিরিজ সে কোনোদিনই বের করতে পারবে না। একটা গল্প নিজের খাতায় লেখা থাকুক—'লোকে যদি দেখতে চায়, খাতাখানা দেখিয়ে বলা যাবে আমার তো লেখাই রয়েছে, ছাপা না হলে আমি কি করব।'

বিভূতিভূষণের কথায়, 'কিন্তু লিখি কি? জীবনে কখনও গল্প লিখি নি, কি করে লিখতে হয় তাও জানা নেই। কি ভাবে প্লট যোগাড় করে, কি কৌশলে তা থেকে গল্প ফাঁদে—কে বলে দেবে? ···মন তখন বিশ্লেষণমুখী অভিব্যক্তির পথ খুঁজে পায় নি। সব কিছুতেই সন্দেহ, সব কিছুতেই ভয়···সেই পল্লীগ্রামে একটি ছায়াবহুল নিভৃত পথ দিয়ে শরতের পরিপূর্ণ আলো ও অজস্র বিহঙ্গকাকলীর মধ্যে প্রতিদিন স্কুলে যাই, আর একটি গ্রাম্য বধূকে দেখি পরিপার্শ্বের একটি পুকুর থেকে জল নিয়ে কলসী কক্ষে প্রতিদিন স্নান করে ফেরেন। প্রায়ই তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়—কিন্তু দেখা ওই পর্যন্ত। তাঁর পরিচয় আমার অজ্ঞাত এবং বোধ হয় অজ্ঞাত বলেই একটি রহস্যময়ী মূর্তিতে তিনি আমার মানসপটে

একটা সাময়িক রেখা অঙ্কিত করেছিলেন। মনে মনে ভাবলাম এই প্রতিদিনের দেখা অথচ সম্পূর্ণ অপরিচিত বধূটিকে কেন্দ্র করে একটি গল্প আরম্ভ করা যাক তো, কি হয় দেখি! গল্প শেষ করে সেই গ্রামের দু-একজনকে পড়ে শোনালাম পাঁচুকেও। কেউ বলে ভাল হয়েচে, কেউ বলে মন্দ হয় নি। আমার একটি বন্ধুকে কলকাতা থেকে নিমন্ত্রণ করে গল্পটি শুনিয়ে দিলাম। সেও বললে ভাল হয়েচে। আমি তখন একেবারে কাঁচা লেখক···যে আত্মপ্রত্যয় লেখকের একটি বড় পুঁজি, আমি তখন তা থেকে বহু দূরে, সুতরাং অপরের মতামতের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে উপায় কি। আমার কলকাতার বন্ধুটির সমঝদারিত্বের ওপর আমার শ্রদ্ধা ছিল···।'

তারপর কলকাতায় গিয়ে 'প্রবাসী' অফিসে লেখাটি জমা দেওয়া। অমনোনীত হলে লেখাটি ফেরত আসবে জেনে, গ্রামের ডাকঘরে চুপিচুপি বলা যে, বুকপোস্ট গোছের কিছু বিভূতিভূষণের নামে এলে কখনোই যেন স্কুলে সকলের সামনে বিলি না করে। স্কুলের সহকর্মী আর পরিচিত মহলে ঘোষণা যে, লেখা শীগগির ছাপা হবে। বুকপোস্ট এল, গল্পটি মনোনীত হয়েছে, সামান্য কিছু রদবদল করে পাঠাতে বলেছেন। 'প্রবাসী' লেখা ছাপছে, এমন চিঠি অখ্যাত কোন্ এক বিভূতিভূষণ যখন দেখান, তখন অনেকেই বলেন, 'কারু সঙ্গে আপনার আলাপ আছে বুঝি ওখানে?' এই হল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প "উপেক্ষিতা"র নির্মাণ-কাহিনী (আমার লেখা, বি র ১ : ৪২৭-৩২)। এই সব কথাই বিভূতিভূষণ বলেছিলেন রেডিয়োতে "কি করে লেখক হলাম" শীর্ষক কথিকায়। ১৪০১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত আফিফ্ ফুয়াদ সম্পাদিত 'দিবারাত্রির কাব্য' পত্রিকার বিভূতিভূষণ সংখ্যায় "পাঁচুগোপালের ডায়েরি" নামে যতীন্দ্রমোহন রায়ের যে স্মৃতিকথা আছে (৯-৪৯), সেখানকার কাহিনী বিভূতিভূষণের নিজের বলা গল্পের থেকে অভিন্ন নয়। গোপাল হালদার লিখেছেন, 'বিভূতিভূষণ রেডিওতে বলেছিলেন "কি করে লেখক হলাম"। সে গল্পটি সুন্দর; হয়তো বা সত্য। কিন্তু নীরদচন্দ্রের নিকট শুনেছিলাম আর এক গল্প,—অনেকের মতই বিভূতিভূষণ ছেলেবেলায় বাংলা লিখতেন, পরে অনেকদিন লেখেন নি। কিন্তু অন্য একজন ওই নামের লেখকের লেখা কোন মাসিক-পত্রে বেরোয়। বিভূতিভূষণ তাঁর ছোট বোনের (?) কাছে গল্প করেন, তা তাঁর লেখা। আর বোনের সঙ্গে তর্ক করে তারপর লিখলেন তাঁর প্রথম গল্প।···হয়তো এ গল্পও তাঁর বানানো। কিন্তু মিথ্যা নয় পুঁইমাচার অন্তরস্থ জীবনানুভূতি, ঐটিই তাঁর আপন জীবনোপলব্ধি।

পূর্বাপর শত অসঙ্গতি, শত তুচ্ছতা, শত সামান্যতা সত্বেও জীবনলাবণ্যে ভরপুর বিভূতিভূষণের মধ্যে জীবনের এই নির্মল লাবণ্যকে আমরা, তাঁর বন্ধুরা, যথেষ্ট আস্বাদন করেছি।' (গোপাল হালদার, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ ব : ২১১)। বিভূতি-জীবনের আর বিভূতিসাহিত্যের পরম সত্যকে, সেই ১৯৫০ সালেই গোপাল হালদার কত অনায়াসে চেনাতে চেয়েছিলেন।

ওই যে "পুঁইমাচা"র উল্লেখ আছে গোপাল হালদারের লেখায়, তা লেখা হতে হতে তো ১৯২২ সালের পরে আরো ক'বছর কেটে গেছে। "উপেক্ষিতা" 'প্রবাসী'তে বেরোনর পরে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা হলে বিভূতি-ভূষণের সঙ্গে 'প্রবাসী'র চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখা। সেদিন ছিল অবনীন্দ্রনাথের বক্তৃতাসভা। চারুচন্দ্র বিভূতিভূষণের কাছে 'প্রবাসী'র জন্য আরও গল্প চাইলেন। ১৯২২-এই, অর্থাৎ ১৩২৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় 'প্রবাসী' ছাপল বিভূতিভূষণের দ্বিতীয় গল্প "উমারাণী"। ১৯২২ সালে অ্যাংলো স্যানস্ক্রিট ইনস্টিটিউশনের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পরে বিভূতিভূষণ কিছুদিন ছিলেন কলকাতায় ৪১ মির্জাপুর স্ট্রিটের মেসবাড়িতে। সেই মেসেরই আর একজন আবাসিক নীরদচন্দ্র চৌধুরী। রিপন কলেজে যখন বিভূতিভূষণ এবং নীরদচন্দ্র দুজনেই পড়তেন, তখন তাঁদের তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তখন ছিল পরিচয় মাত্র, আর ৪১ মির্জাপুর স্ট্রিটে থাকবার সময়েই সে পরিচয় একান্ত নিকট বন্ধুত্বের অবয়ব পেল। এই সেই সময়, যখন পাঁচজনে নীরদচন্দ্র আর বিভূতিভূষণকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন, জীবনে তাঁদের বিশেষ কিছু হবে না বলে। দুই বন্ধুর কেউই তখন বিশেষ কিছু করেন না, লেখাপড়া নিয়ে থাকেন। প্রথম যেদিন ৪১ মির্জাপুর স্ট্রিটের মেসে বিভূতিভূষণের সঙ্গে নীরদচন্দ্রের দেখা হয়, তখনও বিভূতিভূষণ হরিনাভির স্কুলে পড়ান। তার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এক বিকেলে বিভূতিভূষণ যথেষ্ট গর্বিত মুখে নীরদচন্দ্রের মেসের ঘরে এসে ঢুকলেন, গলায় গাঁদা ফুলের মালা। বললেন অ্যাংলো স্যানস্ক্রিট ইনস্টিটিউশনের বিদায় সংবর্ধনা নিয়ে, সোজা সেখান থেকে আসছেন। নীরদচন্দ্র শুনে অবাক যে, বিভূতিভূষণ কোনো উন্নততর জীবিকার সন্ধান পেয়ে ওই কাজ ছেড়েছেন, এমন নয়। বরং এখন তিনি যথার্থই কর্মহীন, কোনো চাকরি নেই। কেন তবে হরিনাভির স্কুলের কাজটি ছেড়ে দিলেন বিভূতিভূষণ?

সে কাহিনী বলতে গিয়ে নীরদচন্দ্র লিখেছেন, 'I would make it clear at this point that whatever I am writing about Bibhuti Babu is being

given from my own first-hand knowledge or from accounts given by him immediately after the events. I have completely ignored other accounts, because I have found that his recollection was not always exact after some time had passed, and others gave differing accounts.' হরিনাভির স্কুলে ইস্তফা দেওয়ার এক কাহিনী নীরদচন্দ্র বিভূতিভূষণের কাছে শুনেছিলেন। ওই গ্রামে স্থানীয় এক ব্রাহ্মণপরিবারে বিভূতিভূষণের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। পরিবারের একটি কিশোরী তাঁর সেবাযত্নের ব্যাপারে খুব বেশি মনোযোগী হয়ে পড়ল। বিভূতিভূষণ স্কুলে চলে গেলে, মেয়েটি এসে তাঁর ঘর পরিষ্কার করে দিত। তাঁর আরামের জন্য যা আয়োজন সম্ভব, সবই সে করত। বিভূতিভূষণকে নিয়ে মেয়েটি এমন অনুভবের জগৎ বানাতে শুরু করল, যাকে প্রেম বললে অত্যুক্তি হয় না। বিভূতিভূষণকে সে চিঠি লিখত। সে চিঠি নীরদচন্দ্র পড়েছেন। সংখ্যায় গোটাদশেক হবে। সেখানে ভালোবাসার কথা প্রত্যক্ষে থাকত না। কিন্তু যা থাকত, তার থেকে ভালোবাসা খুঁজে না-পাওয়া অসম্ভব। নীরদচন্দ্রের মনে হয়েছিল, এর চেয়ে সরল, শুদ্ধ এবং বিশ্বস্ত কোনো চিঠি তিনি আগে পড়েননি। চিঠি জুড়ে কেবল চিঠির প্রাপককে সেবা করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা – পত্রলেখিকা যেন বলছে, তোমার দাসীকে গ্রহণ করো। মেয়েটি যদিও ব্রাহ্মণ, তবে তেমন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নয়, যাদের সঙ্গে বিভূতিভূষণদের কোনো পারিবারিক কুটুম্বিতা সম্ভব। সুতরাং সে যুগে এ ক্ষেত্রে বিয়ের প্রশ্ন ওঠে না। পরিস্থিতির জটিলতা যাতে আর না বাড়ে, তারই জন্য বিভূতিভূষণের হরিনাভি ছেড়ে আসা। (Chaudhuri, 1987 : 92)। কে এই মেয়েটি ? সে কি জ্ঞান লাহিড়ীর ভাইঝি ফুলি, যার ভালো নাম অন্নপূর্ণা ? মাস্টারকাকুর জামার পকেটে যে ফুলের পাপড়িতে ঢাকা চিঠি আবিষ্কার করেছিল, যেসব চিঠির লেখিকা গৌরী ? ফুলির সঙ্গে পরবর্তী জীবনে যতবার দেখা হয়েছে বিভূতিভূষণের, তাদের বিনিময়ে প্রসাদের কোনো ঘাটতি ছিল না।

৪১ মির্জাপুর স্ট্রিটের মেসবাড়িতে নিজের ঘরের উপরের ঘরটিতে নীরদচন্দ্র বিভূতিভূষণের থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। বারাকপুর গ্রামে কল্যাণীর সঙ্গে স্থায়ী সংসার পাতার আগে পর্যন্ত কলকাতার ৪১ মির্জাপুর স্ট্রিটের এই প্যারাডাইস লজই ছিল বিভূতিভূষণের পাকা ঠিকানা। সাময়িক অনুপস্থিতি ঘটেছে কখনও ভ্রমণের জন্য, কখনও সভাসমিতির সূত্রে কি কাজের সূত্রে বাইরে বাইরে যাওয়া এবং দীর্ঘকাল থাকার জন্য, অথবা সপ্তাহান্তে কি দীর্ঘতর ছুটিতে বারাকপুর গ্রামে

ফিরবার জন্য। অ্যাংলো স্যানস্‌ক্রিট ইনস্টিটিউশনের চাকরি ছাড়ার পরে বিভূতিভূষণের কর্মহীনতা অবশ্য তেমন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই একটি অদ্ভুত কাজ পেয়ে গেলেন বিভূতিভূষণ। মাড়োয়ারি কোটিপতি ব্যবসায়ী কেশোরাম পোদ্দারের গোরক্ষণী সভায় প্রচারকের চাকরি। কলকাতার এই সভার হয়ে বহু জায়গায়, বিশেষত চট্টগ্রামের দক্ষিণাংশে মুসলমান প্রধান অঞ্চলে বিভূতিভূষণ গোরু জবাইয়ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর ভ্রমণের নেশা এ'কাজের সূত্রে অনেকখানি চরিতার্থ হয়েছিল। কেশোরাম পোদ্দারের দরবারের বর্ণনা তিনি দিয়েছিলেন নীরদচন্দ্রের কাছে—লোকটা সবসময়ে আধডজন টেলিফোন পরিবৃত হয়ে বসে থাকে। টেলিফোন মারফত নানান্ শেয়ার বাজারের নানান্ খবর তার কাছে এসে পৌঁছোয় (Chaudhuri, 1987 : 91)। এ চাকরিতে বিভূতিভূষণ কীভাবে নির্বাচিত হলেন, সে কাহিনী আছে তাঁর 'অভিযাত্রিকে' : 'কলকাতায় বসে আছি, চাকরি নেই—যদিও চাকুরির চেষ্টায় ঘোরাঘুরি করি।

'একটি মাড়োয়ারী ফার্মের বাইরে দেখলুম বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে, দুজন লোক তারা চায়। কোনোদিকে না চেয়ে সোজা ঢুকে পড়লুম আপিসের ভেতরে। আপিসটি স্বনামধন্য ব্যবসায়ী কেশোরাম পোদ্দারের। বিজ্ঞাপন দেখে এসেচি শুনে আপিসের দারোয়ান আমায় একটা ছোট ঘরে নিয়ে গেল। সামনেই বসেছিলেন কেশোরাম পোদ্দার, তখন অবিশ্যি চিনতুম না।

'কেশোরাম পোদ্দার হিন্দিতে জিগ্যেস করলেন—আপনি কি পাস ?

'বললুম, বি এ পাস করেচি…

'কি জাতি ?

'ব্রাহ্মণ।

'বক্তৃতা দিতে পারেন ?

'কিসের বক্তৃতা ? ভালো বুঝতে পারলুম না, কিন্তু চাকুরির বাজার যেমন কড়া, তাতে কোনো কিছুতেই হঠলে বা ভয় খেলে চাকুরি-প্রাপ্তির যা-ও বা সম্ভাবনা ছিল তাও তো গেল ! এ অবস্থায় বক্তৃতা তো সামান্য কথা, কেশেরোমজি যদি জিজ্ঞেস করতেন "আপনি নাচতে জানেন ?" তা হলেও আমার মুখ দিয়ে হাঁ ছাড়া না বেরুতো না।

'সুতরাং বললুম, জানি !

'—আচ্ছা, আপনার ঠিকানা দিয়ে যান, কাল বেলা দশটার সময় আসবেন।

'পরদিন দশটার সময় কেশোরামবাবুর আপিসে গিয়ে দেখি লোকে

লোকারণ্য। আমার মতো আরও পঞ্চাশ ষাটটি বেকার কেশোরামবাবুর খাস বাইরের হলে অপেক্ষা করচে। এরা সবাই বক্তৃতা দেবে আজ এখানে। বুঝলুম সবারই মরিয়া অবস্থা। বক্তৃতা বক্তৃতাই সই।

'আমার পূর্বে একে একে আট দশ জন লোকের ডাক পড়লো। এদের মধ্যে বৃদ্ধ থেকে ছোকরা পর্যন্ত সব রকমের লোকই আছে। লক্ষ্য করে দেখলুম কেউ দুমিনিট পরে ফিরে আসচে, কেউ আসচে পাঁচমিনিট পরে—কেউ বা ঢুকবা-মাত্র বেরিয়ে আসচে।

'অবশেষে আমার ডাক পড়লো। কেশোরামজি দেখলুম তাঁর খাস কামরায় নেই, ওদিকের বারান্দায় দূর কোণে একখানা চেয়ারে তিনি বসে।

'কাছে যেতেই বললেন, আপনি কিছু বলুন—

'—ইংরিজিতে না বাংলাতে?

'—বাংলায় বলুন—

'ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউটের আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা খানিকটা মুখস্থ করেছিলুম, মনেও ছিল। সামনের থামের দিকে চেয়ে মরিয়ার স্বরে তাই আবৃত্তি করে গেলুম। কেশোরাম খুশী হলেন। চাকরি আমার হয়ে গেল।' (বি র ১ : ৩৫০-১)।

গোরক্ষণী সভার প্রচারকের মাসমাইনে ছিল পঞ্চাশ টাকা। চাকরির সূত্রে সেই প্রথম দূরদেশে যাওয়া. বর্ণনা আছে 'অভিযাত্রিক'-এর অনেকখানি জুড়ে। কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, মাদারিপুর, বরিশাল, খালপথে উজীরপুর গ্রাম, ঝালকাঠি-বাজার, চট্টগ্রাম. মহেশখালি চ্যানেল নামে সমুদ্রের ক্ষুদ্র খাঁড়ি, সোনাদিয়া দ্বীপ, সমুদ্রে জোয়ারের আবর্তে দিক ভুল করে মারাত্মক আদিনাথ পাহাড়, মংডু ব্রহ্মদেশ, উত্তরপূর্ব ব্রহ্মসীমান্তে আরাকান ইয়োমা। ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ৬ কার্তিক সুপ্রভাকে লেখা বিভূতিভূষণের চিঠিতে দেখি, '···চাকুরী উপলক্ষে কয়েক বছর ধরে খুব বেড়িয়েছিলাম। পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলা, আসাম ওদিকে তিন-সুকিয়া পর্য্যন্ত, চাটগাঁ, রাঙামাটী hill tracks ও আরাকানের আকিয়াব জেলায়, মংডু পর্য্যন্ত পূর্ব্বে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড় জঙ্গল অঞ্চলে নানা নির্জ্জন ডাক-বাংলোতে অনেকদিন কাটিয়েচি। সে সব দিনের অভিজ্ঞতা এত বিচিত্র, এত অনন্যসাধারণ, চিরকালের জন্যে মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে আছে সেসব। মংডুতে স্থলপথে যাই arakan yoma পর্ব্বতশ্রেণীর পথ দিয়ে, পাহাড়ের মাথা দিয়ে দিয়ে সরু trail, প্রায় ৬০ মাইলের মধ্যে টেলিগ্রাফ লাইন মেরামত করবার মিস্ত্রিদের

জন্য গবর্ণমেণ্ট বাংলো ছাড়া অন্য ঘর বাড়ী প্রায় নেই, সারা অঞ্চলটা বনে ভরা ও বসতিশূন্য। উপত্যকাগুলো দুষ্প্রবেশ্য ও শ্বাপদসঙ্কুল বলে পাহাড়ের ওপর ছাড়া অন্য স্থানে পথ থাকা সম্ভব নয়। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Sir Ross Smith বলেছিলেন ইংলণ্ড থেকে অষ্ট্রেলিয়া উড়ে যাবার সময় তিনি কোনো জায়গাকে এত ভয় করেন নি, যতটা ভয় করেছিলেন arakan yoma-র এই বন্য প্রদেশকে। কোনো রকম এঞ্জিনের গোলমালে যদি ওখানে তাঁকে নামতে বাধ্য হতে হয়, তবে সে খাদ্যহীন, জনহীন অঞ্চলে মৃত্যু ছাড়া অন্য পন্থা নেই এটা তিনি ভালই বুঝেছিলেন।

'কিন্তু কি অপূর্ব্ব সুন্দর এই অরণ্যপ্রদেশ!···শরৎকালে···সেখানে গিয়েছিলাম, বর্ষাশেষে কত বিচিত্র বন্যপুষ্প, ডালে ডালে কত ধরণের আর্কিড, ঝরণাগুলো তখনও বেগবতী, বন্য রসুন ও লিলিফুলে সানুদেশ আবৃত। রডোড্রেণ্ডন্ ফুলের কি বিপুল সম্ভার! সেখানকার জ্যোৎস্নারাত্রির শোভা না দেখলে কল্পনা করা সম্ভব নয়—নিশীথে চাঁদের আলো পর্ব্বতের চূড়ায়, ঝরণার জলে, অরণ্যানীর মাথায়, পুষ্পিত আর্কিডের থোকায় থোকায়, বিশাল বনস্পতির সারিতে—···মাঝে মাঝে···কোনো নৈশপাখীর কুস্বর, সবসুদ্ধ মিলে অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য।· একদিন রবীন্দ্রনাথের কাছে আমার এ অভিজ্ঞতার গল্প করেছিলাম, তিনি বলেছিলেন, যতই বলো ও বন মানুষের জন্যে নয় বাঘভালুকের জন্যে। আজ মনে হয় তিনি ঠিকই বলেছিলেন, বনানী আমাদের পছন্দ করে না, আমাদের তাড়িয়ে দেয়, মানুষের সঙ্গে ওর বুঝি শত্রুতা আছে, চায় না যে আমরা ওর রাজ্যে অনাধিকার প্রবেশ করি।' (অপ্রকাশিত)। এই চিঠি 'অভিযাত্রিক' প্রকাশিত হওয়ার ন'বছর আগে লেখা। ১৯৪১ সালে সে বই বেরোনর আগে সম্পাদনায়, পরিমার্জনায় স্মৃতির সঞ্চয় কতখানি মুছে গিয়েছিল, যোগ হয়েছিল কতদূর কল্পনা, তার নির্ভুল অনুমান অসম্ভব। তবে নীরদচন্দ্রের যুক্তি যদি মানি, তবে ১৯৩২-এর চিঠিকে হয়ত ১৯৪১-এর বইয়ের থেকে সত্যের নিকটতর ভাবা যায়। অবশ্য এই ভ্রমণকালে কত মানুষ যে দেখেছিলেন বিভূতিভূষণ, তার আখ্যান তো 'অভিযাত্রিক' থেকেই খুঁজতে হয়। বাস্তব আর কল্পনার ভেদরেখা যেখানে টানা যায় না, সেখানে জীবনীকারের যুক্তিকে অন্য অবলম্বন খুঁজতে হয়; মানতে হয়, বিভূতিভূষণের কল্পনাকে বাদ দিয়ে বিভূতিজীবনকথাও তো অসম্পূর্ণ। সত্য-অসত্যের যে মেলবন্ধন রয়ে গেল, তা থাকুক; সত্যের ভিতরকার অসত্যকে আর অসত্যের মধ্যেকার সত্যকে আরো স্পষ্টতর বিন্যাসে আলাদা করবার কাজ

হয়ত ভবিষ্যতে সহজতর হবে।

কুষ্টিয়ার তারাচরণবাবুর অমায়িক বিনয়, ফরিদপুরে সদ্য-পরিচিতা দিদির উষ্ণ সম্ভাষণ, অনবরত শেক্সপীয়রের ভুল ধরে বেড়ানো বরিশালের সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক, মংডুর মোংপে পরিবার, চট্টগ্রামের মণি, এরা সকলেই তো বিভূতিভূষণের দিনলিপি জুড়ে আছে। এদের মধ্যে মণিদের সঙ্গে যোগাযোগ যে বিভূতিজীবনে স্থায়ী হয়েছিল, সে কথা আগেই বলেছি। মণির বোন রেণুর সঙ্গে উষ্ণ বিনিময়ের কথা ১৯৩৬ সালের দিনলিপিতেও আছে। রেণু যেন বিভূতিভূষণের অন্তরের অনাহত সারল্যকে বারবার ছুঁতে চাইত, যেমন 'রেণুদের বাড়ি আর একদিন গিয়েছিলুম। ওরা ছেলেমানুষ, ভূতের গল্প শুনে খুব খুশি। আমায় আবার একটা লেবেঞ্চুশের কৌটা উপহার দিল রেণু। বললে, আপনি আমাদের মত ছেলেমানুষ, তাই এটা দিলাম আপনাকে।' (উর্মিমুখর, বি র ৩ : ৫২৬)। অন্য সূত্রগুলি বিভূতিজীবনের যাত্রাপথে হারিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিভূতিসাহিত্যের অনুপুঙ্খে কোনো না কোনোভাবে নিজেদের রেশ তারা নিশ্চয় রেখে যায়, প্রত্যক্ষে না হলেও, পরোক্ষে। ফরিদপুরে সেই যে কলেজজীবনের এক বন্ধুর বিধবা দিদি আলাপের পরমুহূর্তেই বিভূতিভূষণকে অমাবস্যার দিনে বাড়ি থেকে যেতে দিতে চান না, সেই আন্তরিকতায় বিভূতিভূষণের সাহিত্য-নির্মাণের উপক্রমণিকা হয়ত কোনো আত্মবিশ্বাসের হদিস পেয়েছিল। "উপেক্ষিতা" প্রকাশিত হওয়ার পর বেশিদিন কাটেনি তখনও। মনে কি হয়েছিল বিভূতিভূষণের যে, তাঁদের যাত্রাপথের বাঁকে বাঁকে উপেক্ষিতা দিদির দল কোনো-রকম প্রতিদানের প্রত্যাশাবিহীন আশ্রয় ভাইদের জন্য গড়ে দিতে চায়? এক-দিকে তখন বিভূতিভূষণ দেখছেন চন্দ্রনাথ, সীতাকুণ্ড, বারিয়াডাল গিরিবর্ত্ম। অন্যদিকে অভিভূত হয়েছেন আওরঙ্গজেবপুর গ্রামে মুসলমান খালাসিদের আতিথেয়তায়। সেখানেই পেলেন ইংলন্ডে মহারানির ডায়মন্ড জুবিলি দেখা ভিক্টোরিয়ান যুগের মানুষ আবদুল খালাসিকে। ধুম স্টেশনে ট্রেন ধরে বিভূতিভূষণ গেলেন আখাউড়া, দেখলেন স্বাধীন ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা। আখাউড়া থেকে আগরতলার দূরত্ব দশমাইল। ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় গোরক্ষণীসভার প্রচারককে যে বৃদ্ধ আশ্রয় দিয়েছিলেন, তাঁর বিধবা কন্যার আন্তরিক সেবাযত্নের কথাও দিনলিপিতে আছে। আছে মেঘনার তীরে এক নাম না-জানা ছোট্ট গ্রামে অনাত্মীয়া মেয়েদের একরাত্রির আতিথেয়তার কাহিনী। আরও আছে নরসিংদির স্কুলের সেই ড্রইং-এর মাস্টারমশায় আর তার স্ত্রীর সঙ্গে বিনিময়ের গল্প। এসব

অভিজ্ঞতার কোনো একটি বাদ পড়লেই যে 'পথের পাঁচালী' থেকে 'ইছামতী'র পথযাত্রা ভিন্নতর হত না, তা কে বলতে পারে !

নোয়াখালিতে যে বৃদ্ধ উকিলের বাড়িতে বিভূতিভূষণ অযাচিত আতিথেয়তা পেয়েছিলেন, তাঁর নাম মনোমোহন কাঞ্জিলাল। বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পরে সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি' যে বিভূতি-সংখ্যা প্রকাশ করেছিল, সেখানে নগেন্দ্রকুমার গুহরায় লিখেছেন, 'বিভূতিভূষণ একটি গোরক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যোপলক্ষে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের জিলায় গিয়েছিলেন। নোয়াখালী শহরে আমাদের কংগ্রেসের সহকর্মী বন্ধু খ্যাতনামা উকিল শ্রী মনোমোহন কাঞ্জিলালের আতিথ্য গ্রহণ করেন। আমার বাড়িতেও তিনি যান এবং গোরক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কাজ সম্পর্কে কথাবার্তা হয়।' (নগেন্দ্রকুমার গুহরায়, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ ব : ১৪৫)।

পরবর্তী জীবনে যে গোপাল হালদারের সঙ্গে যথেষ্ট নৈকট্য হয়েছিল বিভূতি-ভূষণের, তাঁর সঙ্গেও এই সময়েই প্রথম আলাপ। 'বিচিত্রা'য় যখন 'পথের পাঁচালী' বেরোচ্ছে, তখন নীরদচন্দ্র চৌধুরীর বাড়িতে 'পথের পাঁচালী'র লেখকের সঙ্গে দেখা হল, এবং গোপাল হালদার বুঝলেন, '...বৎসর পাঁচেক পূর্বেই আমাদের পরিচয় ঘটেছিল এক মফস্বল-শহরে। সেদিন বিভূতিভূষণ ছিলেন গোরক্ষিণী সভার এক ভ্রাম্যমাণ বক্তা, আমি ছিলাম এক কর্মী উদ্যোক্তা। সেই কর্মসূত্রে বিভূতিভূষণ বাংলাদেশ, বিশেষ করে পূর্ববাংলা, দেখে বেড়িয়েছিলেন।' (গোপাল হালদার, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ ব : ২০৭)।

খুব সম্ভব এই দুয়ের দশকেরই কোনো এক সময়ে বিভূতিভূষণ 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার বার্তাবিভাগে সহ-সম্পাদকের কাজ করেছেন। 'মাসিক বসুমতী'র কার্তিক ১৩৫৭ সংখ্যায় "সাহিত্যপরিচয়" বিভাগে সদ্যপ্রয়াত বিভূতি-ভূষণের বিষয়ে যে নাতিদীর্ঘ নিবন্ধটি বেরিয়েছিল, সেখানে এই তথ্য মেলে (পৃ. ১২৪)। তবে ঠিক কোন্ সময়ে এই চাকরি তিনি করেছেন, তা কি জাঙ্গি-পাড়ায় যাওয়ারও আগে, অর্থাৎ ১৯২০ সালেরও পূর্ববর্তী ঘটনা, তার কোনো হদিস মেলে না। ১৯২৩ সালে, অর্থাৎ 'প্রবাসী'র অগ্রহায়ণ ১৩৩০ সংখ্যায় বিভূতিভূষণের তৃতীয় গল্প "মৌরীফুল" প্রকাশিত হয় (বি র ২ : ৪৯৭)। সেই বছরেই কেশোরাম পোদ্দারের চাকরিটি শেষ হয়। ১৯২৮ সালের ১ জানুয়ারি দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ লিখেছেন, '...এই সে দিন ১৯২৩ সালের একসময় ওদের ওখানে পড়াতে গেলাম – দেখতে দেখতে সে আজ পাঁচ বছর।' (স্মৃতির রেখা, বি র ১ : ৩৯০)। পাথুরিয়াঘাটার ঘোষবাড়িতে বাড়ির তৎকালীন মালিক

সিদ্ধেশ্বর ঘোষের মাতৃহীন ভাগিনেয় বিভূতিভূষণ বসুর গৃহশিক্ষক হয়ে গিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ গোরক্ষাপ্রচারের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে। আর হরিনাভির স্কুল ছেড়েছিলেন ১৯২২ সালের ১৭ জুলাই। তার সপ্তাহকয়েকের মধ্যেও যদি বিভূতিভূষণ পেয়ে থাকেন কেশোরামজির চাকরি, তবেও তো প্রচারকের কাজ তিনি করেছিলেন মাত্র কয়েকমাস। সুপ্রভার কাছে লেখা চিঠিতে কি স্মৃতির ভ্রান্তিতে কয়েক মাস হয়ে গেছে 'কয়েক বছর'?

বিভূতিভূষণের দিনলিপির অনেক অংশেই ছাত্র বিভূতির উল্লেখ আছে। 'তৃণাঙ্কুরে' লিখেছেন, 'সুশীলবাবু বিভূতির কথা উল্লেখ করে অনেক দুঃখ করলেন। সত্যিই ছেলেটা খারাপ হয়ে যাচ্চে সবাই বলে। অক্ষয়বাবুর নাকি মধ্যে একদিন ফিট হয়েছিল গাড়িতে—অতিরিক্ত মদ্যপানের ফল। ওদের সম্পত্তিটা অভিশপ্ত—সংযম ও উদারতার অভাবে এবং কতকটা কুশিক্ষা ও দাম্ভিকতার ফলেও ওদের সব নষ্ট হয়ে যেতে বসেচে।' (বি র ২ : ২০২)। এই অক্ষয়বাবু হলেন অক্ষয়কুমার ঘোষ। ১৯৫১ সালে ৬৪এ ধর্মতলা স্ট্রিটে খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশনের বাড়িটি স্বর্গত অক্ষয়কুমার ঘোষের এস্টেট থেকেই লিজ নিয়েছিলেন বাড়ির বর্তমান বাসিন্দা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (রুশতী সেন, ১৯৯৩ : ৫২)। 'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপি যখন লিখছেন বিভূতিভূষণ, তখন পাথুরিয়াঘাটার ঘোষবাড়ির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বেশ কয়েক বছরের। ১৯২৩-এ বিভূতির গৃহশিক্ষক ছিলেন তিনি। তারপর কলকাতাতেই সিদ্ধেশ্বর ঘোষের জমিদারি সেরেস্তায় চাকরি করেছেন। গৃহশিক্ষকের মাসিক বেতন ছিল তিরিশ টাকা, জমিদারি সেরেস্তার কর্মচারীর বেতন হল মাসে চল্লিশ। তারপর খেলাতচন্দ্র ঘোষ এস্টেটের ভাগলপুর জঙ্গলমহালে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হয়ে গেছেন বিহারে। মাইনে বেড়েছে, মাসে পঞ্চাশ টাকা (কিশলয় ঠাকুর, ১৯৭৮ : ৯৯)। ১৯২৯ সালে ফিরে এসে যোগ দিয়েছেন সিদ্ধেশ্বর ঘোষের প্রতিষ্ঠা করা স্কুল খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশনে, বাংলার শিক্ষক হিসেবে। এ চাকরির মেয়াদ ১৯৪১-এর শেষ পর্যন্ত। সুতরাং প্রায় দু'দশকব্যাপী বিভূতিভূষণের জীবিকার আখ্যানে ওই ঘোষ এস্টেট থেকেছে মালিকের ভূমিকায়। তিনের দশকের গোড়ার দিকে যখন 'তৃণাঙ্কুর' দিনলিপিতে অভিশাপ, অসংযম, দাম্ভিকতা, কুশিক্ষার কথা লিখছেন বিভূতিভূষণ ঘোষবাড়ির মালিককে নিয়ে, তখন, এমনকী তার পরেও, অক্ষয়কুমারদের মতো সম্পন্ন জমিদার পরিবারের জটিলতা, অপচয়, শুভ-অশুভ, ঠিক-ভুলের বোধ কতখানি ছিল তাঁর? এমন কোনো এস্টেটের

অধীনতার গ্লানি কি ছুঁয়ে যেত বারাকপুর গ্রামের বিত্তহীন মহানন্দ কথকের ইংরেজি শিক্ষিত পুত্রকে ?

১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে বিভূতিভূষণ ভাগলপুরে আসেন। থাকতেন মোগশরপল্লীর যে বাড়িটিতে, তার নাম বড়বাসা। আর যেতে হত ইসমাইলপুরে, ঘোষ এস্টেটের জঙ্গলমহালের কাজ দেখতে। জঙ্গলমহালে নাকি পুকুর চুরি হচ্ছে, মহালের আয় ক্রমশ কমছে, এই মর্মে কলকাতায় সিদ্ধেশ্বর ঘোষের কাছে চিঠি পাঠান মহালের সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্‌ট সারদাকান্ত চক্রবর্তী। তাঁর দরকার একজন বিশ্বস্ত সহকারীর। সেই কারণেই বিভূতিভূষণ ঘোষ এস্টেটের কর্মচারী হয়ে এসেছেন বিহারে (কিশলয় ঠাকুর, ১৯৭৮ : ৯৯)। কেমন লাগত বিভূতিভূষণের এই জঙ্গলের জীবন ? তার উপমায় যদি বারবার নির্ভর করি 'আরণ্যকে'র সত্যচরণে, তবে কি সাহিত্যের আড়াল থেকে জীবনকে সঠিক শনাক্ত করা যাবে ? ভাগলপুর জঙ্গলমহাল এস্টেটে চাকরির সূত্রেই বিভূতিভূষণ ডায়েরিতে লেখেন, 'এটর্নি অফিসের ব্রিফসঙ্কুল কল কোলাহল কর্মমুখর জীবন আমার বিষের মত ঠেকে।' ঠিক তার আগের বাক্যটি হল, 'জগতের পেছনের যে নির্জন জগৎটা আছে, তা শুধু শান্ত সন্ধ্যায়, স্নিগ্ধ বনের লতাপাতার সুরভিতে আমার কাছে ধরা দেয় – গভীর রাত্রের জ্যোৎস্নায় আসে।' (স্মৃতির রেখা, বি র ১ : ৩৯১)। প্রসাদ আর বিরক্তির এই টানাপোড়েনকে কি মেলানো যায় একদশক পরবর্তী 'আরণ্যকে' সত্যচরণের দ্বন্দ্বের সঙ্গে ? বনকে কাটাছেঁড়া করবার জীবিকায় তার রুজি। আর সেই বনের প্রকৃতিকে, জীবনকে সে দিয়ে ফেলেছে অনেকখানি ভালোবাসা। কিন্তু সত্যচরণ তো আর মহালের কাজ করতে করতে লিখে উঠতে পারেনি "মেঘ-মল্লার", "অভিশপ্ত", "নাস্তিক" অথবা "পুঁইমাচা"র মতো গল্প। এসব তো লিখেছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৩০, আষাঢ় ১৩৩১, পৌষ ১৩৩১ এবং মাঘ ১৩৩১ সংখ্যাগুলিতে (বি র ১ : ৪৪৩)।

সত্যচরণের কোনো সাহিত্যিক আড্ডার কি আসরের সুযোগ ছিল না তার আরণ্যক জীবনযাপনে। ছিল না কোনো উপন্যাসের পরিকল্পনা, যা একদিন 'পথের পাঁচালী' নামে মথিত করবে বাংলাসাহিত্যের পাঠককে। সত্যচরণ তো ভেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ অথবা যুগলপ্রসাদের মতো মনের মানুষ নিয়েই অরণ্যপ্রবাস কাটিয়েছিল। কিন্তু ১৯২৪ সালেই ভাগলপুরে যাওয়ার পরে বিভূতিভূষণের পরিচয় হল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথমজীবনে

ছিলেন ভাগলপুরে। এখানে তাঁর মামাবাড়ি। সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ তরুণদের নিয়ে একটি সাহিত্যিক বিনিময়ের আসর তিনি গড়ে তুলেছিলেন। সে আসরের অনেক লেখকেরই প্রথম আত্মপ্রকাশ 'ভারতী' পত্রিকায়। এই আড্ডার সঙ্গে উপেন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল। বিভূতিভূষণ যখন ভাগলপুরে, তখন এই আড্ডার দলপতি ছিলেন রায়বাহাদুর অমরেন্দ্রনাথ দাস। কিশলয় ঠাকুর লিখছেন, 'শহরের এক প্রান্তে আদমপুরে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবাসভবন।...উপেন্দ্রনাথ নিজেও সাহিত্যিক। সাহিত্য নেশাগ্রস্তদের নিয়মিত একটি আড্ডার শতরঞ্জি পড়ে তাঁর বৈঠকখানায়। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন উপেন্দ্রনাথের প্রেসিডেনসি কলেজের সহপাঠী রায়বাহাদুর অমরেন্দ্রনাথ দাস, তাঁর কনিষ্ঠ...গোপেন্দ্রনাথ দাস, সাহিত্যিক মেঘেন্দ্রনাথ রায়, স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিসট্রেট ক্ষিতীশচন্দ্র সেন প্রমুখ। জায়গাটা বিভূতিভূষণের ভাগলপুর সদর কাছারির আস্তানা মোগশরপল্লী থেকে এক মাইলের কিছু বেশি দূরে। শহরে এসে কদিনের মধ্যে তিনি খুঁজে বার করলেন পীঠস্থানটি।' (কিশলয় ঠাকুর, ১৯৭৮ : ১০৩-৪)। যখন দিয়ারা-ভূমির মালিকানা, বণ্টন আর তার হিসাবনিকাশ সংক্রান্ত গোলযোগ মেটাতে বিভূতিভূষণকে থাকতে হত সদরের বাইরে, সে জীবন সত্যিই ছিল নিতান্ত একাকী। কিন্তু সত্যচরণের মতো নিরবচ্ছিন্ন একাকিত্ব তা নয়। সদরে ফিরলেই আছেন উপেন্দ্রনাথ, অমরেন্দ্রনাথ, আরও অনেকে।

জমিদারি প্রথার পুরো জটিলতা বিভূতিভূষণের নাগালে ছিল না। জীবন-জীবিকার অসংগতি নিয়ে কোনো তাত্ত্বিক বিন্যাসও তাঁর আয়ত্তে নেই। তবু তিনি দিনলিপিতে লেখেন, 'চাইনা তোমাদের দশ হাজার টাকার চেক, মিনার্ভা মটরগাড়ী, পেলিটীর বাড়ীর খানা, অমুক এটর্নির এত আয়ের বিষয় সম্পত্তি। তোমাদের মর্টগেজ ট্রান্সফার প্রপার্টিজ এ্যাক্ট, কোবলা, ওয়ার বণ্ড তোমাদের থাকুক — এই নিঃসীম নীল শূন্য, ওই তারকারাজি, শেষ রাত্রির জ্যোৎস্নায় নাগকেশর ফুলের সুরভি, কতদিন-হারা ছেলেমেয়েদের অস্পষ্টপ্রায় মুখগুলো আপনার হয়ে থাকুক।...বহুকাল আগের শৈশবে, ...শিউলিফুলের তলায়...ঘাসবনে যখন চড়াই পাখী, দোয়েল পাখী বসতো, এই শীতের দিনে প্রথম প্রভাতের রাঙা রৌদ্রে পিঠ পেতে বসে মায়ের হাতে পিঠে খেতে যে অপূর্ব কল্পনা জগতের স্বপ্ন দেখেছি — আমার বাঁশবনের ভিটার প্রতি ধূলিকণায় তার লিখন আছে — কোন্ এটর্নি অফিসের মর্টগেজ দলিল, দস্তাবেজের মধ্যে তার জুড়ি খুঁজে মিলবে? সেই "নন্দনসুত নীল নলিনাও" গান, সেই বালক কীর্তন, সেই বকুলতলা, নটকান

গাছ, বিল্‌বিলে, পূবমুখো যাওয়া, ভরত—সেই অদ্ভুত শৈশবস্বপ্ন—আমার সে সবই চিরদিনের সম্পদ হয়ে থাকুক।···সম্পদ হয়ে থাকুক, এমার্সন শেলি চেকভ রবীন্দ্রনাথ, আমার ঐ ছেঁড়া কালিদাসখানা, রামায়ণ, বার্নার্ড শ—এঁদেরই আমি চাই, এঁরাই আমার ঐশ্বর্য।' (স্মৃতির রেখা, বি র ১ : ৩৯১)। কিন্তু এই ঐশ্বর্য অর্জন করতে গেলে, বাল্যের সম্পদ আর অর্জিত ঐশ্বর্য জিইয়ে রাখতে গেলে তো পঞ্চাশ টাকা মাসমাইনের কেরানিগিরিও লাগে। তা না হলে কেমন করে মানুষ হবে ছোটভাই নুটু? কেমন করে তৈরি হবে একের পর এক ছোটগল্প লিখে যাওয়ার মতো আর্থিক অবস্থান? কী করেই বা গড়ে উঠবে 'পথের পাঁচালী' উপন্যাস, যে উপন্যাসের এক পাণ্ডুলিপি ভেঙে আর এক পাণ্ডুলিপিতে পৌঁছনোর কার্যকারণ বিন্যাসেই গড়ে ওঠে একাধিক কাহিনী?

মাঝেরপাড়ার এপার ওপার

তবে কি ১৯২৪ থেকেই 'পথের পাঁচালী' বিভূতিভূষণের মনে একটু একটু করে তৈরি হচ্ছিল? নাকি এ নির্মাণের উপক্রমণিকা খুঁজতে ফিরতে হয় বারাকপুর-ইছামতীর প্রকৃতির কাছে, বিভূতির শৈশবের দুয়ারে, মহানন্দ-মৃণালিনীর অনটনের অন্দরে, বালক কি কিশোর বিভূতির নিদ্রাবিহীন রাতজোড়া সাহিত্যপাঠে? অবশ্য এতে কোনো ভুল নেই যে বারাকপুরের শ্যামলতা থেকে বহু দূরে, প্রকৃতির একেবারে আলাদা এক বিস্তারে, একাকী প্রবাসী বিভূতিভূষণের লেখনীকে নিশ্চিন্দিপুরের কাহিনী ভর করল। ১৯২৭-এর ৬ অগাস্ট বড়বাসার ছাদ ভাসিয়ে যখন জ্যোৎস্না নামে, বিভূতিভূষণের মন চলে যায় বারাকপুরের খড়ের ঘরে, মনসা ভাসানে, শৈশব-বাল্যের দুপুর জুড়ে হাতে সেলাই ধরা মায়ের কাছে। ৭ নভেম্বর, ১৯২৭, বিভূতিভূষণ দিনলিপিতে লেখেন, 'পাটনা ল প্রেসের কাছে এসে কল্পনায় আমাদের গ্রামের বাড়ীতে ফিরে গেলাম···মা-মা?···"কে বিভূতি?"···মণি এল, জাফরী (জাহ্নবী) এল, নুটু এল·· ওধারে নেড়ার বাবা কাশছে। বাড়ী—বাড়ী, কতদিন পরে নিজের পুরানো ভিটাতে মার কাছে গিয়েছি?' (স্মৃতির রেখা, বি র ১ : ৩৬৩, ৩৭৭)।

এমন দিনলিপি যখন লেখা হচ্ছে, তার সমসময়ে দৈনিক কতখানি বড় হচ্ছে বিভূতিভূষণের অপু, কোন অভিজ্ঞতায় বিভূতিভূষণ সাজাচ্ছেন তাকে, তার নথি তো পাওয়া অসম্ভব। আর এই অসম্ভবই তো নিশ্চয় স্বাভাবিক। বিভূতিভূষণের

দিনলিপিগুলো না থাকলে, এমন নিরুপায়ের অভাববোধ বিভূতিজীবনের বা বিভূতিসাহিত্যের আগ্রহী পাঠককে পেয়ে বসত না। দিনলিপি একদিকে যেমন তথ্য দেয়, অন্যদিকে তেমনি অজানার বোধকেও বাড়ায়, তৈরি করে আরও তথ্যের প্রত্যাশা। সেই প্রত্যাশাকে অপূর্ণ রেখেই বিভূতিসাহিত্যের আর বিভূতিজীবনের পাঠ বানাতে হয়। অপূর্ণতার বোধ থেকে সেই পাঠের মুক্তি মেলে না। বহুদিন বাদে কল্যাণীকে চিঠিতে লিখেছিলেন বিভূতিভূষণ, '··যখন···বনগাঁয়ের বোর্ডিংয়ে থেকে পড়ি, বারাকপুর ছেড়ে এসে মায়ের জন্যে বাবার জন্যে বিশেষ করে বারাকপুরের নদীতীর, গাছপালার জন্যে আমার মন খারাপ হোত এবং পুরোনো দিনের কথা মনে পড়তো। যখন আমি ভাগলপুরে কাজ করি তখনও বারাকপুরের জন্যে মন কেমন করতো, তা থেকেই বোধ হয়, পথের পাঁচালীব উৎপত্তি।' (বি র ১০ : ৩৫৭)।

প্রবাসে যখন গড়ে উঠছে 'পথেব পাঁচালী', একদিকে তখন যেমন থেমে নেই এমার্সন কিংবা শেলির চর্চা, অন্যদিকে ছেদ পড়েনি ভ্রমণের নেশাতেও। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভাইপো হেমেন্দ্রলাল তখন ভাগলপুবের বাসিন্দা। তিনিই ছিলেন বিভূতিভূষণের কাজ্‌রা (KAZRA) উপত্যকা ভ্রমণের সঙ্গী। এখানেই প্রথম বুদ্ধ নারিকেল গাছ দেখা। আর গুহার ভিতবকার মন্দিরে আছেন সেই মাতাজি – বেগুসরাইয়ের মেয়ে। তের বছরে বিধবা হয়ে গৈরিক ধরেছিলেন, আজ তিরিশ পেরনো সন্ন্যাসিনী। ভাগলপুর থেকেই গৈবীনাথ পাহাড়ে গেছেন বিভূতিভূষণ। সুলতানগঞ্জ স্টেশন থেকে আধমাইল হাঁটাপথে গঙ্গা। নৌকায় যেতে হয় গৈবীনাথে – যে পাহাড়ে আছে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম। আশ্রমের মোহন্তজির আচারব্যবহার, কথাবার্তা এতই সরল যে, বিভূতিভূষণ দিনলিপিতে লেখেন, '···বাংলার বাইরে আমি নিছক, নিরীহ, সরল ও ভালোমানুষ লোকের যে ছাঁচ দেখেছি, বাংলাদেশে তা দেখিনি।' (অভিযাত্রিক, বি র ২ : ৪৩৫)। এই সময়েই ভাগলপুর থেকে পায়ে হেঁটে দেওঘর যাওয়া এবং হাঁটাপথেই ভাগলপুরে ফিরে আসার অভিজ্ঞতা ভ্রমণপাগল বিভূতিভূষণের ঝুলিতে জমা পড়েছে। দেখেছেন তিনি বটেশ্বরনাথের মেলা, যার বর্ণনা 'স্মৃতির রেখা' থেকে প্রায় হুবহু উঠে এসেছে একদশক পরের 'আরণ্যক' উপন্যাসে।

ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বিচিত্রা'। অমরেন্দ্রনাথ দাস "১৯২৬-এর স্মৃতি"তে লিখেছেন '···বিভূতিভূষণ ভাগলপুরে আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুগোষ্ঠীর একজন ছিল। তখন সে তার "পথের পাঁচালী" লিখিতেছিল।

মধ্যে মধ্যে বুড়ানাথ রোডে খেলাৎচন্দ্র ঘোষ এস্টেটের বড়বাসার দ্বিতলে উহার লিখিত অংশ আমরা শুনিতাম। বাঙ্গালার পল্লীজীবনের এরূপ জীবন্ত মূর্তি বর্ণনা অন্য কোথায়ও পড়িয়াছি, আমার অল্পজ্ঞানে মনে হয় না।···উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, নবীন যুবক প্রতিভাশালী লেখক সমীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তখন আমাদের মধ্যে।···উপেন্দ্রবাবু সহধর্মিণীর উৎসাহে সাহিত্যজগতে নূতন আবির্ভাবের কল্পনা করিতেছিলেন—যাহা কিছুদিন পরে "বিচিত্রা" মাসিক-পত্রিকারূপে প্রকাশ পায়। ১৯২৬ সালের কলিকাতার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পর ঘনায়মান অন্ধকারে সন্ত্রস্ত আমরা কয়জনে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা-সৈকতে সান্ধ্য-সম্মেলনে সঙ্কল্প করি "রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ"। সেই মন্ত্রসাধন-সন্ধানে উপেন্দ্র-বাবু কলিকাতা যান এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে পত্রিকার নামকরণ করেন। "পথের পাঁচালী" উহাতেই প্রকাশিত হয়।' (অমরেন্দ্রনাথ দাস, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ ব : ১৬০)। 'পথের পাঁচালী'র আগে বিভূতিভূষণের দুটি ছোটগল্প "বউ-চণ্ডীর মাঠ" এবং "নব-বৃন্দাবন" যথাক্রমে 'বিচিত্রা'র শ্রাবণ ১৩৩৪ এবং বৈশাখ ১৩৩৫ সংখ্যায় বেরোয়। "ঠেলাগাড়ী" প্রকাশিত হয় কার্তিক ১৩৩৫-এ। তার আগে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যা থেকে 'বিচিত্রা'য় ধারা-বাহিক বেরোচ্ছে 'পথের পাঁচালী'। কার্তিক ১৩৩৫ সংখ্যায় উপন্যাসটির কোনো কিস্তি প্রকাশিত হয়নি; সেই সংখ্যায় বিভূতিভূষণ "ঠেলাগাড়ী" গল্পটি লেখেন। বিভূতিভূষণের প্রথম গল্পসংকলন বেরোতে অবশ্য তখনও অনেক দেরি। 'মেঘমল্লার'-এর প্রকাশ তিনের দশকের গোড়ায়। অর্থাৎ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে। (বি র ১ : ৪৩৩, ৪৪৩)।

'পথের পাঁচালী' যখন ছাপা শুরু হয়নি, সেই সময় পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষের শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন উপেন্দ্রনাথ এবং ভাগলপুরের অন্যান্য সাহিত্যানুরাগী এবং সাহিত্যিক বন্ধুরা। কিন্তু তারও আগে এ উপন্যাসের শ্রোতা ছিলেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী। বিভূতিভূষণ পরিমল গোস্বামীকে বলেছিলেন, 'নীরদ চৌধুরী ···আমার লেখার প্রথম গুণগ্রাহী। আর সবাই নিরুৎসাহ করেছিল। ৪১নং মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসে বই পড়া হয়। উৎসাহিত হয়ে বিচিত্রায় উপীন্দ্রনাথ (উপেন্দ্রনাথ ?) গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে নিয়ে যাই। তিনি ছাপতে থাকেন। বিচিত্রায় ছাপার পর প্রবাসী অফিসে সুনীতিবাবু, কালিদাস নাগ, অশোক চট্টোপাধ্যায়, সজনী প্রভৃতিকে পড়ে শোনাতাম। সাত-আট দিন ধরে পড়া হয়। সজনী প্রকাশ করে।' (যুগান্তর সাময়িকী, রবিবার, নভেম্বর ১২,

১৯৫০, পৃ. ১০)। পরিমল গোস্বামীকে গল্প করতে করতে বিভূতিভূষণ পাঁচ-ছ'টি বাক্যে পাঁচ বছরের ইতিহাস যেভাবে বলে গেছেন, পাঁচবছরব্যাপী 'পথের পাঁচালী' নির্মাণ আর প্রকাশের পথ কিন্তু তত মসৃণ ছিল না। নীরদচন্দ্র লিখেছেন, 'In 1924, as soon as he had written the first few pages, he read them out to me. I felt so confident about it that I prodded him for three years to finish it. After its publication as a serial in 1928 I was able to secure a publisher for the novel in book form.' (Chaudhuri, 1987 : 87)

১৯২৪ সালে যে কয়েকটি পৃষ্ঠা শুনেছিলেন নীরদচন্দ্র, 'পথের পাঁচালী'র সেই পাণ্ডুলিপিতে দুর্গা ছিল কিনা, তা নিশ্চিত জানা যায় না। কিন্তু তাঁর 'পথের পাঁচালী'র দুর্গাবিহীন প্রথম পাণ্ডুলিপিতে দুর্গার আবাহন নিয়ে বিভূতি-ভূষণ জীবনভর কত গল্প বললেন, কখনও যোগেন্দ্রনাথ সিন্‌হাকে, কখনও পরিমল গোস্বামীকে, আরও কতজনকে। কোনো দুটি গল্পই একে অপরের থেকে একেবারে অভিন্ন রইল না। বিভূতিসাহিত্যের গবেষক বিভূতিভূষণের বোন মণিকেও দুর্গার উৎসে আবিষ্কার করেছেন। আর বিভূতিভূষণের বিবরণে, কখনও দুর্গার মুহূর্তে এসেছে ভাগলপুরে রঘুনন্দন হলের সামনে দেখা, অথবা সেখানকার নির্জন পথে দেখা রুক্ষ চুলের দেহাতি মেয়ে, কখনও বা বড়বাসার বারান্দায় বসে তেতুলছড়ায় জীবনের পরম অভীষ্ট লাভ করা দেহাতি বালিকা।

বিভূতিভূষণের যাত্রাপথে দুর্গার অনুষঙ্গ খুঁজে পাওয়া সম্ভব কখনও বারাক-পুরে, কখনও ভাগলপুরে, আবার ঘরের কাছের ভাটপাড়ায়, বিভূতিভূষণের অজস্র পল্লীভ্রমণের পথে আর পথের প্রান্তে। দুর্গার উৎসের কোনো নিশ্চিত নির্বিকল্প নির্ধারণে পাঠক যতই কোনো এক বিশেষ চরিত্রকে নির্দেশ করবেন, ততই কি পাঠকের অন্বেষণ ভ্রষ্ট হবে না সত্যসন্ধান থেকে? বিভূতিসাহিত্যে 'পথের পাঁচালী'র আগে থেকেই তো দুর্গাদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। "পুঁইমাচা"র ক্ষেন্তি অথবা "উপেক্ষিতা" দিদি কি আসলে দুর্গাদের মরণের অথবা জীবনের আখ্যানই বলতে চায়নি? আর সেই কথনের ভিতর দিয়ে কি অনিবার্য হয়ে ওঠেনি 'পথের পাঁচালী'র দুর্গার অকালমৃত্যু? মরণের সেই অনিবার্যতা 'পথের পাঁচালী'র পরেও, বিভূতিসাহিত্যের অনেকখানি জুড়ে, যারা দুর্গা অথচ দুর্গা নয়, তাদের জীবন-মরণের, নিষ্ফলতা-করুণার, নিরুদ্দেশ-নিঃশব্দের বিন্যাসে বারবার সত্যি হয়ে ওঠে। কোনো বিকল্প জীবনের প্রেরণা সেখানে জমি পায়.

না। এ বিকল্পহীনতায় বিভূতিভূষণ বারবার তাঁর নির্মমতাকে মমতায় ঢাকতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রায় ততবারই সেই মমতার আস্তরণে পড়ে নেওয়া গেছে নির্মমকে। দুর্গাকে বানিয়ে ফেলবার পর, তাকে বানিয়ে তোলার কারণ নিয়ে যত গল্প তৈরি হয়, তাতে বোঝা যায়, সে নির্মাণ বিভূতিভূষণের কাছে কত যন্ত্রণার, কত মায়ার আর কত ভালোবাসার। বিভূতিভূষণের ওই অনিবার্য যন্ত্রণা কি 'পথের পাঁচালী'র পাঁচ বছরের ইতিহাসকে মন্থর থাকতে দেয়? তাছাড়া 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হওয়ার আগে 'প্রবাসী'তে 'পথের পাঁচালী'র অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি দেওয়া হয়েছিল। কেন যে 'প্রবাসী' সে পাণ্ডুলিপি ফেরত দিয়েছিল, তার সঠিক কারণ জানা যায় না। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, 'হয়তো তাঁদের পত্র-পরিচালনার রীতি অনুযায়ী অসম্পূর্ণ লেখা বলে গ্রহণ করেন নি।' (উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ ব: ১১৮)।

যখন চলছে 'পথের পাঁচালী'র নির্মাণ, তখন কেমন ছিল বিভূতিভূষণের দৈনন্দিন? জীবিকার প্রয়োজনে বিহারের জঙ্গলমহালই তো তখন বিভূতি-জীবনের প্রত্যক্ষ আধার। বঙ্গসংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতা থেকে, বিভূতি-ভূষণের জীবনভর স্মৃতিমেদুরতার বারাকপুর থেকে সে অরণ্য বহুদূরে। এই দূরত্বই কি মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিস্ট্যান্ট সিগ্‌ন্যালের ক্রমশ অস্পষ্ট হতে হতে শেষে দূরে মিলিয়ে যাওয়াকে অতখানি অমোঘ করে তোলে? ১৯২৭ সালের ১৬ মার্চ ইসমাইলপুর কাছারি থেকে বিভূতিভূষণ একটি চিঠি লিখেছিলেন ঘোষ এস্টেটের কোনো ঊর্ধ্বতন কর্মীর কাছে। সে চিঠি সারদাকান্ত চক্রবর্তীকে লেখা, নাকি অন্য কারও কাছে, 'মান্যবরেষু' সম্বোধনটুকু থেকে তার স্পষ্ট হদিস মেলে না। কিন্তু এই চিঠিতে খানিকটা বোঝা যায়, কেমন ছিল বিভূতিভূষণের আরণ্যক জীবন। যখন অরণ্যের থেকে, অরণ্যভূমি আর অরণ্যপ্রকৃতির সঙ্গে সে ভূমির মালিকের ঘাত-প্রতিঘাত থেকে কোনো নিরাপদ দূরত্ব ছিল না ঘোষ এস্টেটের জঙ্গলমহালের কর্মচারী বিভূতিভূষণের, কেমন ছিল তাঁর তখনকার জীবন? সত্যচরণের আরণ্যক জীবনকে যখন তিনি সাহিত্যে গ্রথিত করলেন, তখন তো বিভূতিভূষণ আর জঙ্গলমহালের নন। তখন তিনি কলকাতার খেলাতস্কুলের বিভূতিভূষণ, ৪১ মির্জাপুর স্ট্রিটের মেসবাসী বিভূতিভূষণ, সপ্তাহান্তে কি দীর্ঘতর ছুটির অবকাশে বারাকপুরের বিভূতিভূষণ। ১৯২৭ সালের ১৬ মার্চ ইসমাইলপুর কাছারি থেকে বিভূতিভূষণ লিখছেন:

'মান্যবরেষু,

'এখানকার কাজকর্ম্ম বর্ত্তমানে যেরূপ সুরু হইয়াছে, তাহাতে smoothly বরাবর চলিবে এরূপ মনে হয়। এদিকে ওদিকের দু একটা ছুটাছাটা গোলমাল বা উপদ্রব যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা বাদে আসল কার্য্যে কোনো গোলমাল নাই। উপরোক্ত ধরণের উপদ্রব বা গোলমাল দ্বিরামহলের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। উহা বারোমাসেই লাগিয়া আছেই বা থাকিবে। ও সমস্ত দ্বারা আসল কার্য্যের কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

'আমি অদ্য বহুদিবস যাবৎ এখানে আছি। প্রায় ১০/১১ মাস হইল। মধ্যে পূজার প্রায় ৪ মাস পূর্ব্বে সপ্তাহ দেড়েকের জন্য কলিকাতা গিয়াছিলাম। সেও আজ ৮ মাসের কথা হইল। বিশেষতঃ অদ্য ২/৩ মাস হইতে আজমাবাদ ও ইসমাইলপুরের ঘোর জঙ্গলমহালে প্রায় একাকী অবস্থায় কাল কাটাইতেছি। এখানকার নির্জ্জনতা যে কিরূপ তাহা পত্রে বুঝাইবার কথা নহে। এরূপ dull life সম্বন্ধে আপনাদের হঠাৎ একটা ideaই হইবে না। বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের হইতে বহুদূরে এতদিন ধরিয়া এইরূপ জঙ্গলঘেরা নির্জ্জন স্থানে, সভ্যজগৎ হইতে একরূপ নির্ব্বাসিত অবস্থায় কালাতিপাত যে কিরূপ তাহা পত্রে লিখিয়া কিছু বুঝাইতে পারিব না। তবুও ষ্টেটের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যটী begin করিয়া দিয়া সেলামী আদায়ের ও জমি মাপা ইত্যাদির পথ খোলসা করিয়া দিবার ব্যবস্থার জন্য এই wilderness-এর সকল কষ্ট সহ্য করিয়া আছি।

'কায্য বর্তমানে একরূপ আরম্ভ হইয়াছে – নায়েববাবুর বাসগৃহও ১০/১২ দিনের মধ্যে উঠিয়া যাইবে কারণ উহার কায্য আরম্ভ হইয়াছে···। আমার ইচ্ছা যে আগামী মাসের প্রথমেই যাহাতে নায়েববাবু পরিবারসহ এখানে আসিতে পারেন তাহার চেষ্টা করা ও তজ্জন্য তাগাদা দিবেনই।

'বর্ত্তমানে আমার বিশেষ অনুরোধ যে আমাকে সদরে ফিরিবার সম্মতি প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন। মার্চ্চ কিস্তীর লাটের জন্য পাটোয়ারী ও তহশীলদারদের বিশেষ করিয়া প্রত্যহ তাগাদা দিতেছি, ও যাহাতে লাট এখান হইতে কামিন হয় তাহার জন্য সবিশেষ যত্ন করিতেছি। উহারাও বলিতেছে হইয়া যাইবে। প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখি কি করিতে পারি। মার্চ্চ কিস্তীর লাটের যথাসাধ্য বন্দোবস্ত করিয়া যদি এখান হইতে লাট কামিন করিতে পারি, তাহার জন্য চেষ্টা করিবার জন্য আমি মার্চ্চ মাস ভোর এখানেই থাকিয়া যাইব। এবং কিস্তী দাখিলান্তে এপ্রিল মাসের প্রথমে কলিকাতা যাইবার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করি।

মন এত ব্যস্ত হইয়াছে যে তাহা আর লিখিতে পারি না। প্রতিদিন সকালে বিকালে চারিদিকে এই ঝাউ ও কাশের জঙ্গল দেখি আর দিন গুনিতে থাকি। তদুপরি অদ্য দেড়মাস যাবৎ একাদিক্রমে এই wildernessএর মধ্যে আছি। Life at Ismailpur যে কি, তাহা পত্রে কি জানাইব. তবে আপনি গত পূজার সময় আসিয়া কিছু কিছু উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন। মনকে বুঝাইয়া আর কোনক্রমে রাখিতে পারিতেছি না রোজই দেখি ধূ ধূ ঝাউকাশের বন, মনে হয় এখানে বুঝি indefinite periodএর জন্য থাকিতে হইবে। তাহাতে মন আরও ব্যস্ত হয়। যদি জানা যায় অমুক দিন আমি যাইতে পারিব, তাহা হইলেও মন অনেকটা শান্ত থাকে যে এই কয়টা দিন পরে বহির্জগতের মুখ দেখিব। সদরে ফিরিবার অনুমতি পাইলে মন বরং শান্ত থাকে, একটা limit-এর মধ্যে আসিয়া পৌছানো যায়, মনে হয় অমুক দিন তো যাইব। কিন্তু এই indefiniteness আরও ভয়ঙ্কর।

'আপনি সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া এপ্রিল মাসের প্রথমে সদরে ফিরিবার অনুমতি দিয়া বাধিত করিবেন। সম্পূর্ণ অধৈর্য্য না হইলে পত্র লিখিতাম না, যতদিন পারিয়াছিলাম কোনো কথা না জানাইয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছি, যথাসাধ্য শক্তি ও চেষ্টায় যাহাতে মহালের একটা পথ খোলে, সে পক্ষে চেষ্টার কোনো ত্রুটী করি নাই। আর কোনও রূপে কাল কাটাইতে পারিতেছি না। অবশ্য মার্চ্চ কিস্তীর সময় পর্য্যন্ত আমি যাইতে চাহিব না ইহা নিশ্চয়, বা কার্য্যাদি যতদূর সম্ভব অগ্রসর করাইয়া তবে যাইব, আমি আপনার অনুমতিটা লইয়া রাখিতে চাই, কেননা মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে। এক গোষ্ঠ বাবু ছাড়া অন্য কোনও বাঙ্গালী সঙ্গী নাই, সব সময়ের সঙ্গী এদেশের গাঙ্গোতা প্রজাগণ, সিপাহী ও পাটোয়ারী এই সব। একরূপ বন্য হইয়া পড়িয়াছি। দেশের বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় স্বজনের দর্শন হইতে কতদিন বঞ্চিত। Life যে কি ভয়ানক tiresome ও dull মনে হয় তাহা আর কি জানাইব। আপনি সহৃদয় ব্যক্তি। এইজন্য সকল খুলিয়া লিখিলাম। মন যেন পাগলের মত হইয়াছে, কিরূপে যে পুরা মার্চ্চ মাস কাটাইব তাহাও যেন অত্যন্ত দুঃসহ মনে হইতেছে।

'পত্রখানি official নহে, এসব মনের অবস্থা official পত্রে দেওয়া ঠিক নহে। কিন্তু আপনি দয়া করিয়া সকল বুঝিয়া একটা অনুমতি দিয়া রাখিবেন। You can depend upon me যে যদি দেখি অমুক কার্য্যটির দরুণ আমাকে এখন ২দিন থাকিয়া যাইতে হইবে, তবে তাহার জন্য যে ২/৫ দিন থাকিয়া যাইব ইহা বলাইবাহুল্য। এপ্রিল মাসে ১লা ২রা বা কার্য্য পড়িলে ৮ই/১০ই…যে কোনও রূপে হৌক্ আসিয়া যাইব।

'মনের অত্যন্ত ব্যস্ত অবস্থায় পত্র লিখিলাম, যদি কিছু অসংলগ্ন কোথাও মনে হয়, কিছু মনে করিবেন না। আশা করি কুশলে আছেন। জমিদার বাবুকেও সকল কথা খুলিয়া বলিলে তাঁহার অমত হইবে না এমত আশা হয়। দেখা হইলে পুনরায় অনেক বলিব ও শুনিব। আমার নমস্কার গ্রহণ করিবেন।

বিভূতিভূষণ দেবশর্ম্মা' (অপ্রকাশিত)।

এই চিঠির অস্থিরতা থেকে 'আরণ্যকে' রাজু-মটুক-গিরধারীলাল-জয়পাল-কুমার-ধাওতাল সাহু, ধাতুরিয়া-মঞ্চী-দোবরু-ভানুমতী-কুন্তার সমাবেশে পৌঁছতে যে অনেকখানি দূরত্ব প্রয়োজন হবে, তা তো স্বাভাবিক। ভৌগোলিক অবস্থান আর সময়ের সেই দূরত্বে এসে তবেই সত্যচরণের 'আরণ্যক' অভিজ্ঞতা বিভূতিভূষণ সাহিত্যে গেঁথেছিলেন। আর এটাও হয়তো স্বাভাবিক যে সেই দুয়ের দশকে, অরণ্য-প্রবাসে নিশ্চিন্দিপুরের হরিহর-সর্বজয়া, ইন্দির ঠাকুরুন-দুর্গা-অপুর কল্পনাই বিভূতিভূষণকে প্রবাসীর বেদনা থেকে পরিত্রাণের, শিল্পীর রুদ্ধ যন্ত্রণা থেকে উত্তরণের পথ বলে দিত। কিন্তু "উপেক্ষিতা"-"উমারাণী"-"মৌরীফুল"-"অভিশপ্ত"-"নব-বৃন্দাবন"-"পুঁইমাচা"-"মেঘমল্লার"-এর লেখক সেই ১৯২৭ সালে, মাসিক পঞ্চাশ টাকার বিনিময়ে, যে জীবিকায় সংলগ্ন ছিলেন, তার জটিলতা কতখানি আয়ত্তে ছিল তার? মহালের অন্তর্গত দিয়ারা উপত্যকাকে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করবে দরিদ্র ভূমিহীন প্রজা। অনন্যোপায় সেই প্রজাকে বসানো হবে লাটের পর লাটে। যখন সেই লাট প্রজার শ্রমের স্পর্শে আরও নিশ্চিত পরিচয় অর্জন করবে কোনো না কোনো ফসলের ফলনে, তখন আর সেই ভূমিতে প্রয়োজন হবে না এতদিনের নামমাত্র খাজনার প্রজাকে। আসবে আরও সম্পন্ন কোনো প্রজা। কারণ নামহীন লাট যখন, তখনও তার মালিক জমিদারবাবু। আবার সেই লাট যখন কোনো ফসলের ভরভরন্ত ক্ষেত, তখনও তার মালিক সেই একই জমিদারবাবু। এই জমিদারবাবুই আবার "পুঁইমাচা"র লেখকের অন্নদাতা। লাট কায়েম করা, কিস্তি পাঠানো—এইসবই তো প্রজা শোষণের ওই প্রক্রিয়াটিকে সুশৃঙ্খলায় ধরে রাখবার আয়োজন। সেই যথাযথ আয়োজনকে জমিদারের সব-থেকে অনুকূলে রাখতেই তখন কাজে লাগছে বহু কষ্টে অর্জিত বনগ্রাম হাইস্কুল-রিপন কলেজের জ্ঞানবিজ্ঞান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি।

এ বুঝি সেই একই অসংগতির অন্য এক স্তর। সেই অসংগতির এক অসহায় প্রকাশে শিলঙের সুপ্রভায় পরম মুগ্ধতা, আবার একই সঙ্গে সুপ্রভা কেন শিলঙের, কেন সে বারাকপুরের নয়, তা নিয়ে চরম অপূর্ণতা। যে তত্ত্ববিশ্বের আহ্বানে

বিভূতিভূষণের দল বেন্টিঙ্ক-মেকলের সাজানো বাগানকে ভাবেন বুঝি কথকতার দৈন্যের থেকে অনেক আলোকিত, সেই বিশ্বের চৌহদ্দিতে এই তো তাঁদের অবস্থান! প্রসাদে-বিষাদে, সম্পর্কে-সম্পর্কহীনতায়, গ্রহণে-বর্জনে, জীবিকায়-জীবনে, দৈনন্দিনের যাপনে তাঁরা এতখানিই নিরাশ্রয়, দিশাহারা! বারবার তাঁরা ভাবেন, মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিস্‌ট্যান্ট সিগ্‌ন্যালকে পিছনে ফেলে রেখে এগোতে এগোতে, একদিন কোনো বিকল্প সিগ্‌ন্যালের নিশ্চিত অর্জনে ওই পিছনের ফেলে আসা সার্থক হবে। ততবারই কিন্তু মাঝেরপাড়া আরও আরও দূরে সরে যায়। আর যাকে অর্জন করবেন বলে মাঝেরপাড়াকে ফেলে এলেন, তা যেন বারবারই মায়া, শুধুই মায়া। সত্য কেবল মফস্বলে মফস্বলে ঘুরে ছাত্র পড়ানো, বঙ্কিমচন্দ্র মুখস্থ বলে গরু জবাইয়ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেওয়ার চাকরি পাওয়া, জমিদারের প্রজা শোষণের সহায় হওয়া। ওই মায়ার আচ্ছন্নতা থেকে বিভূতিভূষণের মুক্তি নেই, যেমন মুক্তি নেই এই সত্যের যন্ত্রণা থেকেও। এই মুক্তিহীনতার মধ্যেই, হয়তো বা এই মুক্তিহীনতার কারণেই, 'পথের পাঁচালী'র জন্ম হয়, দীর্ঘদিন ধরে তার লালন-পালন চলে। ১৯২৮ সালের ২৬ এপ্রিল উপন্যাসটি 'বিচিত্রা'য় পাঠিয়ে দিলেন বিভূতিভূষণ (স্মৃতির রেখা, বি র ১ : ৪২১)। আষাঢ় ১৩৩৫ থেকে আশ্বিন ১৩৩৬ পর্যন্ত 'পথের পাঁচালী' 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিক প্রকাশিত হল (বি র ১ : ৪৩৩)।

কোনো প্রতিরোধ ছিল না এই উপন্যাসে, কোনো প্রতিকারও নয়। তবু বাঙালি পাঠকের মনে হল 'পথের পাঁচালী' তাদের পরম প্রাপ্তি। 'বিচিত্রা'র গ্রাহক-পাঠক বলতে লাগলেন, 'পথের পাঁচালী' শেষ হয়ে গেলে, 'বিচিত্রা' আর পড়বেন না তাঁরা। এমন হল কেন? সে যুগ তো বাংলাসাহিত্যে যথেষ্ট ঘটনা-বহুল, সৃষ্টিশীল। 'কল্লোল'-'কালিকলম'-এর তীক্ষ্ণতায় তখন বাংলার প্রগতিবাদী তরুণদের ছিন্নমূল আধুনিকতা এক ধরনের আশ্রয় পেয়েছে। এই আশ্রয়ের বোধ তাদের আরও শূন্য কোনো নিরাশ্রয়ে চিহ্নিত করবে কিনা, সে তো ভবিষ্যতের প্রশ্ন। আর রবীন্দ্রনাথে বাঙালির সম্ভ্রম, শরৎচন্দ্রে বাঙালির অভ্যাস তখন এতই স্বাভাবিক যে, তার আলাদা উল্লেখ যেন বাহুল্যমাত্র। সেই সময়, একেবারে নতুন কোন্ এক বিভূতিভূষণ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'র প্রায় শেষ পর্বে পৌঁছিয়ে সরস্বতী পুজো করলেন নিজের পদ্ধতিতে। সেটা ছিল ১৯২৮ সালের ২৭ জানুয়ারি। বিহারের সেই নির্জন কাশবনের চরে বিভূতিভূষণ ফুলচন্দন দিয়ে পুজো করেন মহানন্দ কথকের পশ্চিমভ্রমণের ডায়েরি আর তাঁর ছেঁড়া

রামায়ণ। নায়েববাবুর বাড়ি থেকে আল্পনা দেওয়া পিঁড়ি আনা হল। তার উপরে রাখা হল এন্‌ট্রান্স ফেল কথকঠাকুরের জরাজীর্ণ খাতা আর রামায়ণ (স্মৃতির রেখা. বি র ১ : ৩৯৯)। এক বছরের বেশি সময় ধরে যখন 'বিচিত্রা'য় 'পথের পাঁচালী' বেরোচ্ছে, পাশাপাশি চলছে তাকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের আয়োজন। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা (সম্ভবত কার্তিক সংখ্যা নয়; কারণ 'পথের পাঁচালী'র ধাবাবাহিক প্রকাশ আশ্বিনে শেষ হয়েছে। আব 'আশ্বিনের মাঝামাঝি বাহির হইবে' এই বয়ান কার্তিক সংখ্যায় থাকবে কী করে? অবশ্য শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, যে কোনো একটি সংখ্যাতে বিজ্ঞাপনটি ছিল নিশ্চয়। ১৩৩৬-এব বাঁধানো 'বিচিত্রা'য় শুধু ষাণ্মাসিক সূচি আছে, মাসিক সূচিগুলি বাঁধানোর সময় বাদ পড়েছে।) 'বিচিত্রা'য় সূচীপত্রের চতুর্থ পৃষ্ঠার নিচে ছাপা হযেছিল 'পথেব পাঁচালী' গ্রন্থের বিজ্ঞাপন :

পথের পাঁচালী

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন ধরণের উপন্যাস। প্রকৃতির স্বাধীন আবহাওয়া একটি শিশু-চিত্তকে কি ভাবে ধীবে ধীবে সংসার-সংগ্রামের উপযোগী করিয়া তুলিতেছে তাহারই বিচিত্র ইতিহাস অপরূপ ভঙ্গিতে বলা হইয়াছে। শিশু মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য ইতিপূর্বে আর কেহ এদেশে এরূপ ভাবে উদ্‌ঘাটিত কবেন নাই; অন্য দেশেও কেহ করিয়াছেন কিনা আমাদের জানা নাই।

উপন্যাসখানি 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। ইতিমধ্যেই সাহিত্য-রসিক মহলে ইহার সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা হইয়াছে।

আশ্বিনের মাঝামাঝি বাহির হইবে।

মূল্য তিন টাকা

রঞ্জন প্রকাশালয়

২০৬নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট [রুম নং ১৬/১ শ্রীমাণি মার্কেট, দ্বিতল]

প্রাপ্তিস্থান : ডি. এম. লাইব্রেরী, ৬১নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

(বি র ১ : ৪৩৩)

'শনিবারের চিঠি'র আশ্বিন ১৩৩৬ সংখ্যার শেষে ছিল রঞ্জন প্রকাশালয়ের পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন : 'বাঙলা সাহিত্যে নবযুগ ১৩৩৬ সাল'; কেন নবযুগ, তার কারণ হিসেবে যে বইগুলি বেরোনোর খবর ছিল, সেই তালিকার শুরুতেই শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'পথের পাঁচালী'র নাম। ততদিনে বিভূতি-

ভূষণের অরণ্যপ্রবাস শেষ হয়েছে। সিদ্ধেশ্বর ঘোষ পিতামহ খেলাতচন্দ্রের নামে ৬৪এ ধর্মতলা স্ট্রিটে যে খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেখানে যোগ দিয়েছেন বিভূতিভূষণ ওই ১৯২৯ সালেই। নুটুবিহারী ম্যাট্রিক পাস করেছেন। ডাক্তারি পড়েন ক্যাম্পবেলে। বিভূতিভূষণ এবং নুটুবিহারী, দুজনেই তখন ৪১ মির্জাপুর স্ট্রিটের মেসবাড়িতে থাকেন। ওই যে বিজ্ঞাপন বেরোলো 'বিচিত্রা'য় তার পিছনেও আছে যথেষ্ট অমসৃণ এক কাহিনী। দীপ জ্বালানোর আগে কেবল সলতে পাকানোরই নয়, সেই সলতের কাপড়টুকুর, প্রদীপের তেল-টুকুর সংস্থানের আখ্যানও বটে। নামি দামি প্রকাশকেরা কেউ সেদিন রাজি হননি 'পথের পাঁচালী' ছাপতে। এক প্রকাশক চেয়েছিলেন মাত্র পঞ্চাশ টাকায় কপি-রাইট কিনতে। আর একজন বলেছেন, বই ছেপে বিক্রি হলে কিছু রয়ালটি দিতে পারেন। নীরদচন্দ্র আক্ষেপ করেন 'প্রবাসী' কার্যালয়ে বসে ' "পথের পাঁচালী"র মত উপন্যাসের একজন ভদ্র প্রকাশক জুটিল না, বাংলা সাহিত্যের পক্ষে ইহা দুর্ভাগ্যের কথা।' সজনীকান্ত দাস 'বিচিত্রা'র ফাইল সংগ্রহ করে প্রকাশিত অংশ পড়লেন, ধারাবাহিক প্রকাশ তখনও চলছে। সজনীকান্তের ভাষায় 'বেশ বুঝিতে পারিলাম, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের বাংলা সাহিত্যে অভিনবের আবির্ভাব হইয়াছে।' সজনীকান্তর মাসিক বেতন তখন দেড়শ টাকা। কলকাতা শহরে ভাড়াবাড়িতে সংসারযাত্রা, হঠাৎ কোনো অর্থপ্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু তিনিই বললেন, বিভূতিভূষণ রাজি থাকলে, 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশ করবেন তিনি।

নীরদচন্দ্র বিস্মিত এবং অবশ্যই আনন্দিত। তিনি তখনি ৪১ মির্জাপুর স্ট্রিটের মেসে ছুটলেন, বিভূতিভূষণকে 'প্রবাসী' অফিসে নিয়ে আসতে। লিখিত কণ্ট্র্যাক্ট হবে সজনীকান্ত দাস এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ঠিক হল, গোপাল হালদার এবং সজনীকান্ত দাস পুস্তক-ব্যবসা করবেন। গোপাল হালদারের বাবা তখন নোয়াখালি লোন অফিসের প্রধান কর্মসচিব। তাঁর কাছে প্রয়োজন মতো অর্থ ঋণ পাওয়া যাবে, এরকম আশ্বাস দিলেন গোপাল হালদার (সজনীকান্ত দাস, ১৩৮৪ ব: ২৭৭-৮)। গোপাল হালদারের পিতা ঋণদান অফিসের প্রধান ছিলেন এবং সেই সূত্রেই অর্থপ্রাপ্তির আশ্বাস দিয়েছিলেন গোপাল হালদার, সজনীকান্ত দাসের দেওয়া এই তথ্য পরবর্তী কালেও বিভূতিগবেষকরা ব্যবহার করেছেন। সম্প্রতি গোপাল হালদারের ভাই নিত্যানন্দ হালদার এতদিনের জানা কথাটির ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'আমার বাবা সীতাকান্ত হালদার নোয়াখালি শহরে ওকালতি করতেন। তিনি ঋণদান অফিসে চাকরি

করতেন না। আর "পথের পাঁচালী" গ্রন্থ প্রকাশ করবার জন্য আমার দাদা ৺গোপাল হালদার ২৫০ টাকা দেন। তিনি স্বভাবতই প্রচারবিমুখ ছিলেন, তা তিনি কখনও প্রকাশ করতে চাননি।' (নিত্যানন্দ হালদার, ৩ ডিসেম্বর ১৯৯৪ : ১৮)। ১৯২৯ সালে আড়াইশো টাকার সংস্থান গোপাল হালদার কীভাবে করেছিলেন, তা জানি না। কিন্তু সজনীকান্ত দাস লিখেছেন, গোপাল হালদার এবং তিনি পরামর্শ করে 'পথের পাঁচালী'র জন্য বিভূতিভূষণের সম্মান-দক্ষিণা তিনশো টাকায় ধার্য করলেন। সজনীকান্তর লেখায় আরও আছে, 'ইহাও আজ বলিতে বাধা নাই যে, আরও মাত্র দুইশত টাকা দক্ষিণা বাড়াইয়া দিলে আমরা "পথের পাঁচালী"র কপিরাইট খরিদ করিতে পারিতাম। কিন্তু গ্রন্থকারদের রক্ষা করিবার প্রেরণাই যাহাদের প্রকাশক হইবার মূলে, তাহারা এইরূপ প্রস্তাব সে যুগে সঙ্গত হইলেও করিতে পারে নাই।'

বিভূতিভূষণ অবশ্য তিনশো টাকায় রাজি নন। শিশু-সুলভ হাবভাবেই বললেন, দরাদরি না হলে ব্যবসা কিসের। 'পথের পাঁচালী'র প্রথম সংস্করণের ১১০০ কপির জন্য তাঁর দাবি তিনশো পঁচিশ টাকা। সজনীকান্ত দাস আর গোপাল হালদার সানন্দে রাজি। সজনীকান্ত দাসের কথায়, 'বিভূতিভূষণ ও আমার মধ্যে লেখাপড়া হইবে, সাক্ষী থাকিবেন নীরদচন্দ্র ও গোপাল—এইরূপই স্থির হইল। কিন্তু প্রকাশালয়ের নাম একটা দরকার, নহিলে দলিল হয় না। গৃহিণী তখন আসন্নপ্রসবা। আমার বরাবরই ধারণা ছিল, প্রথমটি পুত্র-সন্তান হইবে। সেই দিন সেই মুহূর্তে দলিল প্রস্তুত করিবার পূর্বে তাহার নাম রঞ্জন রাখা স্থির করিলাম এবং তাহার নামে আমাদের পুস্তক-প্রকাশ-প্রতিষ্ঠানটির নাম "রঞ্জন প্রকাশালয়" রাখা হইল এবং "রঞ্জন প্রকাশালয়ে"র পক্ষে আমি দলিলে সহি করিলাম। গোপাল অন্তরালে রহিলেন এবং শেষ পর্যন্ত অন্তরালেই রহিয়া গেলেন।' (সজনীকান্ত দাস, ১৩৮৪ ব : ২৭৮-৯)। এই অন্তরাল ভেঙে আজও জানা গেল না গোপাল হালদার টাকা কীভাবে সংগ্রহ করেছিলেন। এমনকী টাকা যে তিনি বাবার কাছে পাননি, সেই তথ্য পেতেই তো শেষ হয়ে গেল ১৯৯৪ সাল। সজনীকান্ত অবশ্য লিখেছেন, 'গোপাল সেই রাত্রেই পিতার নিকট অর্থ সংগ্রহার্থে নোয়াখালি রওয়ানা হইলেন, বিভূতিভূষণকে পঁচিশ টাকা মাত্র বায়না দিলাম।' যদিও রঞ্জন প্রকাশালয় শুরু হয়েছিল 'পথের পাঁচালী' প্রকাশ করতে, সেখানকার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ সজনীকান্তর 'অজয়'। আকারে ছোট বলে 'অজয়ে'র ছাপা আগে হয়ে যায়। 'অজয়' বেরোয় ১৯২৯-এর ১৭ অগাস্ট আর

'পথের পাঁচালী' সেই বছরের ২ অক্টোবর, অর্থাৎ মহালয়ার দিনে। সজনীকান্তকে উপহার দেওয়া 'পথের পাঁচালী'তে বিভূতিভূষণ স্বাক্ষর করেন 'অপু' লিখে। সজনীকান্তও বিভূতিভূষণকে 'অজয়ে'র যে কপিটি দেন তাতে লেখেন 'অপুকে অজয়'। (সজনীকান্ত দাস, ১৩৮৪ ব : ২৮১-২)।

১৯২৯ সালের সেই মহালয়ার দিন। বিভূতিভূষণ দিনলিপিতে লেখেন, 'আজ বই বেরুল…প্রবাসী অফিসে বসে এই কথাই কেবল মনে উঠছিল যে আজ মহালয়া, পিতৃতর্পণের দিনটা, কিন্তু আমি তিলতুলসী তর্পণে বিশ্বাসবান্ নই—বাবা রেখে গিয়েছিলেন তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করবার জন্যে, তাই যদি করতে পারি, তার চেয়ে সত্যতর কোনো তর্পণের খবর আমার জানা নেই।…বিশ বৎসর পূর্বের সে অতীত জীবনের কত হাসি কান্না ব্যথা বেদনা, কত অপূর্ব জীবনোল্লাসের স্মৃতি আমার মনকে বিচিত্র সৌন্দর্যের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল। আমার সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টির প্রচেষ্টার মূলে তাদেরই প্রেরণা, তাদেরই সুর।…বিশ বৎসরের দূর জীবনের পার হতে আমি আমার সে পাখী-ডাকা, তেলাকুচা-ফুল ফোটা, ছায়াভরা মাটির ভিটাকে অভিনন্দন করে এই কথাটি শুধু জানাতে চাই… ভুলিনি। ভুলিনি। যেখানেই থাকি ভুলিনি…তোমারই কথা লিখে রেখে যাবো… অভিনন্দন পাঠাই সেই সব লোকদের—যাদের বেদনার রঙে আমার বই রঙীন হয়েচে—কত স্থানে, কত অবস্থার মধ্যে তাদের সঙ্গে পরিচয়…এরা আজ কোথায় আছে জানিনে। কোথায় পাবো ঝালকাটির সেই ভিখারীকে, কোথায় পাবো আজ হিরুকাকাকে, কোথায় পাবো কামিনী বুড়ীকে—কিন্তু এই নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার-ভরা শান্তির মধ্য দিয়ে আমি সকলকেই আমার অভিনন্দন পাঠিয়ে দিচ্চি।' (তৃণাঙ্কুর, বি র ২ : ১৬২-৩)। জীবনের প্রথম উপন্যাস বিভূতিভূষণ উৎসর্গ করেছিলেন পিতৃদেবকে। আর এই 'পথের পাঁচালী' প্রকাশের দিনটিও বুধবার পড়ে যাওয়ায় বিভূতিজীবনে বুধবারের একটি খেলা দেখে নিতে পারেন পাঠক। বিভূতিভূষণ জন্মেছিলেন এক বুধবারে, সেই একই বারে 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেল। বিভূতিভূষণের পুত্র তারাদাসের জন্ম হয়েছিল, সেও এক বুধবার। আর যে ১ নভেম্বর ১৯৫০ বিভূতিভূষণের মৃত্যু, সেদিনটিও ছিল বুধবার।

যন্ত্রণার নিরাময় নিরাময়ের যন্ত্রণা

বাংলাসাহিত্যে 'পথের পাঁচালী'র আবির্ভাবলগ্নটিকে যথার্থ বিন্যাসে গেঁথেছিলেন গোপাল হালদার। কেন যে হরিহরের সংসারের সেই শ্লথ দৈনন্দিনে, বাঙালি

নিজের মর্মের বড় কাছের সুর শুনল, তার কার্যকারণ একভাবে তিনি নির্দেশ করে দেন। গোপাল হালদারের লেখায় আছে, '"গল্পগুচ্ছের" যুগ ছাড়িয়ে যখন রবীন্দ্রনাথ "সবুজ পত্রের" যুগ পেরিয়ে যাচ্ছেন, "রামের সুমতি" "বিন্দুর ছেলে"র ভূমিকা শেষ করে শরৎচন্দ্র যখন তাঁর "পল্লী-সমাজের" যুগের মধ্যপথে, তখন প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী নিরাবরণতাকে স্বাগত করে বাঙলা সাহিত্যে উপস্থিত হলেন, প্রথমে শৈলজানন্দ, পরে "কল্লোল", "কালি-কলমের" লেখকেরা। বাস্তববাদ মানে অবশ্য নিরাবরণতাবাদ নয়। কিন্তু বাঙালী লেখকের চোখ শরৎচন্দ্র-শৈলজানন্দের দৃষ্টি অনুসরণ করে ফিবল বাস্তবের দিকেই। রোমান্‌স্‌-এ এসেছিল তাদের অশ্রদ্ধা, তাই রবীন্দ্রনাথেব প্রতিও তারা সেদিন বিমুখ (অবশ্য তার অর্থ রোমান্‌সেব প্রতি বিমুখিতা নয়; একটা বর্ণচোরা রোমান্‌স-পিপাসাই ছিল তারও মূল)। কিন্তু চোখ অন্যদিকে ফিরলেও তাঁদের দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়নি। তাঁরা বাস্তবকে দেখছিলেন পাশ্চাত্য সাহিত্যের ধাব-করা ধারালো দৃষ্টিতে। তাই সেই পুঁথি-পড়া বাস্তবকে তাঁবা পাশ্চাত্য ধারায় খুঁজছিলেন বাঙলা দেশের শহরে, বস্তিতে, খনির অপরিচিত অস্পষ্টতায়; —কদাচিৎ অস্পষ্ট পল্লীসমাজে। যে বাঙলার শতকরা ৯০ ভাগ জীবন পল্লী-কেন্দ্রিত, সেখানে শতকরা ৯০ ভাগ বাস্তব সাহিত্য শহরকেন্দ্রিত এ প্রয়াসও নিশ্চয়ই শতকরা ততো ভাগই ছিল মূল্যহীন। কিন্তু তা মূল্যহীন হয় তাদের আরও উদ্ভট ভাবনা ও অবাস্তব চরিত্র পরিকল্পনায়। বাঙলা কথা-সাহিত্যের মোড়ও বাস্তবের দিকে ঘুবতে না ঘুরতেই আবার অবাস্তবের চোরাবালিতে আটকে গেল। তার কারণ এই যে, ইংরেজ আমলের বাঙালী মধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার মূলেই ছিল না মাটি।

'এমনি সময়ে "যোগাযোগ" শেষ হয়েছে "বিচিত্রায়", "শেষের কবিতা" শেষ হয়েছে "প্রবাসীতে", "পথের পাঁচালী" আরম্ভ হল "বিচিত্রায়"।···বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটে "সাহিত্য সেবক সমিতির" অনুষ্ঠিত "পথের পাঁচালীর" সম্বর্ধনাসভায় ব্যারিস্টার, অধ্যাপক ও বিদগ্ধজনের অভাব ছিল না···অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একটু সলজ্জ সংকোচে জানান, "আমি চিরদিনের কলকাতার মানুষ। বাঙালীর পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীজীবনের সঙ্গে এমন আজন্ম পরিচয়ের দাবি করতে পারি না। কিন্তু বেশ একটা মমতা অনুভব করি তার জন্য, তাতে ভুল নেই। আর "পথের পাঁচালী"র অপুর সঙ্গে অনুভব করি বাঙালী শিশুর অভিন্নতা।"

'চিরদিনের কলকাতায় মানুষ হলেও কলকাতাই যে ইংরেজের, —এখন হয়ত আবার মারোয়াড়ী-ভাটিয়ারও। বাঙলার পল্লীর জন্য তাই একটা অশ্রু-সজল

মমত্ব-বোধ—nostalgia—এই কলকাতার মানুষদেরও মনে জীইয়ে আছে, আর পল্লীত্যাগী শহরমুখো শিক্ষিতের মধ্যেও রয়েছে সেই স্মৃতি। ম্যালেরিয়ার ডিপো, এই এঁদো পুকুর ও বাঁশঝাড়ের গ্রাম, তা ঠিক। দলাদলি, কুড়োমি ও গোঁড়ামিতে তা উচ্ছন্ন যেতে বসেছে, তাও সত্য। কিন্তু আরও সত্য একটা আছে তাও বুঝতাম। "গল্পগুচ্ছের" রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রলোকের ওপার থেকে তার উপরে তাঁর কবি-দৃষ্টির কিরণরেখাটি পাত করে আমাদের তা জানিয়েছিলেন। কিন্তু সে দেখা তবু জানতাম কাব্য-চন্দ্রিকার কাকজ্যোৎস্নায় দেখা বাঙলার পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীজীবন। তাই একটা অর্ধ অবিশ্বাসও তাতে জাগ্রত থেকেই যায়। কিন্তু "পথের পাঁচালীতে" এখন আমরা সেই পল্লীপ্রকৃতিতে দেখলাম ঠিক চন্দ্রলোকের মানুষের চোখে নয়। বরং অতিপরিচিত এই বাঙলা দেশের গ্রাম থেকেই সেই গ্রাম্যপথ রেখাটি চন্দ্রলোকের দিকে উঠে গিয়েছে···না, এ পথ সেই পৃথিবী-ছাড়া রোমান্সের পথ নয়। প্রত্যেকটি গাছ লতা আর ফুল এখানে আপন স্বতন্ত্র অস্তিত্বের দাবিতে নাম নিয়ে উপস্থিত—কোনো ফুল, কোনো গাছ, কোনো লতা শুধু নাম না-জানা ফুল বলে, গাছ বলে, লতা বলে,—একাকার হয়ে যায়নি।···প্রকৃতি বলে একটা কিছু যে আছে—আর তা আছে শুধু "ডেজি", "ডেফোডিল", "প্রিম্‌-রোজে" নয়, শুধু পাহাড়ে পর্বতে সমুদ্রে—নদীসৈকতে নয়, সাঁওতাল পরগণায় বা দার্জিলিং-এও নয়—আছে তা আমাদেরই ঘরের দুয়োরে—ঝোপে ঝাড়ে বনে জঙ্গলে এঁদোপুকুরের পাশে, আশ্‌শ্যাওড়ার বনে, তেলকুচার, ঘেঁটুফুলের বিশিষ্ট গন্ধে—আমাদের এই চেতনাকে সেদিন আমাদের হয়ে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন বিভূতিভূষণ—বাঙলা পল্লীপ্রকৃতির প্রতি যে মমতা আমাদের ছিল তা এক মুহূর্তে এইখানে আত্মউপলব্ধি করলে। আর শহুরে-সভ্যতায় আমাদের কোনো সৃষ্টি সার্থকতা নেই বলেই এই শহর-ত্যাগী পল্লী-প্রশস্তিতে আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করলাম আরও বেশি—হোন্‌ তিনি কলকাতার মানুষ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বা কলকাতা-প্রবাসী ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জের নীরদচন্দ্র চৌধুরী।' (গোপাল হালদার, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ ব ক: ৪৭-৫০)। গোপাল হালদারের এই বিন্যাসে একদিকে অনেকটাই মিলে যায় সেই প্রশ্নের উত্তর যে কেন 'বিচিত্রা'র পাঠক-গ্রাহক সরবে বলেন, 'পথের পাঁচালী' শেষ হয়ে গেলে, 'বিচিত্রা' আর পড়বেন না তাঁরা; অন্যদিকে এই বিশ্লেষণে খুঁজে নেওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের সেই মন্তব্যের কার্যকারণ যে 'পথের পাঁচালী' দাঁড়িয়ে আছে তার আপন সত্যের জোরে।

এই সত্যের বিন্যাসে যন্ত্রণা বড় কম নয়। কারণ যে কলকাতামুখী যাত্রাপথের

কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন বিভূতিভূষণ,সে অগ্রগমনের পথ "বল্লালীবালাই"-"আম-আঁটির-ভেঁপু"-"অক্রূর-সংবাদে"র শক্তি-মমতা-আন্তরিকতার সম্পদকে অনেকখানি উপেক্ষা করে তবেই নিজের ভিত গাঁথতে পারে বিভূতিভূষণের দেশে। বারাকপুর-বনগ্রাম-কলকাতা-জাঙ্গিপাড়া-হরিনাভি-চট্টগ্রাম-ভাগলপুরের বিভূতিভূষণ কি একভাবে বুঝতেন যে জীবন-জীবিকার কোন্ আবর্তে এসে পড়েছেন তিনি 'পথের পাঁচালী'কার হতে হতে? সেদিন বিভূতিভূষণ যে জগতের বাসিন্দা, সেখানে ইন্দিরের, সর্বজয়ার, গোকুলকাকার বউ খুড়িমার জীবনভর অপচয়ের কোনো প্রতিকার নেই। বরং এমন সব জীবনের অপচয়ের মূল্যেই বিভূতিভূষণের আব তাঁর অপূর্বকুমারের সামনে যশ-খ্যাতি-প্রতিষ্ঠার দুয়ার যেন আরও প্রশস্ত খুলে যাচ্ছে। ১৯২৯-এ 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হওয়ার পরেই বিভূতিভূষণ চলে যেতে পারেন তাঁর বারাকপুর গ্রামে, কাটাতে পারেন সেখানে বেশ কিছুদিন। কিন্তু যে স্মৃতির, যে অভিজ্ঞতার স্পর্শ-বর্ণ-গন্ধ সঞ্চয় নিয়ে বারাকপুর গ্রামের বিভূতি আজ 'পথের পাঁচালী'কার হয়েছেন, সেইসব স্মৃতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, সেইসব অভিজ্ঞতায় সংলগ্ন কত মানুষ পড়ে রইল কোথায়? নীরদচন্দ্র-সুনীতিকুমার-সজনীকান্ত-গোপাল হালদার-বিভূতিভূষণদের আকাঙ্ক্ষিত আলোর থেকে কতদূরে তো তাদের অবস্থান! এই আধুনিক আলোর বাহানায় তারা যেন বিভূতিভূষণের চোখের সামনেই আঁধার থেকে আরও আঁধারে ক্রমশ তলিয়ে যায়! অথচ ওই আলোকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করলে, সেই মানুষগুলোর কাহিনী কি লেখা যায়? পৌঁছনো যায় কি বাঙালি পাঠকের দরবারে? এই দ্বন্দ্বের বোধ কি পেয়ে বসত 'পথের পাঁচালী'র বিভূতিভূষণকে, যখন তিনি তাঁর ছায়াভরা মাটির ভিটাকে জানাতে চাইতেন, '…ভুলিনি। ভুলিনি। যেখানেই থাকি ভুলিনি…'?

এডওয়ার্ড টমসন যখন তাঁর বইতে 'পথের পাঁচালী'র সপ্রশংস উল্লেখ করেন, বিভূতিভূষণ আপার সারকুলার রোডের উপরে গোপাল হালদারকে দেখতে পেয়ে শিশুর উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারেন না, 'শুনেছেন, টমসন এ কথা বলেছে। দেখবেন শরৎচন্দ্র-টরৎচন্দ্র সব ম্লান হয়ে যাবে, ওসবে কিছু নেই।' গোপাল হালদার হেসে বলেন, 'তা না জানলে আমরা "পথের পাঁচালী" পয়সা খরচ করে প্রকাশ করতে উদ্যোগী হতাম?' (গোপাল হালদার, অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ ব : ২১১)। বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে লেখা হয়, '…গেলাম প্রমথ চৌধুরীর বাড়ি বালিগঞ্জে। তিনি আমার বইখানা পড়ে খুব খুশী হয়ে আমার সহিত পরিচিত হবার ঔৎসুক্য

জানিয়েছিলেন···তিনি নাকি বলেচেন—In Europe, he could have been a celebrity; কিন্তু এখানে কে খাতির করবে?···আমার বইখানা সম্বন্ধে প্রমথবাবু নানা কথা বললেন—দেখলাম বইখানি খুব ভাল করে পড়েচেন। দুর্গার সিন্দুর-কৌটা চুরি ও সেটা কলসী থেকে বেরুনোর উল্লেখটা বার বার করলেন।' (তৃণাঙ্কুর, বি র ২ : ১৮৭)। মোহিতলাল মজুমদার কবি যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চীর সঙ্গে বিভূতিভূষণের পরিচয় করাতে গিয়ে বলেন, 'অল্পদিনের মধ্যেই ইনি যশস্বী হয়ে উঠেচেন একখানা বই লিখে, luck আছে বলতে হবে।' রবিবাসরের নিমন্ত্রণে গিয়ে আলাপ হয় রাজশেখর বসুর সঙ্গে। 'অপরাজিত' তখনও গ্রন্থাকারে বেরোয়নি, ছাপা হচ্ছে 'প্রবাসী'তে। রাজশেখর জানালেন, 'অপরাজিত' তাঁর খুব ভালো লেগেছে। (তৃণাঙ্কুর, বি র ২ : ১৮৪, ১৮৬)।

বাংলাসাহিত্যে বুদ্ধিবাদী উপন্যাসের সঙ্গে যে নামটি ওতপ্রোত জড়িত, সেই ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'উত্তরা' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে, '···বিভূতি বন্দোর "পথের পাঁচালী" পড়েছ? আমি ভাই মুগ্ধ হয়েছি। আজ যদি আমি এই বই সম্বন্ধে কিছু লিখি তা হলে সে লেখা উচ্ছ্বাসপূর্ণই হবে। ···বইখানি আমি অন্ততঃ দু'বার পড়লাম। এখনো আমার মতামত সংযত করতে পারলুম না। ···এমন ভাষা, এমন গাম্ভীর্য, এমন nature study, এমন সূক্ষ্মদৃষ্টি, এমন চরিত্রাংশ, এমন পবিত্রতা আমাদের সাহিত্যে দুর্লভ। ···প্রত্যেককে পড়তে অনুরোধ কোর—আমিও করছি···।' 'পথের পাঁচালী'র যে আলোচনা 'উত্তরা'র মাঘ ১৩৩৬ সংখ্যায় করেছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ, তাও একান্ত সপ্রশংস। বিবাদী সুর একটিই ছিল, 'যেদিন বিভূতিবাবু Romain Rolland যে তাঁর আদর্শ এই কথাটি ভুলে যাবেন সেই দিন বাংলা সাহিত্যের শুভ দিন। ···বিভূতিবাবুর নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা আছে—তাই এই কথাটির উল্লেখ করলুম।' (ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ১৯৮৭ : ২৮৩, ২৮৯)।

অবশ্য বিপদও ঘটে যায় মাঝে মধ্যে। ডক্টর সুশীল দে'র বাড়িতে আড্ডায় আছেন মোহিতলাল, সজনীকান্ত, বিভূতিভূষণ, আরও কেউ কেউ। কথার ফাঁকে সুশীলবাবু বিভূতিভূষণের ঠিকানা চাইলেন। দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ লিখছেন, 'ডঃ দে আমার ঠিকানা চাইলে বিপদে পড়লুম—এ বাসাটা যদি বদলাই তবে, বদলে ফেললে এ ঠিকানাটা দিয়েই বা লাভ কি?' (তৃণাঙ্কুর, বি র ২ : ১৮৪)। 'পথের পাঁচালী'-'অপরাজিত'র যশের সঙ্গে ৪১ মির্জাপুর স্ট্রিটের অপরিচ্ছন্ন সংকীর্ণ বাসস্থান প্যারাডাইস লজের কোনো অসংগতিও কি তবে বিভূতিভূষণকে মাঝে-

মধ্যে ছুঁয়ে যেত ? 'অপরাজিত' উপন্যাসের সেই অংশটি কি তখন লেখা হয়ে গেছে, যেখানে নতুন লেখক অপূর্বকুমার রায়ের সংকীর্ণ অপরিষ্কার বাসাবাড়িতে হঠাৎ এসে পড়েছিল 'বিভাবরী' পত্রিকার এক প্রতিনিধি, প্রশ্ন করেছিল, '···ইয়ে, এই ঘরটাতে আপনি থাকেন বুঝি ?' (বি র ৩ : ১৩৫)। যখন 'পথের পাঁচালী' গ্রন্থাকারে বেরিয়ে গেছে, 'অপরাজিত' প্রকাশিত হচ্ছে 'প্রবাসী'র পাতায়, তখন তো বিভূতিজীবনের এমনি সময় যে, অমল হোমের বাড়িতে 'অপরাজিত'র মুগ্ধ পাঠিকারা অপেক্ষা করেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আশায়। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বিভূতিভূষণের মনে হয়, 'এঁরা বেশ শিক্ষিতা মেয়ে, ধরণ-ধারণ এত মার্জিত ও মধুর যে এঁদের সঙ্গে গ্রামের মেয়েদের —সইমা কি বুড়ি পিসিমা—এদের তুলনা করে হতাশ হতে হয়।' (তৃণাঙ্কুর, বি র ২ : ১৮৪)। একই দিনলিপিতে বারাকপুর গ্রামের মেয়ে-বউদের নিয়ে আগেও লিখেছেন, 'এই সুন্দর দেশে বাস করেও যারা মানসিক কষ্ট পাচ্ছে··· তাদের সে কষ্ট সম্ভব হচ্চে শুধু অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের জন্য। ···কতকগুলো মিথ্যা সংস্কার ও কাশীরাম দাস এবং কৃত্তিবাস ওঝার প্রচলিত কতকগুলো **False Philosophy** এদেশের অশিক্ষিতা মেয়েদের মনের সর্বনাশ করেচে।···পল্লী-অঞ্চলগুলো এমন হয়ে আছে, এদের দুঃখ দূর করতে গেলে তো জঙ্গল কাটালে হবে না, মশা তাড়ালেও হবে না (সেটা যে অনাবশ্যক, তা আমি বলচি না) মাসিক কিছু অর্থসাহায্যের বন্দোবস্ত করলেও হবে না—এর জন্যে চাই জ্ঞানের আলো—উদার, বিপুল, দীপ্ত জ্ঞানের সার্চ লাইট।' (তৃণাঙ্কুর, বি র ২ : ১৭৭-৮)। কিংবা, এমন কথাও পাওয়া যায় বিভূতিভূষণের দিনলিপিতে যে, 'ওরা পরকে ভাবে শেয়াল-কুকুর, কিন্তু নিজেরা যে কিসের মত জীবনযাপন করে তা কি ভেবে দেখেচে ?' (উৎকর্ণ, বি র ৪ : ৩১১-২)। আসলে মার্জিত মাধুর্যের জগতে বিভূতিভূষণ তো ক্রমশই আরও আরও প্রতিষ্ঠিত !

তবে কি পুরোপুরি মেনে নেওয়া যায় গোপাল হালদারের মতো গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সাহিত্যপাঠকেরও এমন মন্তব্য যে 'অপু শিশুই থাকতে চায় ; দ্বন্দ্বময় জীবনকে সে চায় না, সম্ভবত চিনেও না। তার শিশুমন তাই শুধু স্মৃতিমন্থনেও আশ্রয় পায় না, আশ্রয় খোঁজে তখন অতি-প্রাকৃতের স্বপ্নে, ভাববিলাসে। বিস্ময়সন্ধানী দৃষ্টি তখন চায় "দৃষ্টিপ্রদীপ", "দেবযান"।···দ্বন্দ্বভীত মানুষ আসলে জীবনভীত মানুষ। আপনার শিশুজীবনকে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারেনি বিভূতিভূষণের সাহিত্য-জীবন। "পথের পাঁচালীর" কীর্তিকে তাই আর

ছাড়িয়ে যেতে পারেনি বিভূতিভূষণের কোনো কৃতিত্ব'? (গোপাল হালদার, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭ ব ক: ৫৩)। বিভূতিভূষণ কি শৈশবে আচ্ছন্ন সাহিত্যজীবন নিয়েই পৌঁছে যান 'অপরাজিত'র অংশবিশেষে, 'আরণ্যকে', 'অনুবর্তনে'? নাকি মাঝেরপাড়া স্টেশনের ডিস্‌ট্যান্‌ট সিগ্‌ন্যালের পিছনের সঙ্গে সেই সিগ্‌ন্যালের সামনের জীবনটার দ্বন্দ্ব, নাবালকের জ্ঞানপিপাসার সঙ্গে সাবালকের অর্জনের দ্বন্দ্ব, বারাকপুরের বিভূতির সঙ্গে মফস্বলের কি কলকাতার স্কুলশিক্ষকের, জমিদারি সেরেস্তার কর্মচারীর, এমনকী বাংলার স্বনামধন্য সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বন্দ্ব বড় বেশিই প্রত্যক্ষ ছিল বিভূতিভূষণের জীবনে? কিন্তু সেই দ্বন্দ্বের ব্যঞ্জনাকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যগ্রতায়, তিনি কি বিচ্যুত হতে চাইতেন না পাঠকের জন্য যথার্থ শিল্পীসুলভ প্রতীক্ষা থেকে? এমনকী, এই প্রতীক্ষাকে যেন তেমন ব্যগ্র অথবা আর্ত বলে চেনা না যায়, সে বিষয়েও কি তাঁর আয়োজন ছিল একান্ত সতর্ক এবং সযত্ন? তাই কি সমকালীনদের চোখে তাকে মাঝেমধ্যে দেখাত দ্বন্দ্বহীনের মতো?

সজনীকান্ত দাস বিভূতিভূষণের কথায় লিখেছিলেন, '...তিনি ছিলেন ঢিলাঢালা—হচ্ছে-হবে-গোছের মানুষ, সুচিরকাল অপেক্ষা করার স্থৈর্য তাঁহার ছিল।' (সজনীকান্ত দাস, ১৩৮৪ ব: ১৭৯)। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর স্মৃতিচারণে আছে, 'Once, when to my thinking he was being lazy over the completion of his first novel, I wrote to him that he must hurry up, because some others—I gave names—were already becoming well established without having his ability. He replied that it did not matter, he did not grudge anybody's success, nor did he feel upset by his slowness. He would do what he wanted to do in his time, and he did.' (Chaudhuri, 1987: 95-6)। সজনীকান্তের যাকে মনে হয় সুচিরকাল অপেক্ষা করবার স্থৈর্য, নীরদচন্দ্রের লেখায় যাকে মনে হয় নিজের সময়জ্ঞানে এবং অভীষ্টে অবিচল থাকবার নিবৃত্তি, তা কি আসলে ওই প্রতীক্ষারই অংশ? যে প্রতীক্ষার অন্তর থেকে এমনকী গোপাল হালদারও খুঁজে পান না শিশুসুলভ বিভূতিভূষণের দ্বন্দ্বকে। বুদ্ধিবাদী বলে স্বীকৃত যে পত্রিকা, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সেই 'পরিচয়'-এ একের পর এক আলোচনা বেরোয় বিভূতিসাহিত্যের। রবীন্দ্রনাথের 'পথের পাঁচালী' নিয়ে আলোচনা ছিল বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৪০ সংখ্যায়। তার আগে পশুপতি ভট্টাচার্য

লিখেছেন 'মেঘ-মল্লার' প্রসঙ্গে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায়। শ্রাবণ ১৩৩৯ সংখ্যায় 'অপরাজিত'র সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন নীরেন্দ্রনাথ রায়, মাঘ ১৩৩৯-এ 'মৌরীফুলে'র এবং মাঘ ১৩৪১-এ 'যাত্রাবদলে'র যথেষ্ট সপ্রশংস আলোচনা বেরিয়েছে, লিখেছেন গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। কিন্তু তিনের দশকের মধ্যভাগে পৌঁছেও বিভূতিভূষণ শুধু সেই বিষয়কেই নিজের সাহিত্যের উপাদানে চিহ্নিত করেন, যে বিষয়ে তাঁর পরিপূর্ণ আস্থা আছে, যে বিষয় তাঁর নাগালের মধ্যে আছে। তাই সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে সেই সমস্যার সমাধান বাতলানোর সাহিত্য তিনি লেখেন না। কখনোই তিনি ভাবেন না, মজুরদের জীবন নিয়ে লিখবার কথা। তিনি অবিচলিত থাকেন তাঁর "কিন্নর দলে"র সত্যে। এই অবিচলতায় শিল্পীর আত্মবিশ্বাস এবং সততাকে নিশ্চয় পড়ে নেওয়া যায়। সে বিশ্বাসের সঙ্গে, সে সততার সঙ্গে দ্বন্দ্বের তো কোনো বিরোধ নেই!

উনিশ-বিশ শতকের যে কোনো শিক্ষিত আধুনিক বাঙালির মতো, যে কোনো বড় মাপের শিল্পীর মতো, বিভূতিভূষণকেও প্রতিনিয়ত খেলতে হত একটা মুখ আর মুখোশের খেলা। একথা নিশ্চয় নিশ্চিত নির্ধারণ করা যায় না যে 'দৃষ্টিপ্রদীপ' অথবা 'দেবযান' বিভূতিভূষণের মুখোশমাত্র, যার আড়ালে তিনি তাঁর সমকালীন জটিলতা থেকে পরিত্রাণ চাইতেন। কিন্তু এমন পরিশিষ্টও কি বানিয়ে ফেলা যায় যে 'দৃষ্টিপ্রদীপে'র জিতুর অতিপ্রাকৃত দর্শনক্ষমতা অথবা 'দেবযান'ই কেবল বিভূতি-ভূষণের আর তাঁর সাহিত্যের মুখকে চেনাল? 'পথের পাঁচালী' থেকে 'ইছামতী' পর্যন্ত প্রতিটি নির্মাণেই বিভূতিভূষণের মুখ আর মুখোশকে একই সঙ্গে খুঁজে নেওয়া যায় না কি? আর বিভূতিসাহিত্যের পাঠক তো জানেন যে সেই প্রথম গল্প "উপেক্ষিতা" থেকেই বিভূতিভূষণের ভাষা গদ্যের বয়ঃসন্ধির অস্থিরতাকে অনেকদূর পেরিয়ে গিয়েছিল। সেই প্রথম থেকেই কি নিজের অনুত্তেজক, কিন্তু খুঁটিনাটি বিন্যাসের শৈলীতে ভরসা রেখে বিভূতিভূষণ প্রতীক্ষা করতেন, যে, কোনোদিন কোনো পাঠক তাঁর সাহিত্যে নির্মাতার মুখের যন্ত্রণাকে, নির্মাতার মুখোশের নির্বিকল্প অসহায়তাকে সঠিক পড়ে নেবেন? অথবা, এমনও হওয়া বিচিত্র নয় যে সাহিত্যিক ক্ষমতার আত্মস্থ প্রসাদে তিনি নিশ্চিত বুঝতেন অন্য একটি কথা; তাঁর সমকালীন পাঠকেরা, বিভূতিসাহিত্যের পরম অনুরাগীরা, তার চরম বিদ্বেষীরা, কেউই বিভূতিভূষণের প্রতীক্ষার পাহাড় সরিয়ে জানতে পারবেন না যে, শিশুসুলভ, মিথ্যারসিক বিভূতি বাঁড়ুয্যেরও এক বা একাধিক মুখোশ আছে। নিজের লেখার প্রশংসায় বিভূতিভূষণের উপচে পড়া আনন্দ, নিজের

লেখার নিন্দায় তাঁর ভাবলেশহীন নির্বিকার, এসবই হয়তো বিভূতিভূষণের আত্ম-বিশ্বাসেরই অংশ, আবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ওই প্রতীক্ষারও অংশ।

ঐকান্তিক তবে কোন্ যন্ত্রণা, কোন্ নিরাময়

১৯২৯ সালে তিনশো পঁচিশ টাকায় বাংলা উপন্যাসের চুক্তি করে যিনি গ্রন্থকার-জীবন শুরু করেছিলেন, লেখক হিসেবে তাঁকে অরণ্যে রোদন করতে হয়নি। অন্তত, আপাতদৃষ্টিতে তেমনি মনে হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষত, বইয়ের সংস্করণের পর সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ায়, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা পাওয়ার জন্য সম্পাদকদের আগ্রহে, বিভূতিভূষণের দৈনন্দিন এবং বিশেষত শারদীয় লেখালেখির ব্যস্ততায়, সহজ কৃতিত্বের আখ্যানটাই মুখ্য হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু সেই আখ্যানের অন্তরালে কোনো দ্বিতীয়, তৃতীয় বা অজস্র কাহিনী ছড়িয়ে থাকাও তো অস্বাভাবিক নয়। ১৯২৯-এ 'পথের পাঁচালী থেকে ১৯৫০-এ 'ইছামতী' পর্যন্ত যাত্রাপথে বিভূতি-ভূষণকে বারবার বুঝতে হয় যে, মাঝেরপাড়া দূরে মিলিয়ে না গেলে অপুর পথ তৈরি হয় না। অথচ পায়ের তলায় সেই নতুন পথের মাটি এমনি ভঙ্গুর যে, মনে হয়, কেন দূরে চলে যেতে দিলাম মাঝেরপাড়াকে! আবার মাঝেরপাড়ার কাছাকাছি ফিরলে, মন বলে, বুঝি একে চিনবার জন্যই একে ছেড়ে যাওয়া জরুরি। শুধু মাঝেরপাড়াকে নিয়ে তো কোনো রাস্তা গড়ে ওঠে না। কথকঠাকুরের পথ বিভূতিভূষণের বাল্য-কৈশোর জুড়ে দুর্গম থেকে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আবার যে পথে সাহিত্যিক বিভূতিভূষণের সাফল্য আসে, সেই একই পথ তাঁকে 'ইছামতী'তে ভবানীচরণের আশাবাদে পৌঁছে দেয়। ভবানীচরণের থাকে টুলুর মতো ছেলে, যাকে বিদেশি ভাষা শেখানোর আকাঙ্ক্ষা আছে শাস্ত্রজ্ঞ পিতার। ভবানীচরণ গাঁয়ের বেপরোয়া মেয়ে নিস্তারিণীর ভিতরে ভবিষ্যৎ বাংলার আবাহনী শুনতে পান। নিস্তারিণীদের নিয়ে ওই আশা আর নিজের না-জানা ভিনদেশী ভাষা পুত্রকে শেখানোর বাসনা, এ-দুয়ের কোনো প্রত্যক্ষ বিরোধ গ্রথিত হয় না 'ইছামতী' উপন্যাসে। মৃত্যুশয্যায় শুয়েও কি ভেবেছিলেন বিভূতিভূষণ, 'ইছামতী' দ্বিতীয় খণ্ডের কথা, 'কাজলে'র কথা? সেই যে বলেছিলেন, জীবনের শেষ দিনটিতেও, 'আজ আর লেখা হলো না' (যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬ : ১০১)।

অপূর্বকুমারে বিভূতিভূষণের মুখকে বড় বেশি চেনা গিয়েছিল। সে মুখ যে কোনো আধুনিকের মুখের মতোই; তাই সে মুখ মুখোশবর্জিত নয়। সেই আধুনিকের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পথে বেরিয়ে, আধুনিকের অনিশ্চিত সঞ্চয়ে আর

অনিবার্য অপচয়ে ঝুলি ভরতে ভরতে, ঝুলি ঝাড়তে ঝাড়তে প্রৌঢ়বয়সে পৌঁছে, বিভূতিভূষণ হয়তো মহানন্দর মুখখানাই বড় বেশি খুঁজতে চাইতেন নিজের জীবনে আর সাহিত্যে। মিলিয়ে হয়তো দেখতেন, পিতার ক্লান্তির আর ব্যর্থতার যেটুকু মূল্য ছিল, তার সঙ্গে কতটুকু যোগ করল পুত্রের সাফল্য, যশ, ব্যস্ততা ? বিয়োগই বা কী কী হল ? যোগ-বিয়োগের ফল তবে কী দাঁড়াল ? অঙ্কের সেই পরিণামকে কি নিজের খানিকটা অনুকূলে আনা যায়, যদি জীবনের প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী'র প্রকাশকালে বারাকপুরের পোড়ো ভিটেকে পাঠানো যায় অভিনন্দন ? যদি জীবনের শেষ দশককে সাজানো যায় বারাকপুরবাসের আয়োজনে ? যদি বিগ্রহের উপমায় সংরক্ষণ করা যায় মহানন্দর ছেঁড়া পুঁথি আর মৃণালিনীর ভাঙা কড়া ? যদি মৃণালিনীর অনুরূপ সংসারযাত্রায় কল্যাণী চিহ্নিত হলেই দেখা যায় অপরাজিত জীবনরহস্যের বারবার আত্মপ্রকাশ ? নাকি এই গোটা আয়োজনটাই আসলে এক মুখোশের নির্মাণ ? যে মুখোশের আড়ালে এডওয়ার্ড টমসনের প্রশংসায় আপ্লুত, সেলিব্রিটি হওয়ার সম্ভাবনায় প্রসন্ন (শুধুমাত্র এই দেশটা যদি এদেশ না হয়ে ইওরোপ হত !), সফল বাঙালি সাহিত্যিকের মুখখানা, অন্তত বিভূতিভূষণ নিজে ঠিকই চিনতে পারেন ?

মুখ-মুখোশের এই টানাপোড়েন থেকে বিভূতিজীবনের কোনোদিন রেহাই মেলেনি। বিভূতিসাহিত্যেও পড়ে নেওয়া যায় যে, ওই দোটানার সত্য আদৌ গৌণ নয়। তবে, আবারও বলতে হয় যে, পাঠকের কাছে পৌঁছনোর জন্য এ সাহিত্যের তো কোনো আলগা ব্যগ্রতা নেই। পাঠকের জন্য সহিষ্ণু প্রতীক্ষা এই সাহিত্যিকের, সেই প্রথমদিন থেকে। এমন কোনো পাঠকের প্রত্যাশা কি ছিল বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক প্রতীক্ষায়, যার দেখা তিনি জীবদ্দশায় পাননি ? বিভূতি-শতবর্ষ পার করেও কি তেমন পাঠকের সন্ধান পেয়েছে বিভূতিসাহিত্য ? নাকি বিভূতি-ভূষণ কখনোই তাঁর সাহিত্যিক প্রতীক্ষার অবসান চাননি ? চাননি যে খুলে যাক বিভূতিভূষণের দ্বন্দ্বভীতির অথবা শিশুসুলভতার মুখোশ ? বিভূতিভূষণের সহজ কৃতিত্বের আড়াল সরিয়ে, সমকালীন দ্বন্দ্বে, গ্লানিতে, সীমায় আকীর্ণ তাঁর সত্যকার কীর্তি খুঁজে পাবেন, এমন পাঠক কি বিভূতিভূষণের প্রতীক্ষিত ছিল না ? কেন দুর্গা-বিহীন 'পথের পাঁচালী' দুর্গার জীবনে-মরণে ভরে ওঠে উপন্যাসের চরম অবয়বে ? কেন 'আলোক-সারথি' হয়ে যায় 'অপরাজিত' ? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে, পাঠক লেখকের উত্তরমালাকেও সন্দেহ করুন, এমন কি চাইতেন না বিভূতিভূষণ ? তাঁর প্রতীক্ষা যেন প্রতীক্ষাতেই শেষ হয়, এমন চিন্তাতেই কি স্বস্তি পেতেন তিনি ?

প রি শি ষ্ট ক

বাপুজী

মহাত্মা গান্ধী আজ নেই। প্রত্যেকদিন সকালে উঠেই এ কথাটি সর্বপ্রথম মনে পড়ছে—মহাত্মাজী নেই। তিনি একজন আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন। মনে হচ্ছে, রাত্রের দুঃস্বপ্ন নয় তো ঘটনাটি?

হয়তো…

কিন্তু ঘুমের জড়তা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই নিষ্ঠুর সত্য তার সমস্ত নিষ্ঠুরতা নিয়ে মনে এসে চেপে বসছে। না, স্বপ্ন নয়, কাল রাত্রেও রেডিও শুনেছি, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছি, মহাত্মাজী—গান্ধীজী—আমাদের গান্ধী সত্যিই নেই। সত্যিই তিনি আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন।

এও সম্ভব হল। দুবছর আগেও একথা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, তিনি একজন গুপ্ত ঘাতকের অস্ত্রের আঘাতে প্রাণ বিসর্জন করবেন। এ পৃথিবীতে কত অসম্ভব ব্যাপারই না সম্ভব হয়ে উঠবে আমাদের চোখের ওপর!

সঙ্গে সঙ্গে দেখছি, বিশ্বের কত মনীষী, কবি, দার্শনিক, রাষ্ট্রনায়ক তার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছেন, কত বাণী পাঠাচ্ছেন। ছবিতে দেখছি, গভর্নর-জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও লেডি মাউন্টব্যাটেন তাঁর চিতার পাশে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছেন, ট্রুমান বাণী পাঠাচ্ছেন, অ্যাট্‌লি বলছেন, 'আমার প্রিয় বন্ধু মহাত্মা গান্ধী', ক্যান্টারবেরির ধর্মযাজক বলছেন, 'মহাত্মা ঈশ্বরের একজন শ্রেষ্ঠতম সন্তান, ঈশ্বরের সন্তানদের মৃত্যু নাই', লণ্ডনে ছাত্রেরা কাঁদছে, কায়রোতে নোকরাসি পাশা বলছেন, 'বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধী', ব্রেজিলের রাষ্ট্রনায়ক শোক-সন্তপ্ত ভাষায় বাণী পাঠাচ্ছেন, পার্ল বাক্ বলছেন, 'এই দুঃসময়ে আগে পণ্ডিত নেহেরুকে দেখো, আহা, বড্ড লেগেছে তাঁর', স্মাট্‌স্ বলছেন, 'আমার পুরনো বন্ধু মহাত্মা গান্ধী'—ব্যাপার কি? পুরনো ধড়িবাজ দুনিয়ার মধ্যে হঠাৎ এত বিশ্বমৈত্রী জেগে উঠল কোথা থেকে? অত ঝুনো, বৈষয়িক লোকেরা আজ একজন মোটা-খদ্দরপরিহিত, বাবুগিরিবর্জিত বৃদ্ধের মৃত্যুতে ব্যথিত হয়ে উঠলেন কেন? বিশেষত সে বৃদ্ধ ব্যক্তি কোন দেশের রাজা নয়, সেনাপতি নয়, মন্ত্রী নয়—কিছুই না।

ভারতবর্ষের একজন সাধারণ নাগরিক মাত্র। এ যে কত আশ্চর্য একটা ঘটনা চোখের সামনে দেখলুম।

বিশ্বের সকলের চোখে যাঁর জন্য অশ্রু, তিনি সেদিনও ছিলেন আমাদের এই বেলেঘাটায়, এঁদো খোলার বস্তি পার হয়ে তাঁর বাড়িতে সেদিনও তাঁকে দেখতে গিয়েছি। সেদিনও তিনি নোয়াখালির কর্দমময় পথে পথে বেড়িয়ে বেড়িয়েছেন, নোয়াখালির কৃষকের টোকা মাথায় দিয়ে সেদিনও রোদে তিনি বসে ছিলেন। মরণের মধ্যে দিয়ে কত বড় হয়ে গেলেন তিনি আজ আমাদের চোখের সামনে! অবতার পুরুষকে আমরা চিনতে পারি নি, চিনলে আরও ভাল করে তাঁকে দেখতুম। অবতার পুরুষদের চেনা এতই কঠিন।

মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কিনা সে আলোচনা করব না, গান্ধীবাদের কোথায় ভুল ত্রুটি, কোথায় তার মহিমা, সে সব আলোচনা করুন তাঁরা যাঁরা তা করার ক্ষমতা রাখেন। আমার শুধু মনে হচ্ছে, কোনও অত্যন্ত সফল, অত্যন্ত হিসেবী, অত্যন্ত ধুরন্ধর লোকের জন্যে এ বিশ্বব্যাপী শোকাশ্রু বইত না, মনের গভীর গহন অতলতল মথিত করে এ বেদনা ঠেলে উঠত না তাঁর তিরোধানে। তাঁর প্রদর্শিত পুণ্যপথের তিনিই ছিলেন একক যাত্রী, তাঁর পেছনে কেউ হয়তো আসে নি, কত লোক তাঁকে ভুল বুঝেছিল, নোয়াখালির সুপারিবাগানের পথে পথে লাঠি হাতে তিনি একাই চলেছেন সারা জীবন ধরে, কেউ নেই তাঁর সঙ্গী। অহিংসমন্ত্রের ঋষিও তিনি, ওই মন্ত্রে দীক্ষিত একমাত্র শিষ্যও তিনি। চলার পথে কতবার চেয়ে চেয়ে দেখেছেন, কেউ তাঁর পেছনে নেই, ধু-ধু শূন্য পথ। তাঁর এই ছবিই আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখছি। মুখের বাণী অন্তরের সায় পেয়েছে এই ছবি ভেবে।

মহাত্মা গান্ধী বিশ্বদেবতার হাতে লেখা একখানি এপিক কাব্য—বুদ্ধ, যীশু রচনার পরে কিছুদিন বিশ্রাম করবার পরে এখানাতে তিনি হাত দিয়েছিলেন।

ট্র্যাজিক পরিণতি দ্বারা এই সব মহাকাব্যকে নিখুঁত ক্লাইম্যাক্সে তুলবার কৌশল—সেই স্থান, কাল, মৃত্যুহীন মহাকবির নিজস্ব ধারা—আমরা কি বুঝব তাঁর টেকনিক? তবে দেখতে পাচ্ছি যে, এই টেকনিক দ্বারা তিনি তাঁর হাতের বড় বড় এপিককে অমর ও চিরবরেণ্য করে রেখেছেন বিশ্ববাসীর মনে। অনন্তের সেই গ্রন্থাগারের আলমারিতে তাঁর নতুন-শেষ-করা কাব্যখানি স্থান পেল, রক্ত-রাঙা অক্ষরে লেখা কাব্যের নামটি দিব্য আভায় জলজল করবে শত শতাব্দী পরেও।

বাপুজী, আমাদের নাবালক রেখে চলে গেলে, ওপর থেকে সর্বদা দৃষ্টি রেখো আমাদের দিকে। তোমার উপযুক্ত যেন হতে পারি—সর্বদা আশীর্বাদ করো। তোমার আশীর্বাদে সব বাধাকে আমরা জয় করব।

শনিবারের চিঠি, মাঘ, ১৩৫৪ — বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃ ৩০৭-৮

প রি শি ষ্ট খ

'প্রবাসী' পত্রিকার পুস্তক-পরিচয় বিভাগে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় যেসব বই নিয়ে লিখেছিলেন :

লেখক	বই	'প্রবাসী'র যে সংখ্যায় আলোচনা বেরিয়েছিল
অনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য	ভবিতব্য (উপন্যাস)	মাঘ ১৩৪৫
অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল	ঝড়ের পরে (গল্পসংকলন)	ফাল্গুন ১৩৩৬
ঐ	সব মেয়েই সমান	ভাদ্র ১৩৪৫
অমৃতলাল গুপ্ত	সোনার খনির সন্ধানে (কিশোরসাহিত্য)	আষাঢ় ১৩৪১
আবুল কালাম শামসুদ্দীন	পোড়ো জমি (টুর্গেনিভের 'ভার্জিন সয়েলে'র বঙ্গানুবাদ)	মাঘ ১৩৪১
আশীষ গুপ্ত	ইহাই নিয়ম (গল্পসংকলন)	বৈশাখ ১৩৪০
উপেন্দ্রকৃষ্ণ পালিত	ননদিনী (উপন্যাস)	আষাঢ় ১৩৪২
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	দিক্‌শূল (উপন্যাস)	জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০
কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত	বিষের হাওয়া (উপন্যাস)	ভাদ্র ১৩৩৮
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	দুঃখের দেওয়ালী (গল্পসংকলন)	জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০
কেশবচন্দ্র গুপ্ত	অতি বোগাস্ (গল্পসংকলন)	মাঘ ১৩৬১
গিরিশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ	অন্ধের দৃষ্টি (উপন্যাস)	আশ্বিন ১৩৪৫
গোপেন্দ্রনাথ রায়	স্বপনকুহেলী (কাব্যগ্রন্থ)	মাঘ ১৩৪১
জগৎ মিত্র	আঠারো বছর (গল্পসংকলন)	বৈশাখ ১৩৪০
জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়	শয়তানের সুমতি (কিশোরসাহিত্য)	জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯
জ্যোতি সেন	পান্থপাদপ (গল্পসংকলন)	ভাদ্র ১৩৪৫
জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী	ছায়াপথ (উপন্যাস)	মাঘ ১৩৪১
তারকনাথ বিশ্বাস	পরলোক (পরলোক-সংক্রান্ত গ্রন্থ)	আষাঢ় ১৩৪৫
তারকেশ্বর সেনশাস্ত্রী	মিলন-মালা (উপন্যাস)	অগ্রহায়ণ ১৩৪১

লেখক	বই	'প্রবাসী'র যে সংখ্যায় আলোচনা বেরিয়েছিল
তারাপদ রাহা	তৃষা (গল্পসংকলন)	চৈত্র ১৩৪১
নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	আরাতামা (উপন্যাস)	জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮
নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী	সুদখোর সওদাগর (শেক্‌সপিয়র অবলম্বনে কিশোরসাহিত্য)	ভাদ্র ১৩৩৮
নরেন্দ্র দেব	খেলার পুতুল (উপন্যাস)	মাঘ ১৩৩৬
নরেন্দ্রনাথ রায়	রাসপুটিন (কিশোরপাঠ্য জীবনী)	অগ্রহায়ণ ১৩৪১
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	লক্ষ্মীছাড়া (উপন্যাস)	জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭
ঐ	রূপের অভিশাপ (উপন্যাস)	ঐ
নিত্যহরি ভট্টাচার্য্য	শেষের দাবী (উপন্যাস)	আষাঢ় ১৩৪২
পশুপতি ভট্টাচার্য্য	ডাকের চিঠি	পৌষ ১৩৪৪
প্রফুল্লকুমার সরকার	বিদ্যুৎলেখা (উপন্যাস)	শ্রাবণ ১৩৩৭
ঐ	লোকারণ্য (উপন্যাস)	কার্তিক ১৩৩৯
প্রবোধকুমার সান্যাল	কাজললতা (উপন্যাস)	আষাঢ় ১৩৩৯
প্রভাবতী দেবী ও হাসিরাশি দেবী	দায়ী (উপন্যাস)	ভাদ্র ১৩৪০ এবং অগ্রহায়ণ ১৩৪১
প্রেমাঙ্কুর আতর্থী	কল্পনা দেবী (উপন্যাস)	অগ্রহায়ণ ১৩৩৮
ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়	মাস্টারসাহেব (উপন্যাস)	আশ্বিন ১৩৪৫
বনবিহারী মুখোপাধ্যায়	যোগভ্রষ্ট (উপন্যাস)	পৌষ ১৩৩৬
বিজয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়	শান্তা (উপন্যাস)	ফাল্গুন ১৩৩৬
বিনয় চৌধুরী	ঘর ও সংসার (গল্পসংকলন)	ভাদ্র ১৩৫০
বিমল সেন	শোধবোধ (আলেকজাণ্ডার ডুমার 'কাউণ্ট অভ্ মণ্টেক্রিস্টো'র বঙ্গানুবাদ)	পৌষ ১৩৩৭
বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়	সত্যসুন্দর (উপন্যাস)	মাঘ ১৩৩৬
ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	মায়ামুক্তি (উপন্যাস)	চৈত্র ১৩৪১
ভুবনমোহন মিত্র	স্রোত (উপন্যাস)	মাঘ ১৩৪১
মনোজ বসু	বনমর্ম্মর ও অন্যান্য গল্প (গল্পসংকলন)	বৈশাখ ১৩৪০
মহেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী	মৃত্যু ও পরলোকতত্ত্ব	আষাঢ় ১৩৪১

লেখক	বই	'প্রবাসী'র যে সংখ্যায় আলোচনা বেরিয়াছিল
মায়া দে	তাসের ঘর	আশ্বিন ১৩৪৭
মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	অবলা (গল্পসংকলন)	অগ্রহায়ণ ১৩৩৭
রবার্ট জেম্‌স্ পীস	কুহেলিকার পরপারে ('থ্রু দ্য মিস্ট্‌স্'-এর বঙ্গানুবাদ, প্রকাশক দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, অনুবাদকের নাম পুস্তক-পরিচয়ে নেই)	বৈশাখ ১৩৪০
রাজলক্ষ্মী দেব্যা	ব্রাহ্মসমাজের আদিচিত্র ও পরলোকতত্ত্ব	ভাদ্র ১৩৪৫
রাধাচরণ চক্রবর্তী	বুকের ভাষা (গল্পসংকলন)	শ্রাবণ ১৩৩৭
ঐ	তপ ও তাপ (উপন্যাস)	মাঘ ১৩৪৪
রামনারায়ণ কর	সুতপা (উপন্যাস)	জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮
রেবতীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	মাতৃমূর্ত্তি (নাটক)	আষাঢ় ১৩৪১
শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	আপন-পর (উপন্যাস)	বৈশাখ ১৩৩৯
শচীন্দ্রলাল রায়	রক্তের সম্বন্ধ (গল্পসংকলন)	মাঘ ১৩৩৭
শরচ্চন্দ্র মজুমদার	অন্ধ প্রেম (উপন্যাস)	কার্তিক ১৩৩৯
শান্তা দেবী	দুহিতা (উপন্যাস)	অগ্রহায়ণ ১৩৪১
ঐ	অলখ-ঝোরা (উপন্যাস)	ফাল্গুন ১৩৪৪
শীলালঙ্কার স্থবির	অজাতশত্রু (কিশোরপাঠ্য জীবনী)	অগ্রহায়ণ ১৩৪১
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	পূর্ণচ্ছেদ (উপন্যাস)	বৈশাখ ১৩৩৭
সীতা দেবী	মাতৃ-ঋণ (উপন্যাস)	আশ্বিন ১৩৪১
ঐ	মহামায়া (উপন্যাস)	মাঘ ১৩৪২
সুবোধ বসু	স্বর্গ (উপন্যাস)	ভাদ্র ১৩৪৫
সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	মানস সরোবর ও কৈলাস (ভ্রমণকাহিনী)	অগ্রহায়ণ ১৩৩৮
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	গরীবের ছেলে (উপন্যাস)	বৈশাখ ১৩৩৭
হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	এগারোই ফাল্গুন (উপন্যাস)	চৈত্র ১৩৪১
হেমেন্দ্রকুমার রায়	পথের মেয়ে (উপন্যাস)	অগ্রহায়ণ ১৩৩৮
ঐ	আবার যখের ধন (কিশোর-সাহিত্য)	ভাদ্র ১৩৪০
	নিরুপমা বর্ষস্মৃতি	অগ্রহায়ণ ১৩৩৭

প রি শি ষ্ট গ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উনপঞ্চাশতম জন্মদিনে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য :

আজ তারাশঙ্করের জন্মোৎসবে যোগ দিতে পেরে আমি গৌরব অনুভব করছি। তারাশঙ্করকে আমি অনেকদিন থেকেই জানি, দশ-পনেরো বছর আগে বন্ধুবর রমেশ সেনের আড্ডায় তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে। তারপর মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা হ'ত। তখন আমিও কলকাতার অধিবাসী কিন্তু ভাল করে তখন তাকে জানতাম না, কলকাতায় বহুপরিচিত ও অর্ধপরিচিতদের ভিড়ের মধ্যে সেও একজন।

সে সময়ের একটি কথা আমার বেশ মনে আছে। তখন তারাশঙ্করের 'রাই-কমল' বেরিয়েছে এবং অনেকের মুখে মুখে বইখানার সুখ্যাতিও ছড়িয়েছে। এক বর্ষার দিনে একখণ্ড 'রাইকমল' যোগাড় করে দেশের বাড়িতে দুদিনের কিসের একটা ছুটিতে বেড়াতে গেলাম। একা বসে নির্জন ঘরে 'রাইকমল' পড়তে আরম্ভ করলাম সন্ধ্যার পরে। অনেক রাত্রে বইখানা শেষ হল। তখন জানলা দিয়ে বাইরের জোনাকি-জ্বলা বাঁশবাগানের দিকে চেয়ে আমার মনে হল, সাহিত্যে একটি নতুন সুরের সন্ধান পাওয়া গেল এই বইয়ের মধ্যে। এক অজানা জগতের সঙ্গে নতুন পরিচয়ের আনন্দ। বীরভূমের মাটির গন্ধ পেলাম বইয়ের ছত্রে ছত্রে। আমার মনে আছে, দেশের লাইব্রেরিতে বইখানা আমি দিয়ে সকলকে বলেছিলাম, বইখানা পড়ে দেখ, নতুন জিনিস পাবে।

কিন্তু তারাশঙ্করকে ভাল করে জানলাম বছর চারেক আগে, কানপুর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনে একই ট্রেনের কামরায় আমরা যাই এবং আসি, কানপুরে একই ঘরে আমরা তিন দিন বাস করি। তারাশঙ্করের মধ্যে যে সহজ, সরল, ভদ্র, অমায়িক ও সুরসিক লোকটি বাস করে, তাকে আবিষ্কার করলাম ওই কয়দিনে। অনেক লোকের সঙ্গে এর চেয়েও বেশিদিন একত্র বাস করেছি, কিন্তু এমন নিবিড় আত্মীয়তা কারও সঙ্গে হয় নি। এমন আনন্দজনক বন্ধুত্ব কারও সঙ্গে গ'ড়ে ওঠে নি। এ কথাও বলব, মনকে স্পর্শ করবার এই যে ক্ষমতা, তারাশঙ্করের মধ্যে এর যে

প্রকাশ ওই কদিনে আমি মনে প্রাণে অনুভব করেছিলাম, অনেক হাজারের মধ্যে তা এক-আধজনের থাকে। তারাশঙ্করের বন্ধুত্বলাভ আমার জীবনের একটি দুর্লভ ঘটনা।

যশোব জেলার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আমি তারাশঙ্করকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি তাব শুভ জন্মদিনে। বহুদিন ধরে এই দিনটি বার বার ফিরে আসুক, সে শত শরৎ পরমায়ু নিয়ে বঙ্গবাণীর দেউলকে দিন দিন নবতর অর্ঘ্যে মণ্ডিত করুক, দেশ ও জাতিকে নতুন পথের নির্দেশ দিয়ে চলুক তার জয়শ্রীমণ্ডিত লেখনী।

[লেখাটি "তারাশঙ্কর" শিরোনামে 'শনিবারেব চিঠি'র শ্রাবণ ১৩৫৪ সংখ্যায় (পৃ ২৭৩-৭৪) প্রকাশিত হয়। লেখাটির ভূমিকার জন্য পত্রিকার একই সংখ্যার পৃ ২৬৭ দ্রষ্টব্য; সেখানে আছে, '১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ৮ আশ্বিন (শ্রাবণ ?) তারিখে তারাশঙ্কর ঊনপঞ্চাশের বিপদ উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সেই উপলক্ষ্যে তাঁহার সাহিত্যিক, শিল্পী ও সাহিত্যরসিক বন্ধুরা ১০ শ্রাবণ রবিবার নিউ শ্যামবাজার স্ট্রীটের কে. বি. ক্লাব-প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া তাহাকে লইয়া একটি ছোটখাটো ঘরোয়া উৎসব করেন। বাংলা দেশের অনেক খ্যাতিমান কবি ও কথাশিল্পী স্বয়ং অথবা প্রশস্তি-পত্র মারফৎ এই উৎসবকে সার্থক করিয়া তুলেন।··· শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় স্বতন্ত্র নিবন্ধাকারে তাঁহাদের বক্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাও এই সঙ্গে···মুদ্রিত হইল।'] বিভূতিভূষণের লেখাটি এখনও গ্রন্থিত হয়নি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল ৩ নভেম্বর ১৯৫০-এর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য়, অন্যটি একই দিনে 'যুগান্তরে'। 'যুগান্তরে'র লেখাটি, যার নাম ছিল "অপরাজিত বিভূতি-ভূষণ", পরে বিভূতিভূষণের 'কুশল পাহাড়ী' গল্পসংকলনে ভূমিকা হিসেবে যুক্ত হয়। চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের 'অপরাজিত বিভূতিভূষণ' গ্রন্থে "পরিশিষ্ট-৬"-এ (পৃ ২৭০-৭২) এবং রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও গজেন্দ্রকুমার মিত্র সম্পাদিত 'বিভূতি স্মারক গ্রন্থে' (পৃ ৩০-৩১) লেখাটি সংযুক্ত হয়েছে। কিন্তু অন্য লেখাটি, যা "বিভূতিভূষণ" শিরোনামে ১৯৫০ সালের ৩ নভেম্বরের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র চতুর্থ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়, তা এখনও পর্যন্ত অগ্রন্থিত। এই শ্রদ্ধাঞ্জলিতে তারাশঙ্কর লিখে-ছিলেন :

অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে বিভূতিভূষণের জীবনাবসান ঘটেছে। তাঁর সঙ্গে

ব্যক্তিগত পরিচয়ের যে মাধুর্য আমার জীবনের বিগত কয়েক বছর আচ্ছন্ন করেছিল, আজ সহসা যে সে পরিচয় অতীতের স্মৃতিমাত্র এই চেতনা আমার সমস্ত চিন্তাকে পঙ্গু করে রেখেছে। তবু আমি জানি, এই স্মৃতি আমার ব্যক্তিগত জীবনের অন্যতম পরমৈশ্বর্য। বিষয়কর্মব্যপদেশে অথবা সাধারণ সামাজিকতার ক্ষেত্রে আমার পরিচয়ের পরিসর খুব স্বল্প নয়, কিন্তু যে পবিচয় জীবনের অন্দরমহল পর্যন্ত পৌঁছোয় তার সংখ্যা অতি মুষ্টিমেয়। বিভূতিভূষণ আমার সেই অন্তরতমদের একজন ছিলেন।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস, বাঙালীর অন্তরে বিভূতিভূষণের যে স্থান তাঁর জীবনব্যাপী সার্থকসাধনায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, আমার ব্যক্তিগত অনুভূতির সঙ্গে তার একটি আশ্চর্য মিল আছে। সে সম্বন্ধ আনন্দের, নিগূঢ় আত্মীয়তার, সহজ মানবিকতার পরিচয়ে মধুর। সাহিত্যের সঙ্গেও জনসাধারণের পরিচয়ের প্রকারভেদ ও তারতম্য রয়েছে। যৌথ বৈষয়িকতার সাহিত্য, সমষ্টিগত সামাজিকতার সাহিত্য আজকের দিনের রেওয়াজ, যার মধ্যে গাছকে না চিনিয়ে একেবারে বনকে চেনানোর চেষ্টা রয়েছে—সেখানে অন্তরঙ্গতার স্থান নেই, আত্মীয়তার স্থান নেই ; হিসেবে-নিকেশে, বিচার-বিতর্কে, পাওনাগণ্ডা আদায়ের মন-কষাকষিতে সে পরিচয় কণ্টকিত। মানুষের সঙ্গে, বিশ্বের সঙ্গে মানুষের যে আর একটি সম্বন্ধ আছে—যার অধিকারে আনন্দের পংক্তিভোজে আকাশ-আলো-বন-মাঠ-কীট-পতঙ্গ পক্ষী সভ্য-জংলী-ধনী-দরিদ্র একাসনে বসে বিধাতার প্রসাদলাভ করে, বিভূতিভূষণ সেই পরিচয়ের চারণ।

সাহিত্যের মধ্যে বিভূতিভূষণ যা পরিবেশন করেছেন, তা তাঁর ভাববিলাস মাত্র ছিল না—কবি বিধাতার এই পরমাশ্চর্য বিপুলকাব্যের রসাস্বাদের জন্যে তিনি বৈরাগী বাউলের মত ঘুরেছেন মাঠে জঙ্গলে, প্রাণ খুলে মিশেছেন সেই সব মানুষের সঙ্গে যারা এখনো জীবনকে সাজিয়ে গুছিয়ে ভদ্র করতে গিয়ে তার রসটুকু নিংড়ে বের করে দেয়নি। এই পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে বিভূতিভূষণ অখণ্ডের সম্বন্ধে একটি অবর্ণনীয় 'মিষ্টিক' চেতনা লাভ করেছিলেন, যার পরিচয় তাঁর সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে।

জীবনের শেষ কয়েক বৎসর বৈরাগী আত্মভোলা বিভূতিভূষণ সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেছিলেন—সুদূর-ব্যাপ্ত আসক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার সে এক মধুর দৃশ্য। এই প্রসঙ্গে অল্প কিছুদিন আগে প্রকাশিত বিভূতিভূষণের একটি গল্প আমাকে বেদনায় চঞ্চল করে তুলেছে—'বাবা মতিলাল'—ছেলে বাবাকে এই বলেই ডাকে ; বাবা ঘোড়া সাজেন, বাবা সঙ্গী হয়ে ছেলেকে চেনান গাছ-বন পাশের

পৃথিবী। বাবা ছেলেকে নিয়ে গেলেন নদীতে; ছেলেকে স্নান করিয়ে তীরে রাখলেন; তারপর নিজে নামলেন স্নানে। সহসা নিয়তি বজ্র হানলে, কুমীর ধরলে মতিলালকে; প্রাণরক্ষার জন্যে ক্ষণকালের জন্যে কুমীরের সঙ্গে ব্যর্থ যুদ্ধ করলেন মতিলাল; ছেলে ভাবলে, 'বাবা মতিলালের' এ আবার এক মজা; হাসলে, হাততালি দিলে; —বাবা মতিলাল তলিয়ে গেলেন জলে; মজা শেষ হল, একা তীরে দাঁড়িয়ে ছেলে ডাকতে লাগ্‌ল, "বাবা মতিলাল, এসো, উঠে এসো।"

বিভূতিভূষণের সংসারবন্ধনের সঙ্গে যাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয় আছে তাঁদের একজন হিসেবে আমার মনে হচ্ছে বিভূতিভূষণ কি তাঁর নিজের নিয়তিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন! রহস্যলোক-সন্ধানী বিভূতিভূষণের পক্ষে হয়তো তা অসম্ভব নয়।

সর্বশেষে—হে বন্ধু—প্রণাম!

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাপঞ্জি

উপন্যাস

১. পথের পাঁচালী

পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ : বিচিত্রা, আষাঢ় ১৩৩৫—আশ্বিন ১৩৩৬ (কার্তিক ১৩৩৫ সংখ্যা বাদে)

গ্রন্থাকারে মহালয়া, আশ্বিন ১৩৩৬, রঞ্জন প্রকাশালয়, তিন টাকা।

উৎসর্গ : 'পিতৃদেবকে'।

পরবর্তী কালে সংযুক্ত হয়েছে

(ক) গজেন্দ্রকুমার মিত্র, চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় ও তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত, বারো খণ্ডে সমাপ্ত 'বিভূতি-রচনাবলী' প্রথম খণ্ডে (বি র ১), ভাদ্র ১৩৭৭।

(খ) তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীশ চক্রবর্তী ও সবিতেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত, ছয় খণ্ডে সমাপ্ত 'বিভূতি রচনাবলী সুলভ সংস্করণ'এর প্রথম খণ্ডে (সু ১), বৈশাখ ১৩৮৪।

(গ) উপন্যাসের অংশবিশেষ "অদৃশ্য ধর্মাধিকরণ" নামে মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত 'বিভূতি-বিচিত্রা'য় (ভাদ্র ১৩৭১) সংযুক্ত।

(ঘ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপু' (গ্রন্থপ্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৭৭) গ্রন্থের প্রথম খণ্ড **পথের পাঁচালী**।

(ঙ) **পথের পাঁচালী** যুক্ত হয়েছে রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও গজেন্দ্রকুমার মিত্র সম্পাদিত 'জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ বিভূতিরচনাবলী' প্রথম খণ্ডতে [বি র শ ১] (ভাদ্র ১৪০১, বিভূতি স্মারক সমিতি/মিত্র ও ঘোষ)।

ছোটদের পথের পাঁচালী শ্রাবণ ১৩৫১, বোস প্রেস, দু'টাকা চার আনা।

আম-আঁটির ভেঁপু আশ্বিন ১৩৫১, সিগনেট, দু'টাকা চার আনা।

আহমাদ মাযহার সম্পাদিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কিশোরসমগ্র'-তে (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা) সংযুক্ত।

২. অপরাজিত

পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ : প্রবাসী পৌষ ১৩৩৬—আশ্বিন ১৩৩৮।

গ্রন্থাকারে প্রথম খণ্ড মাঘ ১৩৩৮, রঞ্জন প্রকাশালয়, দু' টাকা চার আনা।

দ্বিতীয় খণ্ড ফাল্গুন ১৩৩৮, ঐ দু' টাকা।

উৎসর্গ : 'মাতৃদেবীকে'।

পরবর্তী কালে সংযুক্ত হয়েছে

(ক) বি র ২ (ভাদ্র ১৩৭৭)-তে প্রথম খণ্ড এবং বি র ৩ (আশ্বিন ১৩৭৭)-এ দ্বিতীয় খণ্ড।

(খ) স্থ ১-এ।

(গ) উপন্যাসের অংশবিশেষ "অমরকণ্টক-যাত্রা" নামে 'বিভূতি-বিচিত্রা'য় আছে।

(ঘ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অপু'র দ্বিতীয় খণ্ড **অপরাজিত**।

(ঙ) সম্প্রতি **অপরাজিত** সংযুক্ত হয়েছে বি র শ ২তে (ভাদ্র ১৪০২)।

৩. দৃষ্টিপ্রদীপ

পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ : প্রবাসী ফাল্গুন ১৩৪০– চৈত্র ১৩৪১

গ্রন্থাকারে ভাদ্র ১৩৪২, পি সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স, দু' টাকা আট আনা।

পরবর্তী কালে সংযুক্ত হয়েছে।

(ক) বি র ৪ (ফাল্গুন ১৩৭৭)-এ এবং (খ) স্থ ১-এ। (গ) উপন্যাসের অংশবিশেষ "দৃষ্টিপ্রদীপ" নামে 'বিভূতি-বিচিত্রা'য় আছে।

বীণা রাণা ও সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত **ছোটদের দৃষ্টিপ্রদীপ** এবং চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত **দৃষ্টিপ্রদীপ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ**-এর প্রথম প্রকাশ যথাক্রমে ১৯৫৩-তে এবং ১৯৬৫-তে।

৪. চাঁদের পাহাড়

পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ : মৌচাক আষাঢ় ১৩৪২—চৈত্র ১৩৪৩।

গ্রন্থাকারে আশ্বিন ১৩৪৪, এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স, এক টাকা ছ' আনা।

উৎসর্গ : 'খুকুকে দিলাম'।

(ক) বি র ৯, ১৩৭৮, (খ) স্থ ১ এবং (গ) 'বিভূতি-বিচিত্রা'য় পরবর্তী কালে সংযোজিত। আরও পরে (ঘ) বি র শ ১-এ এবং (ঙ) 'কিশোরসমগ্র'-তে যুক্ত।

৫. আরণ্যক

পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ : প্রবাসী কার্তিক ১৩৪৪—ফাল্গুন ১৩৪৫।

গ্রন্থাকারে চৈত্র ১৩৪৫, কাত্যায়নী বুক স্টল, দু' টাকা আট আনা।

উৎসর্গ : 'গৌরীকে দিলাম'।

পরবর্তী কালে সংযোজিত (ক) বি র ৫ (ফাল্গুন ১৩৭৭)-এ এবং (খ) স্থ ২ (ফাল্গুন ১৩৮৪)-তে। (গ) "দাবানল" শিরোনামে উপন্যাসের অংশবিশেষ 'বিভূতি-বিচিত্রা'য় আছে।

ছেলেদের আরণ্যক, অগ্রহায়ণ ১৩৫৩, জেনেরাল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স, তিন টাকা।

লবটুলিয়ার কাহিনী আশ্বিন ১৩৬২।

৬. মরণের ডঙ্কা বাজে

পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ : মৌচাক পৌষ ১৩৪৪—আশ্বিন ১৩৪৬।

গ্রন্থাকারে পৌষ ১৩৪৬, বিশ্বনাথ পাবলিশিং হাউস।

পরবর্তী কালে (ক) বি র ৯, (খ) স্থ ১, (গ) 'কিশোরসমগ্র' এবং (ঘ) বি র শ ২-তে সংযুক্ত।

৭. আদর্শ হিন্দু-হোটেল

পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ : মাতৃভূমি মাঘ ১৩৪৫—ভাদ্র ১৩৪৭।

গ্রন্থাকারে আশ্বিন ১৩৪৭, কাত্যায়নী বুক স্টল, দু' টাকা আট আনা।

উৎসর্গ : 'কল্যাণীয় শ্রীমান নুটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়কে'।

পরবর্তী কালে (ক) বি র ৬ (শ্রাবণ ১৩৭৮) এবং (খ) স্থ ২-তে সংযুক্ত।

৮. বিপিনের সংসার

পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ : অলকা আশ্বিন ১৩৪৫—ভাদ্র ১৩৪৬।

গ্রন্থাকারে শ্রাবণ ১৩৪৮, কাত্যায়নী বুক স্টল, দু' টাকা আট আনা।

উৎসর্গ : '৺চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইল'।

(ক) বি র ৬ এবং (খ) স্থ ২-এর অন্তর্ভুক্ত।

৯. দুই বাড়ী

কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি।

গ্রন্থাকারে মহালয়া ১৩৪৮, শঙ্করানন্দ ঠাকুর, ইম্পিরিয়াল আর্ট কলেজ, এক টাকা।

(ক) বি র ১০ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯) এবং (খ) স্থ ২-তে সংযুক্ত।

১০. মিস্‌মীদের কবচ

কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি।

গ্রন্থাকারে চৈত্র ১৩৪৮, দেবসাহিত্য কুটীর, আট আনা।

(ক) বি ব ৯, (খ) স্থ ৩ (ফাল্গুন ১৩৮৪)-তে এবং (গ) 'কিশোরসমগ্র'-তে সংযুক্ত।

১১. অনুবর্ত্তন

কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি।

গ্রন্থাকারে শ্রাবণ ১৩৪৯, মিত্রালয়, দু' টাকা বারো আনা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০।

(ক) বি ব ৭ (ভাদ্র ১৩৭৮) এবং (খ) স্থ ২-তে সংযুক্ত।

১২. দেবযান

কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি।

গ্রন্থাকারে আশ্বিন ১৩৫১, মিত্র ও ঘোষ, তিন টাকা।

উৎসর্গ: 'শ্রীযুক্ত ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায় শ্রীচরণেষু'।

(ক) বি ব ৮ (পৌষ ১৩৭৮) এবং (খ) স্থ ২-তে সংযোজিত।

ছোটদের দেবযান ১৩৮৩।

১৩. কেদার রাজা

পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ: মাতৃভূমি অগ্রহায়ণ ১৩৪৭—?

গ্রন্থাকারে শ্রাবণ ১৩৫২, কাত্যায়নী বুক স্টল।

উৎসর্গ: 'আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট (ট্রাস্ট ?) ট্রাইবুনালের বিচারপতি সুসাহিত্যিক শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত এম. এ. ব্যারিস্টার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান অলোকরঞ্জনের স্মৃতিতর্পণে'।

(ক) বি র ৩, (খ) স্থ ৩ এবং (গ) 'বিভূতি-বিচিত্রা'য় পরবর্তী কালে সংযুক্ত।

১৪. হীরা মাণিক জ্বলে

পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ: মৌচাক বৈশাখ ১৩৪৮—চৈত্র ১৩৪৯।

গ্রন্থাকারে আষাঢ় ১৩৫৩, ডি. এম. লাইব্রেরি।

(ক) বি র ৯, (খ) সু ৩, (গ) 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর সঞ্চয়ন'-এ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২) এবং (ঘ) ''কশোরসমগ্র'-তে সংযুক্ত।

১৫. **অথৈ জল**

পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ : প্রভাসী চৈত্র ১৩৫০—পৌষ ১৩৫৩।

গ্রন্থাকারে কার্তিক ১৩৫৪, ডি. এম. লাইব্রেরি।

(ক) বি ব ১১ (আশ্বিন ১৩৭৯) এবং (খ) সু ৩-এ সংযুক্ত।

১৬. **ইছামতী**

পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৭ সালের মধ্যভাগ থেকে কিছুদিন 'অভ্যুদয়' পত্রিকায় বেরিয়েছিল। 'অভ্যুদয়' বন্ধ হয়ে গেলে পাণ্ডুলিপি অসমাপ্ত অবস্থায় বেশ কিছুদিন পড়েছিল। সম্পূর্ণ উপন্যাসটি কোনো পত্রিকায় ছাপা হয়নি।

গ্রন্থাকারে পৌষ ১৩৫৬, মিত্রালয়, ছ' টাকা।

উৎসর্গ . 'কল্যাণী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে'।

পরবর্তী কালে (ক) বি ব ১২ (ফাল্গুন ১৩৭৯) এবং (খ) সু ৩-এ সংযুক্ত।

১৭. **অশনি সংকেত**

পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ : মাতৃভূমি মাঘ ১৩৫০—মাঘ ১৩৫২। তারপর 'মাতৃভূমি' বন্ধ হয়ে যায়, উপন্যাসটি অসমাপ্ত থাকে। অসমাপ্ত অবস্থায়

গ্রন্থাকারে প্রকাশ ভাদ্র ১৩৬৬, বিভূতি প্রকাশন, সাড়ে চার টাকা।

পরবর্তী কালে (ক) বি র ৫, (খ) সু ৩ এবং (গ) সাহিত্যম্ প্রকাশিত 'বিভূতি-বীথিকা'য় (শ্রীপঞ্চমী ১৩৭৭) সংযুক্ত।

১৮. **দম্পতি**

কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি।

গ্রন্থাকারে ফাল্গুন ১৩৫৯, দেবসাহিত্য কুটীর।

(ক) বি র ১১ এবং (খ) সু ৩-এ সংযুক্ত।

১৯. **অনশ্বর**

পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ : বাঙলা [১৯৫০-এর দিনলিপিতে উপন্যাসটি লিখবার কথা আছে। অনুমান করা যায় ওই সময়ে পত্রিকায় তা প্রকাশিত হচ্ছিল।]

গ্রন্থাকারে শ্রাবণ ১৩৭৯, মিত্র ও ঘোষ, পাঁচ টাকা। বিভূতিভূষণ উপন্যাসটি শেষ করে যাননি। গ্রন্থভুক্তির আগে তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অনশ্বর শেষ করেন।

গল্পসংকলন

১. **মেঘ-মল্লার** শ্রাবণ ১৩৩৮, বরেন্দ্র লাইব্রেরি, দু' টাকা।
উৎসর্গ : 'মেজোমামা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের করকমলে'।
সূচি : মেঘমল্লার, নাস্তিক, উমারাণী, বউ চণ্ডীর মাঠ, নব-বৃন্দাবন, অভিশপ্ত, খুকীর কাণ্ড, ঠেলাগাড়ী, পুঁইমাচা, উপেক্ষিতা।

মেঘ-মল্লার সংকলনটি (ক) বি র ১ এবং (খ) বি ব শ ১এ আছে। সংকলনের প্রতিটি গল্প (গ) সু ৫ (শ্রাবণ ১৩৮৬) এবং (ঘ) ভাদ্র ১৩৮২-তে মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় ও মণীশ চক্রবর্তী সম্পাদিত 'বিভূতিভূষণের গল্পসমগ্র প্রথম খণ্ড'র (গ স ১) অন্তর্ভুক্ত।
(ঙ) "মেঘমল্লার" এবং "পুঁইমাচা" মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত 'বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্প' (ভাদ্র ১৩৫৪, চার টাকা আট আনা) সংকলনে সংযুক্ত।
(চ) "অভিশপ্ত" অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির প্রকাশিত 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভৌতিক গল্প' (আষাঢ় ১৩৭৮, বারো টাকা) সংকলনে আছে।
(ছ) "ঠেলাগাড়ী" 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২) সংকলনে যুক্ত হয়েছে।

২. **মৌরীফুল** ভাদ্র ১৩৩৯, শ্রীগুরু লাইব্রেরি, এক টাকা বারো আনা।
উৎসর্গ : 'স্নেহাস্পদ শ্রীমান বিভূতিভূষণ বসুকে'।
সূচি : মৌরীফুল, জলসত্র, রোমান্স, রাক্ষসগণ, হাসি, প্রত্নতত্ত্ব, দাতার স্বর্গ, খুঁটিদেবতা, গ্রহের ফের, মরীচিকা।
(ক) **মৌরীফুল** সংকলন বি র ২-তে আছে। সংকলনের প্রতিটি গল্প (খ) সু ৫ এবং (গ) গ স ১-এ পাওয়া যাবে।
(ঘ) "মৌরীফুল" 'শ্রেষ্ঠ গল্পতে', (ঙ) "রোমান্স" 'সুলোচনা' (বৈশাখ ১৩৬৯) সংকলনে, 'বিভূতি-বীথিকা'য় এবং "প্রতিমা" নামে 'প্রেমের গল্প' (ফাল্গুন, ১৩৬৯) সংকলনে আছে।
(চ) "প্রত্নতত্ত্ব", "হাসি" ও "খুঁটিদেবতা" 'ভৌতিক গল্প'তে আছে।
(ছ) "হাসি" 'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটদের ভালো ভালো গল্প' (শ্রাবণ ১৩৭২) সংকলনেও পাওয়া যাবে।
(জ) "প্রত্নতত্ত্ব" বিভূতি প্রকাশনের 'অলৌকিক' (আষাঢ় ১৩৭০) সংকলনেও সংযুক্ত।

(ঝ) "গ্রহের ফের" গ্রন্থম্ প্রকাশিত 'বাক্সবদল' (আষাঢ় ১৩৭২, দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা) সংকলনে অন্তর্ভুক্ত।

(ঞ) সম্প্রতি **মৌরীফুল** সংকলনটি বি র শ ২-এতে সংযুক্ত হয়েছে।

৩. **যাত্রাবদল** কার্তিক ১৩৪১, পি সি সরকার, দু' টাকা।

উৎসর্গ : 'ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদেষু'।

সূচি : ভণ্ডুলমামার বাড়ী, পেয়ালা, উইলের খেয়াল, কনে দেখা, সার্থকতা, একটি দিন, বাইশ বছর, বৈদ্যনাথ, ডার্নপিটে, যাত্রাবদল।

(ক) **যাত্রাবদল** সংকলন বি র ৩-এ আছে। সংকলনের প্রতিটি গল্প (খ) সু ৫ এবং (গ) গ স ১-এ সংযুক্ত।

(ঘ) "ভণ্ডুলমামার বাড়ী" এবং "কনে দেখা" 'শ্রেষ্ঠ গল্প' আর (ঙ) "পেয়ালা" 'ভৌতিক গল্প' সংকলনে যুক্ত হয়েছে।

(চ) "একটি দিন" 'জন্ম ও মৃত্যু' সংকলনে "অকারণ" নামে গ্রন্থিত।

৪. **জন্ম ও মৃত্যু** আশ্বিন ১৩৪৪ (ফাল্গুন ১৩৪৪ ?), কাত্যায়নী বুক স্টল, দু' টাকা।

উৎসর্গ : 'সুপ্রভাকে'।

সূচি : যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ, জন্ম ও মৃত্যু, সই রামশরণ দারোগার গল্প, খুড়ীমা, বায়ুরোগ, অরন্ধনের নিমন্ত্রণ, লেখক, বড়বাবুর বাহাদুরি, অন্নপ্রাশন, তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প, ডাকগাড়ী, অকারণ।

(ক) **জন্ম ও মৃত্যু** সংকলন বি র ৫-এ আছে। সংকলনের প্রতিটি গল্প ["অকারণ" গল্পটি যে নামে 'যাত্রাবদল'-এ প্রথম গ্রন্থিত হয়েছিল, সেই "একটি দিন" নামে] (খ) সু ৫ এবং (গ) গ স ১-এ পাওয়া যাবে।

(ঘ) 'অরন্ধনের নিমন্ত্রণ' 'প্রেমের গল্প'তে, (ঙ) "ডাকগাড়ী" আর "খুড়ীমা" 'বাক্সবদল' সংকলনে এবং (চ) "তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প" 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'ভৌতিক গল্প' আর 'অলৌকিক' সংকলনে পাওয়া যাবে।

৫. **কিন্নর দল** কার্তিক ১৩৪৫, কাত্যায়নী বুক স্টল, দু' টাকা।

সূচি : মণি ডাক্তার, পুরনো কথা, খোসগল্প, একটি দিনের কথা, বাটি-চচ্চড়ি, তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প, ডাইনী, বুধীর বাড়ী ফেরা, বিধু-মাস্টার, উন্নতি, কিন্নর দল।

(ক) **কিন্নর দল** সংকলন বি র ৪-এ আছে। "তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প" ছাড়া প্রতিটি গল্প (খ) সু ৫ এবং (গ) গ স ১-এ আছে।

(ঘ) "মণি ডাক্তার" 'প্রেমের গল্প'তে, (ঙ) "কিন্নর দল" 'শ্রেষ্ঠ গল্প' সংকলনে, (চ) "তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প" 'ভৌতিক গল্প'তে, 'অলৌকিক' সংকলনে, সু ৬ (শ্রাবণ ১৩৮৬)-এ এবং জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় ও মণীশ চক্রবর্তী সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত 'বিভূতি-ভূষণের গল্পসমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড'-তে [মাঘ, ১৩৮৬] (গ স ২) সংযুক্ত।

(ছ) "বিধুমাস্টার" 'বিধুমাস্টার' সংকলনে এবং মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত 'গল্প-পঞ্চাশৎ' (পৌষ ১৩৬৩) সংকলনেও আছে।

৬. **বেণীগীর ফুলবাড়ী** বৈশাখ ১৩৪৮, কাত্যায়নী বুক স্টল, দু' টাকা।

উৎসর্গ : 'কল্যাণীয়া জাহ্নবীকে দিলাম'।

সূচি : বেণীগীর ফুলবাড়ী, মাস্টারমশায়, তিরোলের বালা, জনসভা, প্রত্যাবর্তন, প্রাবল্য, বাঁশি, পাঁচুমামার বিয়ে, শাস্তিরাম, কুয়াশার রঙ, ফিরিওয়ালা, নিষ্ফলা।

(ক) **বেণীগীর ফুলবাড়ী** বি র ৬-এ আছে। সংকলনের প্রতিটি গল্প (খ) সু ৫ এবং (গ) গ স ১-এ পাওয়া যাবে।

(ঘ) "বেণীগীর ফুলবাড়ী" 'প্রেমের গল্প' এবং 'বাক্সবদল' সংকলন দুটিতে পাওয়া যাবে।

বেণীগীর ফুলবাড়ী গল্পসংকলন সাহিত্যায়ন থেকে শ্রাবণ ১৩৬৯ এ **কুয়াশার রঙ** নামে প্রকাশিত হয়।

৭. **নবাগত** মাঘ ১৩৫০, মিত্র ও ঘোষ, দু' টাকা।

উৎসর্গ : 'অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সুহৃদ্বরেষু'।

সূচি : দ্রবময়ীর কাশীবাস, আমার লেখা, ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল, পারমিট, মুক্তি, গায়ে হলুদ, ঠাকুরদার গল্প, ভিড়, আরক, থিয়েটারের টিকিট, পার্থক্য, স্বপ্ন-বাসুদেব।

(ক) **নবাগত** সংকলন বি র ৭-এ আছে। "স্বপ্ন-বাসুদেব" ছাড়া সংকলনের প্রতিটি গল্প (খ) সু ৫ এবং (গ) গ স ১-এ পাওয়া যাবে।

(ঘ) "দ্রবময়ীর কাশীবাস" আর "ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল" ছাড়া **নবাগত-র** অন্য সব গল্প 'গল্প-পঞ্চাশৎ' সংকলনে আছে।

(ঙ) "স্বপ্ন-বাসুদেব" সু ৬, গ স ২ এবং 'গল্প-পঞ্চাশৎ' সংকলনে তো আছেই ; এছাড়াও আছে 'সুলোচনা' এবং 'বিভূতি-বীথিকা' সংকলনে।

(চ) "দ্রবময়ীর কাশীবাস" এবং "ক্যানভাসার কৃষ্ণলাল" 'শ্রেষ্ঠ গল্প' সংকলনে আছে ; (ছ) "দ্রবময়ীর কাশীবাস" 'সুলোচনা'তেও পাওয়া যাবে।

(জ) "আরক" 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প', 'অলৌকিক' এবং 'ভৌতিক গল্প' সংকলন তিনটিতেই আছে।

(ঝ) "আমার লেখা" 'কিশোর সঞ্চয়ন' সংকলনে, 'বিভূতি-বীথিকা'য়, বি র ১-এ এবং বিভূতিভূষণের প্রবন্ধ, অভিভাষণ, পত্র-সংকলন 'আমার লেখা'য় গ্রন্থিত।

৮. **তালনবমী** (সচিত্র) বৈশাখ ১৩৫১, রমেশচন্দ্র ঘোষাল, কালিকা প্রেস, এক টাকা আট আনা।

সূচি : তালনবমী, রঙ্কিনী দেবীর খড়্গা, মেডেল, মশলাভূত, বামা, বামাচরণের গুপ্তধন প্রাপ্তি, অরণ্যে, গঙ্গাধরের বিপদ, রাজপুত্র, চাউল।

(ক) **তালনবমী** সংকলন বি র ৯-এ আছে। "রাজপুত্র" আর "অরণ্যে" (খ) সু ৬ এবং গ) গ স ২-তে পাওয়া যাবে। সংকলনের বাকি গল্পগুলি (ঘ) সু ৫ এবং (ঙ) গ স ১-এ আছে।

(চ) "রাজপুত্র", "বামা" আর "গঙ্গাধরের বিপদ" 'ছোটদের ভালো ভালো গল্প' আর 'বিভূতি-বীথিকা'য় সংযুক্ত।

(ছ) "গঙ্গাধরের বিপদ" 'ভৌতিক গল্প'তেও আছে। 'ভৌতিক গল্প'তে **তালনবমী** সংকলনের আর যে গল্পগুলি আছে, তা হল "রঙ্কিনী দেবীর খড়্গা", "মশলাভূত", "মেডেল"।

(জ) "মেডেল" 'অলৌকিক' সংকলনেও আছে।

(ঝ) "তালনবমী" গল্পটিও 'ছোটদের ভালো ভালো গল্প' সংকলনে আছে "পথ চেয়ে" নামে।

(ঞ) "চাউল" 'কুশল পাহাড়ী' গল্পসংকলনে আবার গ্রন্থিত হয়েছিল।

(ট) সম্প্রতি **তালনবমী** 'কিশোরসমগ্র'-তে যুক্ত হয়েছে।

৯. **উপলখণ্ড** বৈশাখ ১৩৫২, গুপ্ত প্রকাশিকা, দু' টাকা বারো আনা।

সূচি : আহ্বান, একটি ভ্রমণকাহিনী, নসুমামা ও আমি, দৈবাৎ, বিড়ম্বনা, ভুবন বোষ্টুমী, শাবলতলার মাঠ, পৈতৃক ভিটা, দুর্মতি, ফকির, আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা।

(ক) **উপলখণ্ড** সংকলন বি র ৮-এ আছে। সংকলনের প্রতিটি গল্প (খ) সু ৫ আর (গ) গ স ১-এ সংযুক্ত।

(ঘ) "আহ্বান", 'নন্দমামা ও আমি" এবং "একটি ভ্রমণকাহিনী" 'শ্রেষ্ঠ গল্প'র অন্তর্ভুক্ত এবং (ঙ) ওই তিনটি ছাড়া **উপলখণ্ড** সংকলনের অন্য আটটি গল্প 'গল্প-পঞ্চাশৎ' সংকলনে যুক্ত হয়েছে।

(চ) "ফকির" 'বিভূতি-বীথিকা' এবং 'সুলোচনা'য় আছে আর

(ছ) "পৈতৃক ভিটা" 'কিশোর সঞ্চয়ন'-এ এবং 'ভৌতিক গল্প' সংকলনে যুক্ত।

১০. **বিধুমাস্টার** জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২, কাত্যায়নী বুক স্টল।

সূচি : বাক্সবদল, মূলো-ব্যাডিশ—হর্স র‍্যাডিশ, সুলোচনার কাহিনী, বেচারী, অভয়ের অনিদ্রা, অসমাপ্ত, কবি কুণ্ডুমশায়, সঞ্চয়, সুহাসিনীমাসীমা, বিধুমাস্টার, অভিশাপ।

(ক) **বিধুমাস্টার** সংকলন বি র ৮-এ আছে। "অসমাপ্ত", "কবি কুণ্ডুমশায়' আর "সঞ্চয়" (খ) সু ৬ এবং (গ) গ স ২-তে আছে। সংকলনের বাকি আটটি গল্পের প্রত্যেকটি (ঘ) সু ৫ এবং (ঙ) গ স ১-এ পাওয়া যাবে।

(চ) সংকলনের প্রতিটি গল্প 'গল্প-পঞ্চাশৎ'-এ আছে।

(ছ) "সুলোচনার কাহিনী" "সুলোচনা" নামে 'বিভূতি-বীথিকা' এবং 'সুলোচনা' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত।

(জ) "বিধুমাস্টার' **বিধুমাস্টার** সংকলনে যুক্ত হওয়ার আগে প্রথম গ্রন্থিত হয়েছিল 'কিন্নর দল' সংকলনে।

(ঝ) 'বাক্সবদল' আছে 'বাক্সবদল' এবং 'সুলোচনা' সংকলনে।

১১. **ক্ষণভঙ্গুর** ভাদ্র ১৩৫২, গুপ্ত প্রকাশিকা, দু'টাকা চার আনা।

উৎসর্গ : 'স্বর্গতা মৃণালিনী দেবীর উদ্দেশে'।

সূচি : সিঁদুরচরণ, একটি কোঠাবাড়ীর ইতিহাস, বুধোর মায়ের মৃত্যু, ছেলে-ধরা, রামতারণ চাটুজ্যে—অথর, স্থটিমন্তর, ফডখেলা, হাট, অরণ্যকাব্য।

(ক) **ক্ষণভঙ্গুর** সংকলন বি র ১২-তে আছে। সংকলনের প্রতিটি গল্প

(খ) সু ৬ এবং (গ) গ স ২তে আছে।

(ঘ) "সিঁদুরচরণ" 'শ্রেষ্ঠ গল্প' সংকলনে এবং

(ঙ) "সিঁদুরচরণ" বাদে অন্য আটটি গল্প 'গল্প-পঞ্চাশৎ' সংকলনে পাওয়া যাবে।

(চ) "স্থটিমন্তর" 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প'তে এবং 'ভৌতিক গল্প' সংকলনেও আছে।

১২. **অসাধারণ** বৈশাখ ১৩৫৩, মিত্রালয়, তিন টাকা।

উৎসর্গ : 'স্বনামখ্যাত বন্ধু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের করকমলে'।

সূচি : অসাধারণ, নদীর ধারে বাড়ী, বিপদ, জন্মদিন, কাঠ-বিক্রীবুড়ো, হারুণ-অল-রসিদের বিপদ, সুলেখা, রূপো বাঙাল, তেঁতুলতলার ঘাট, দুইদিন, মাকাললতার কাহিনী, বংশলতিকার সন্ধানে, কমপিটিশন, ব্ল্যাকমার্কেট দমন কর, তুচ্ছ, পিদিমের নীচে।

(ক) **অসাধারণ** সংকলনটি বি র ৭-এ আছে। "বিপদ", "তুচ্ছ", "নদীর ধারে বাড়ী", "জন্মদিন", "দুই দিন", "মাকাললতার কাহিনী" এবং "বংশলতিকার সন্ধানে" যুক্ত হয়েছে (খ) স্থ ৫-এ এবং (গ) গ স ১-এ। **অসাধারণ** সংকলনের বাকি ন'টি গল্প (ঘ) স্থ ৬ এবং (ঙ) গ স ২তে পাওয়া যাবে। (চ) **অসাধারণ** সংকলনের প্রত্যেকটি গল্প 'বিভূতি-বিচিত্রা'য় আছে। (ছ) "বিপদ" এবং "তুচ্ছ" 'শ্রেষ্ঠ গল্প'-এ, (জ) "অসাধারণ" 'প্রেমের গল্প' সংকলনে এবং (ঝ) "হারুণ-অল-রসিদের বিপদ" 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প' সংকলনে অন্তর্ভুক্ত।

১৩. **মুখোশ ও মুখশ্রী** অগ্রহায়ণ ১৩৫৪, মিত্র ও ঘোষ, তিন টাকা।

উৎসর্গ : 'পূজনীয় মাতুল বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের করকমলে'।

সূচি : মুখোশ ও মুখশ্রী, রাসু হাড়ি, দৈব ঔষধ, বারিক অপেরা পার্টি, উড়ুম্বর, মাছ চুরি, বেসাতি, কলহান্তরিতা, উল্টোরথ, মুক্তপুরুষ হরিদাস, অন্তর্জ্জলি, বোতাম, খোলস, চৌধুরাণী।

(ক) **মুখোশ ও মুখশ্রী** সংকলন বি র ১০-এ আছে। সংকলনের প্রতিটি গল্প (খ) স্থ ৬ এবং (গ) গ স ২-তে অন্তর্ভুক্ত। (ঘ) "বোতাম" 'প্রেমের গল্প' সংকলনে যুক্ত হয়েছে।

১৪. **আচার্য কৃপালনী কলোনি** আশ্বিন ১৩৫৫, বেঙ্গল পাবলিশার্স।

উৎসর্গ : 'সুহৃদ্বর শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়কে দিলাম'।

সূচি : আচার্য কৃপালনী কলোনি, নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব, বরো বাগদিনী, প্রভাতী, সাহায্য, গিরিবালা, চিঠি, মড়িঘাটের মেলা, হাজারি খুঁড়ির টাকা, প্রত্যাবর্তন, পড়ে পাওয়া, আমার ছাত্র।

(ক) **আচার্য কৃপালনী কলোনি** বি র ১০-এ আছে। সংকলনের প্রতিটি গল্প (খ) স্থ ৬ এবং (গ) গ স ২-তে আছে।

(ঘ) "আচার্য কৃপালনী কলোনি" 'কিশোর সঞ্চয়ন'-এ সংযুক্ত।

আচার্য কৃপালনী কলোনি সংকলন বিভূতি প্রকাশন থেকে আশ্বিন ১৩৬৬-তে **নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব** নামে প্রকাশিত হয়। ভূমিকায় রমা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, এই নাম পরিবর্তনের ইচ্ছা বিভূতিভূষণের নিজেরই ছিল।

১৫. **জ্যোতিরিঙ্গণ** চৈত্র ১৩৫৫, মিত্র ও ঘোষ, তিন টাকা।

উৎসর্গ : 'পণ্ডিতবর বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়'।

সূচি : সংসার, হিঙের কচুরী, দুই দিন, অনুশোচনা, দাদু, বাসা, বন্দী, থনটন কাকা, কালচিতি, দিবাবসান, মুস্কিল, গল্প নয়।

(ক) **জ্যোতিরিঙ্গণ** সংকলন বি র ১১-তে আছে। সংকলনের প্রতিটি গল্প (খ) সূ ৬, (গ) গ স ২ এবং (ঘ) 'গল্প-পঞ্চাশৎ'-এ পাওয়া যাবে। (ঙ) "দাদু" আর "থনটন কাকা" 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প' সংকলনেও আছে।

১৬. **কুশল পাহাড়ী** পৌষ ১৩৫৭, মিত্র ও ঘোষ, ভূমিকা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

উৎসর্গ : 'কবিশেখর কালিদাস রায় মহাশয়ের করকমলে'।

সূচি : কুশল পাহাড়ী, ঝগড়া, বড়দিদিমা, অবিশ্বাস্য, খেলা, জাল, আবির্ভাব, মানতালাও, বেনিয়ম, অভিমানী, শিকারী, পরিহাস, জওহরলাল ও গড্, গল্প নয়, সীতানাথের বাড়ী ফেরা, হরিকাকা, এমনিই হয়, ঝড়ের রাতে, চাউল, পথিকের বন্ধু, আর্টিস্ট, শেষ লেখা।

(ক) **কুশল পাহাড়ী** সংকলন ["চাউল" বাদে] বি র ১১-তে আছে। "চাউল" গল্পটি প্রথম গ্রন্থিত হয়েছিল 'তালনবমী' সংকলনে; "চাউল" এবং "গল্প নয়" (খ) সূ ৫-এ এবং (গ) গ স ১-এ আছে। **কুশল পাহাড়ী** সংকলনের অন্য কুড়িটি গল্প ঘ) সূ ৬ এবং (ঙ) গ স ২-তে আছে।

(চ) "জাল", "ঝড়ের রাতে" এবং "গল্প নয়" 'ছোটদের ভালো ভালো গল্প' সংকলনটিতে আছে; (ছ) "জাল" 'কিশোর সঞ্চয়ন'এ-ও আছে। (জ) "অবিশ্বাস্য" 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প' সংকলনে এবং (ঝ) "শেষ লেখা" 'বিভূতি-বিচিত্রা'য় যুক্ত।

১৭. **রূপহলুদ** জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৪, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা। ভূমিকা : রমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূচি : ননীবালা, বিরজা হোম ও তার বাধা, বুড়ো হাজরা কথা কয়, কাশী কবিরাজের গল্প, ছোটনাগপুরের জঙ্গলে, মায়া, আমার ডাক্তারি, বর্শেলের বিড়ম্বনা, কাদা, ভৌতিক পালঙ্ক।

(ক) **রূপহলুদ** সংকলন বি র ৪-এ আছে, "বুড়ো হাজরা কথা কয়" এবং "ছোটনাগপুরের জঙ্গলে" (খ) স্ম ৫ এবং (গ) গ স ১-এ আছে। বাকি আটটি গল্পের প্রতিটি (ঘ) স্ম ৬ এবং (ঙ) গ স ২-তে আছে। (চ) "মায়া" আর "ছোটনাগপুরের জঙ্গলে" 'কিশোর সঞ্চয়ন' সংকলনে, (ছ) "ভৌতিক পালঙ্ক" 'ছোটদের ভালো ভালো গল্প'তে, (জ) "কাশী কবিরাজের বিপদ" 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প' সংকলনে সংযুক্ত, (ঝ) "মায়া" এবং "ভৌতিক পালঙ্ক" 'ভৌতিক গল্প' সংকলনেও আছে।

১৮. **অনুসন্ধান** মাঘ ১৩৬৬, বিভূতি প্রকাশন, তিন টাকা।

সূচি : অনুসন্ধান, টান, চ্যালারাম, সান্ত্বনা।

(ক) **অনুসন্ধান** বি র ১০-এ আছে; কিন্তু সেখানে "সান্ত্বনা"র পরিবর্তে "যাচাই" শিরোনামে শেষ গল্পটি ছাপা হয়। শুধু শিরোনামের ফারাকই নয়, "সান্ত্বনা" আদতে জওহরলাল নেহরুর ষাট বছরের জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত 'নেহরু অভিনন্দন গ্রন্থ'র অন্তর্ভুক্ত "The Consolation" কাহিনী-টির দেবীদাস চট্টোপাধ্যায় কৃত বঙ্গানুবাদ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে গল্পটির ইংরেজি অনুবাদ "The Consolation", সেই "যাচাই" **অনুসন্ধান** সংকলনের প্রথম প্রকাশকালে 'গল্পভারতী' পত্রিকার বৈশাখ ১৩৫৭ সংখ্যা থেকে উদ্ধার করা যায়নি। ফলে বাংলা গল্পের ইংরেজি অনুবাদটি থেকে ফের বাংলা করে "সান্ত্বনা" ছাপা হয়েছিল। মূল গল্পটি খুঁজে পাওয়ার পরে প্রথম সংযুক্ত হয় 'বাক্সবদল' সংকলনে। **অনুসন্ধান**-এর পরবর্তী সংস্করণে "সান্ত্বনা"র পরিবর্তে "যাচাই" ছাপবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। "অনুসন্ধান", "টান", 'চ্যালারাম", "যাচাই" চারটি গল্পই (খ) স্ম ৬-এ এবং (গ) গ স ২-তে আছে।

(ঘ) "টান" 'অলৌকিক', 'বিভূতি-বীথিকা' এবং 'ভৌতিক গল্প' সংকলনে আছে। (ঙ) "চ্যালারাম"ও 'বিভূতি-বীথিকা'য় আছে।

(চ) "যাচাই" 'আরো একটি' (মিত্র ও ঘোষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯, দু'টাকা) সংকলনেও যুক্ত।

১৯. **ছায়াছবি** ফাল্গুন ১৩৬৬, চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়, তাপসী প্রেস, তিন টাকা।

ভূমিকা : সজনীকান্ত দাস।

সূচি : ছায়াছবি, বিপদ, কবিরাজের বিপদ, আমোদ, সতীশ, অভিনন্দন-সভা, মরফোলজি, ভালুর বিপদ।

(ক) **ছায়াছবি** সংকলনটি বি র ৮-এ আছে। সংকলনের প্রতিটি গল্প (খ) সু ৬ এবং (গ) গ স ২-তে সংযুক্ত।

(ঘ) "ছায়াছবি" এবং "কবিরাজের বিপদ" দুটি গল্পই 'অলৌকিক' আর 'ভৌতিক গল্প' সংকলনে আছে। ঙ "ছায়াছবি" 'বিভূতি-বীথিকা'র অন্তর্ভুক্ত। (চ) 'বিভূতি-বীথিকা'তে সংযুক্ত **ছায়াছবি** সংকলনের আর একটি গল্প "অভিনন্দন সভা" 'ছোটদের ভালো ভালো গল্প' সংকলনেও আছে।

(ছ) 'মরফোলজি' 'বিভূতি-বিচিত্রা' এবং 'প্রেমের গল্প'তে সংযুক্ত।

(জ "বিপদ" 'কিশোর সঞ্চয়ন'-এ যোগ হয়েছে।

বিভূতিভূষণের সংকলনগুলির মধ্যে **বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্প** (ভাদ্র ১৩৫৪), **সুলোচনা** (বৈশাখ ১৩৬৯), **প্রেমের গল্প** (ফাল্গুন ১৩৬৯), **অলৌকিক** (আষাঢ় ১৩৭০), **বিভূতি-বিচিত্রা** (ভাদ্র ১৩৭১), **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিশোর সঞ্চয়ন** (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২) এবং **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটদের ভালো ভালো গল্প** (শ্রাবণ ১৩৭২) সংকলনগুলিতে তৎপূর্বে অগ্রন্থিত কোনো গল্প যুক্ত হয়নি।

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২) সংকলনে তৎপূর্বে অগ্রন্থিত একটি গল্পই যোগ হয়—"বাঘের মন্তর", গল্পটি পরে 'আরো একটি', সু ৬ এবং গ স ২-তে যুক্ত হয়।

গল্প-পঞ্চাশৎ (পৌষ ১৩৬৩) সংকলনে তৎপূর্বে অগ্রন্থিত যে একটিমাত্র গল্প যোগ হয়, তার নাম "কয়লাভাঁটা"। গল্পটি পরে 'আরো একটি', সু ৬ এবং গ স ২-তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

"এয়ারগান" গল্পটি **বাক্সবদল** (আষাঢ় ১৩৭২) সংকলনে প্রথম গ্রন্থিত হল। "এয়ারগান" **বাক্সবদল**-এর গল্পগুলির মধ্যে তৎপূর্বে অগ্রন্থিত দুটি গল্পের একটি। "যাচাই" গল্পটিও **বাক্সবদল**-এ প্রথম গ্রন্থিত হল, যার বিশদ বিবরণ 'অনুসন্ধান' সংকলনের সূত্রে দিয়েছি। "এয়ারগান" পরে বি র ৯, 'আরো একটি', সু ৬, গ স ২ এবং 'কিশোরসমগ্র' সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

"ভূত" গল্পটি 'আরো একটি' সংকলনে গ্রন্থিত হওয়ার আগে "অপ্রকাশিত রচনা" শিরোনামে **বি র ৯**-এ যুক্ত হয়েছিল। পরে **সু ৬, গ স ২** এবং 'কিশোরসমগ্র' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভৌতিক গল্প (আষাঢ় ১৩৭৮) সংকলনে তৎপূর্বে অগ্রন্থিত যে একটিমাত্র গল্প যুক্ত হল, তার নাম "রহস্য"। পরে এ গল্প 'আরো একটি', সু ৬ এবং গ স ২-তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আরো একটি (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯) সংকলনে তৎপূর্বে অগ্রন্থিত যে রচনাগুলি সর্বপ্রথম গ্রন্থিত হল, সেগুলি "অশরীরী", "বিশ্বশিল্পী" আর "বিক্রমখোল"; প্রতিটিই পরে সু ৬ এবং গ স ২-তে সংযুক্ত হয়েছে।

বি র ৯-এ "অপ্রকাশিত রচনা" শিরোনামে "শুভকামনা" নামের যে রচনাটি ছিল, তা কিন্তু "মৌচাকের স্মৃতি" নামে **বিভূতি বীথিকায়** (শ্রীপঞ্চমী ১৩৭৭) সর্বপ্রথম গ্রন্থিত হয়েছে। অর্থাৎ বি র ৯ প্রথম প্রকাশের সময় (চৈত্র ১৩৭৮) লেখাটি আসলে অগ্রন্থিত ছিল না। সম্প্রতি "শুভকামনা" 'কিশোরসমগ্র'-তেও যুক্ত হয়েছে।

"কবি" গল্পটি সর্বপ্রথম গ্রন্থিত হল **সু ৬** (শ্রাবণ ১৩৮৬)-তে, পরে গ স ২-তেও সংযুক্ত হয়েছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পগুলি গ্রন্থিত হওয়ার আগে কোন্ পত্রিকায় বা সংকলনে কবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, তার একটি তালিকা; তালিকাটি অবশ্যই সম্পূর্ণ নয়। গল্পের নামের পাশে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে সেই গল্পসংকলনের নাম দেওয়া হল, যেখানে গল্পটি প্রথম গ্রন্থিত হয়েছিল :

অনুসন্ধান (অনুসন্ধান)	সোনার বাংলা (ঢাকা) শারদীয় ১৩৫৪ ব
অনুশোচনা (জ্যোতিরিঙ্গণ)	কল্যাণশ্রী আশ্বিন ১৩৫৬ ব
অন্তর্জ্জলি (মুখোশ ও মুখশ্রী)	গল্পভারতী বৈশাখ ১৩৫৫ ব
অন্নপ্রাশন (জন্ম ও মৃত্যু)	বঙ্গশ্রী আশ্বিন ১৩৪৩ ব
অভিনন্দন সভা (ছায়াছবি)	ছায়াপথ পূজাবার্ষিকী (?)
অভিমানী (কুশল পাহাড়ী)	গল্পভারতী প্রথম বার্ষিকী ১৩৫৩ ব
অভিশপ্ত (মেঘ-মল্লার)	প্রবাসী আষাঢ় ১৩৩১ ব
অরণ্যে (তালনবমী)	সুনির্ম্মল বসু স. ছোটদের বার্ষিকী আরতি, ইস্টার্ন ল হাউস ১৯৩৮

অসমাপ্ত (বিধুমাস্টার)	দেশ (বর্ষ ৮, সংখ্যা ৪৬) ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪১
অসাধারণ (অসাধারণ)	সোনার বাংলা আশ্বিন ১৩৫২ ব
আমার ডাক্তারি (রূপহলুদ)	কথা-সাহিত্য শারদীয় ১৩৫৮ ব
আমোদ (ছায়াছবি)	দেশ শারদীয় ১৯৫০
আরক (নবাগত)	মৌচাক শারদীয়, আশ্বিন ১৩৪৯ ব
আহ্বান (উপলখণ্ড)	আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক দোল সংখ্যা ১৩৫০ ব (১৯৪৪)
উইলের খেয়াল (যাত্রাবদল)	প্রবাসী ফাল্গুন ১৩৪০ ব
উপসর্গ (অগ্রন্থিত)	রঞ্জিতকুমার চট্টোপাধ্যায় স. কথাচয়ন দ্বিতীয় গ্রন্থ ১৩৫৪ ব রোমাঞ্চ গ্রন্থালয়
উপেক্ষিতা (মেঘ-মল্লার)	প্রবাসী মাঘ ১৩২৮ ব
উমারাণী (মেঘ-মল্লার)	প্রবাসী শ্রাবণ ১৩২৯ ব
উড়ুম্বর (মুখোশ ও মুখশ্রী)	দেশ শারদীয় ১৯৪৬
একটি কোঠাবাড়ীর ইতিহাস (ক্ষণভঙ্গুর)	দেশ (বর্ষ ১২ সংখ্যা ২৪) ২১ এপ্রিল ১৯৪৫
একটি দিনের কথা (কিন্নর দল)	আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয় ১৩৪৪ ব (১৯৩৭)
একটি ভ্রমণ কাহিনী (উপলখণ্ড)	দেশ (বর্ষ ১২ সংখ্যা ২) ২১ ডিসেম্বর ১৯৪৪
এয়ারগান (বাক্সবদল)	নরেন্দ্র ও রাধারাণী দেব স. দেবসাহিত্য কুটীর প্রকাশিত সোনার কাঠি (?)
কবি (স্থ ৬)	শনিবারের চিঠি আশ্বিন ১৩৫২ ব
কবি কুণ্ডুমশায় (বিধুমাস্টার)	দেশ (বর্ষ ৯ সংখ্যা ৪৯) ২৭ অক্টোবর ১৯৪২
কবিরাজের বিপদ (ছায়াছবি)	উদয়ন পুজাবার্ষিকী ১৩৫৮ ব
কালচিতি (জ্যোতিরিঙ্গণ)	যুগান্তর আশ্বিন ১৩৫৫ ব
কাশী কবিরাজের গল্প (রূপহলুদ)	অভিষেক আশ্বিন ১৩৫৮ ব
কিন্নর দল (কিন্নর দল)	পরিচয় শারদীয় ১৩৪৪ ব
কুশল পাহাড়ী (কুশল পাহাড়ী)	কথা-সাহিত্য কার্তিক ১৩৫৭ ব
খুকীর কাণ্ড (মেঘ-মল্লার)	প্রবাসী আশ্বিন ১৩৩৭ ব

খুড়ীমা (জন্ম ও মৃত্যু)	প্রবাসী কার্তিক ১৩৪৩ ব
খেলা (কুশল পাহাড়ী)	যুগান্তর শারদীয় ১৩৫৬ ব
খোসগল্প (কিন্নর দল)	প্রবাসী আষাঢ় ১৩৪৫ ব
গঙ্গাধরের বিপদ (তালনবমী)	মৌচাক কার্তিক ১৩৪১ ব
গায়ে হলুদ (নবাগত)	দেশ শারদীয় ১৯৪৩
চ্যালারাম (অনুসন্ধান)	মৌচাক কার্তিক ১৩৪৩ ব
ছোটনাগপুরের জঙ্গলে (রূপহলুদ)	বসুধারা আশ্বিন ১৩৬০ ব
জন্ম ও মৃত্যু (জন্ম ও মৃত্যু)	দেশ (বর্ষ ২ সংখ্যা ৪৫) ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫
জলসত্র (মৌরীফুল)	গল্পলহরী কার্তিক ১৩৩৮ ব
ঝগড়া (কুশল পাহাড়ী)	আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয় ১৩৫৭ ব (১৯৫০)
টান (অনুসন্ধান)	আনন্দবাজার পত্রিকা বার্ষিক দোলসংখ্যা ১৩৫৬ ব (১৯৫০)
ঠেলাগাড়ী (মেঘ-মল্লার)	বিচিত্রা কার্তিক ১৩৩৫ ব
ডানপিটে (যাত্রাবদল)	উদয়ন আশ্বিন ১৩৪১ ব
তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প (জন্ম ও মৃত্যু)	প্রবাসী পৌষ ১৩৪৩ ব
তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প (কিন্নর দল)	প্রবাসী আশ্বিন ১৩৪৫ ব
তালনবমী (তালনবমী)	বুদ্ধদেব বসু স. মধুমেলা, শারদীয় দেব-সাহিত্য কুটীর ১৩৪৯ ব (**পথ চেয়ে** নামে)
তিরোলের বালা (বেণীগীর ফুলবাড়ী)	প্রবাসী কার্তিক ১৩৪৭ ব
দাতার স্বর্গ (মৌরীফুল)	গল্পলহরী বৈশাখ ১৩৩৮ ব (**জমা-খরচ** নামে)
দুই দিন (অসাধারণ)	বর্ষশ্রী পূজাবার্ষিকী ১৩৫২ ব
ননীবালা (রূপহলুদ)	আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয় ১৩৫৫ ব (১৯৪৮)
নব-বৃন্দাবন (মেঘ-মল্লার)	বিচিত্রা বৈশাখ ১৩৩৫ ব

নাস্তিক (মেঘ-মল্লার)	প্রবাসী পৌষ ১৩৩১ ব
পার্থক্য (নবাগত)	দেশ (বর্ষ ১১ সংখ্যা ৩) ২৭ নভেম্বর ১৯৪৩
পিদিমের নীচে (অসাধারণ)	শারদীয় দৈনিক কৃষক ১৩৫২ ব
পুঁই-মাচা (মেঘ-মল্লার)	প্রবাসী মাঘ ১৩৩১ ব
পেয়ালা (যাত্রাবদল)	প্রবাসী ফাল্গুন ১৩৩৯ ব
বউ চণ্ডীর মাঠ (মেঘ-মল্লার)	বিচিত্রা শ্রাবণ ১৩৩৪ ব
বন্দী (জ্যোতিরিঙ্গণ)	পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা আশ্বিন ১৩৫৫ ব
বর্শেলের বিড়ম্বনা (রূপহলুদ)	রূপরেখা আশ্বিন ১৩৫০ ব
বড়দিদিমা (কুশল পাহাড়ী)	কথা-সাহিত্য কার্তিক ১৩৫৬ ব
বসন্তমঞ্জরী (অগ্রন্থিত)	আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয় ১৯৯০
বাক্সবদল (বিধুমাস্টার)	বঙ্গশ্রী কার্তিক ১৩৪৭ ব
বামাচরণের গুপ্তধন প্রাপ্তি (তালনবমী)	সুধীরচন্দ্র সরকার স. শিশুগল্পিকা, শারদীয় দেবসাহিত্য কুটীর ১৩৪৩ ব
বাসা (জ্যোতিরিঙ্গণ)	দেশ শারদীয় ১৯৪৮
বিক্রমখোল (আরো একটি)	বঙ্গশ্রী বৈশাখ ১৩৪০ ব
বিপদ (অসাধারণ)	দেশ শারদীয় ১৯৪৫
বিরজা হোম ও তার বাধা (রূপহলুদ)	মৌচাক শ্রাবণ ১৩৫৫ ব
বুধোর মায়ের মৃত্যু (ক্ষণভঙ্গুর)	দেশ শারদীয় ১৯৩৭
বেসাতি (মুখোশ ও মুখশ্রী)	প্রত্যহ শারদীয় ১৩৫৩ ব
বৈদ্যনাথ (যাত্রাবদল)	উদয়ন ফাল্গুন ১৩৪০ ব
ভণ্ডুলমামার বাড়ী (যাত্রাবদল)	প্রবাসী পৌষ ১৩৩৯ ব
ভিড় (নবাগত)	শনিবারের চিঠি অগ্রহায়ণ ১৩৫০ ব
ভূত (বি র ৯/আরো একটি)	খগেন্দ্রনাথ মিত্র স. সপ্তডিঙা পূজাবার্ষিকী ১৩৫২ ব
মণি ডাক্তার (কিন্নর দল)	বঙ্গশ্রী আশ্বিন ১৩৪৪ ব
মরফোলজি (ছায়াছবি)	আনন্দবাজার পত্রিকা বার্ষিক দোল সংখ্যা ১৩৫২ ব (১৯৪৬)
মাকাললতার কাহিনী (অসাধারণ)	আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয় ১৩৫২ ব (১৯৪৫)
মুক্তপুরুষ হরিদাস (মুখোশ ও মুখশ্রী)	গল্পভারতী দ্বিতীয় বার্ষিকী ১৩৫৪ ব

মুক্তি (নবাগত)	আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৫০ ব (১৯৪৩)
মূলো র‍্যাডিশ – হর্স র‍্যাডিশ (বিধুমাস্টার)	আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয় ১৩৪৯ ব (অক্টোবর ১৯৪২)
মেঘ-মল্লার (মেঘ-মল্লার)	প্রবাসী ফাল্গুন ১৩৩০ ব
মেডেল (তালনবমী)	প্রেমেন্দ্র মিত্র স. মায়ামুকুর, শারদীয় দেবসাহিত্য কুটীব ১৩৪৭ ব
মৌরীফুল (মৌরীফুল)	প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩০ ব
যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ (জন্ম ও মৃত্যু)	বঙ্গশ্রী আশ্বিন ১৩৪২ ব
যাচাই (বাক্সবদল/অনুসন্ধান)	গল্পভারতী বৈশাখ ১৩৫৭ ব
যাত্রাবদল (যাত্রাবদল)	বিচিত্রা পৌষ ১৩৩৯ ব
রঙ্কিনী দেবীব খড়্গ (তালনবমী)	মৌচাক আশ্বিন ১৩৪৭ ব
রহস্য (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভৌতিক গল্প)	মৌচাক আশ্বিন ১৩৫১ ব
রাজপুত্র (তালনবমী)	মৌচাক শ্রাবণ ১৩৪০ ব (**অতিথি** নামে)
বামশরণ দারোগাব গল্প (জন্ম ও মৃত্যু)	দেশ (বর্ষ ৩ সংখ্যা ১০) ২৫ জানুয়ারি ১৯৩৬
রাসু হাড়ি (মুখোশ ও মুখশ্রী)	আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয় ১৩৫৩ ব (১৯৪৬)
লেখক (জন্ম ও মৃত্যু)	আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয় ৮ আশ্বিন ১৩৪২ ব (১৯৩৫)
শিকারী (কুশল পাহাড়ী)	কথা-সাহিত্য পৌষ ১৩৫৬ ব
শেষ লেখা (কুশল পাহাড়ী)	শনিবারের চিঠি অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ ব
সই (জন্ম ও মৃত্যু)	নূতন পত্রিকা (বর্ষ ১ সংখ্যা ২) ৩১ জানুয়ারি ১৯৩৬
সংসার (জ্যোতিরিঙ্গণ)	দিগন্ত আশ্বিন ১৩৫৫ ব
সিঁদুরচরণ (ক্ষণভঙ্গুর)	গল্পভারতী বৈশাখ ১৩৫২ ব
সীতানাথের বাড়ী ফেরা (কুশল পাহাড়ী)	যুগান্তর শারদীয় ১৩৫৭ ব
সুলোচনার কাহিনী (বিধুমাস্টার)	প্রবাসী আশ্বিন ১৩৪৭ ব

স্বপ্ন-বাসুদেব (নবাগত)	দেশ (বর্ষ ১১ সংখ্যা ৫) ১১ ডিসেম্বর ১৯৪৩
হরিকাকা (কুশল পাহাড়ী)	তরুণের স্বপ্ন শ্রাবণ ১৩৫৭ ব
হাট (ক্ষণভঙ্গুর)	দেশ (বর্ষ ১২ সংখ্যা ৪০) ১১ অগাস্ট ১৯৪৫
হিঙের কচুরী (জ্যোতিরিঙ্গণ)	গল্পভারতী আশ্বিন ১৩৫৫ ব

দিনলিপি

১. **অভিযাত্রিক** (ভ্রমণ-দিনলিপি) চৈত্র ১৩৪৭, মিত্র ও ঘোষ, দু টাকা আট আনা।

উৎসর্গ : 'কল্যাণী উমাকে'।

(ক) বি র ২, খ) স্থ ৪ (ভাদ্র ১৩৮৫), (গ) মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত 'দিনেব পরে দিন' (চৈত্র ১৩৯৪) এবং (ঘ) বি র শ ১-এ সংযুক্ত। (ঙ) অংশবিশেষ "একটি ভ্রমণকাহিনী" নামে 'বিভূতি-বিচিত্রা'য় আছে।

২. **স্মৃতির রেখা** (দিনলিপি) শ্রাবণ ১৩৪৮, মাধব ঘোষাল।

উৎসর্গ : 'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অমর আত্মার উদ্দেশে'।

(ক) বি ব ১, (খ) স্থ ৪ এবং (গ) 'দিনের পরে দিন'-এর অন্তর্ভুক্ত। **স্মৃতির রেখা**-তে প্রকাশিত হয়নি, এমন কিছু ডায়েবির অংশ (১৫.১২.২৫ এবং ২৮.৩.২৬-এর দিনলিপি) বমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও গজেন্দ্রকুমার মিত্র সম্পাদিত বিভূতি স্মারক সমিতি প্রকাশিত 'বিভূতি স্মারক গ্রন্থ'তে "'স্মৃতির রেখা' দিনলিপির দু'টি দিনের অপ্রকাশিত রচনা" শিবোনামে গ্রন্থিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম দিনটির লিপি, যার নাম "তেলাকুচার জীবন-চরিত" পত্রিকায় প্রথম বেরিয়েছিল আনন্দমেলা শারদীয় ১৪০১ব সংখ্যায়।

৩. **তৃণাঙ্কুর** (দিনলিপি) চৈত্র ১৩৪৯, মিত্রালয়, দু'টাকা চার আনা।

উৎসর্গ : 'সুহৃদ্বর সজনীকান্ত দাসের করকমলে'।

(ক) বি র ২, (খ স্থ ৪ এবং (গ) 'দিনের পবে দিন'-এর অন্তর্ভুক্ত।

৪. **উর্মিমুখর** (দিনলিপি) শ্রাবণ ১৩৫১, মিত্রালয়।

(ক) বি র ৩, খ) স্থ ৪ এবং (গ) 'দিনের পরে দিন'-এর অন্তর্ভুক্ত।

৫. **বনে-পাহাড়ে** (ভ্রমণ-দিনলিপি)

পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ : মৌচাক আষাঢ় ১৩৫০ – আষাঢ় ১৩৫২।

গ্রন্থাকারে আশ্বিন ১৩৫২, মিত্রালয়, দু'টাকা চার আনা।
"থলকোবাদে একরাত্রি" সহ সংযুক্ত হয়েছে (ক) বি র ৫, (খ) স্থ ৪ এবং (গ) 'দিনের পরে দিন'-এ।
(ঘ) "থলকোবাদে একরাত্রি" লেখাটি "থলকোবাদের চিঠি" নামে 'বিভূতি-বীথিকা'তেও আছে।

৬. **উৎকর্ণ** (দিনলিপি) বৈশাখ ১৩৫৩ [এপ্রিল ১৯৪৬], মিত্র ও ঘোষ।
উৎসর্গ : 'জীবনের যাত্রাপথে যারা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, সাহিত্য রচনায় দিয়েছে প্রেরণা, অভিষিক্ত করেছে আনন্দ রসধারায়—অথচ দাবি করেনি কিছু—তাদেরই কথা আজ স্মরণ করলাম'।
(ক) বি র ৪, (খ) স্থ ৪ এবং (গ) 'দিনের পরে দিন'-এ অন্তর্ভুক্ত।
(ঘ) "দিনলিপি" শিরোনামে **উৎকর্ণ**র অংশবিশেষ 'বিভূতিবিচিত্রা'য় আছে। (ঙ) **উৎকর্ণর** নির্বাচিত অংশ অমর সাহিত্য প্রকাশন প্রকাশিত 'অরণ্য-মর্মর' (আশ্বিন ১৩৭৪) সংকলনে যুক্ত।

৭. **হে অরণ্য কথা কও** (দিনলিপি) মাঘ ১৩৫৪, আরতি এজেন্সী, তিন টাকা। উৎসর্গ : 'বন্ধুবর বিজয়রত্ন কবিরাজকে'।
(ক) বি র ৭, (খ) স্থ ৪ এবং (গ) 'দিনের পরে দিন'-এ সংযুক্ত। (ঘ) **হে অরণ্য কথা কও**-এর অংশবিশেষ "দিনলিপি" শিরোনামে 'বিভূতি-বিচিত্রা'য় আছে। (ঙ) নির্বাচিত অংশ 'অরণ্য-মর্মর' সংকলনে যুক্ত।

৮. **অন্তরঙ্গ দিনলিপি** ভাদ্র ১৩৮৩, পুস্তক প্রকাশনী, পাঁচ টাকা। [পত্রিকায় প্রথম প্রকাশের সঠিক তারিখ জানা নেই; তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন পুস্তকাকারে প্রকাশের আগে 'অমৃত' পত্রিকায় সাতের দশকের প্রথম দিককার কোনো বছরে এই দিনলিপি বেরিয়েছিল।]
পরবর্তীকালে সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত রচনা' (ভাদ্র ১৩৯৫) বইতে **অন্তরঙ্গ দিনলিপি** "১৯৪৫" শিরোনামে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৯. **বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত দিনলিপি** বৈশাখ ১৩৯০, নাথ পাবলিশিং, চল্লিশ টাকা। সম্পাদক : সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদকের উৎসর্গ : 'পূজনীয়া মেজদি রমা বন্দ্যোপাধ্যায়কে'।

১০. **বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত রচনা** ভাদ্র ১৩৯৫, মণ্ডল বুক হাউস, পঞ্চাশ টাকা। সম্পাদক : সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ১৯৪৩, ১৯৪৫ এবং ১৯৫০-এর দিনলিপির মধ্যে ১৯৪৫-এর ৯ মে থেকে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত লেখা দিনলিপি 'অন্তরঙ্গ দিনলিপি' নামে পূর্বেই গ্রন্থিত হয়েছে। তবে **বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত রচনায়** গ্রন্থিত ১৯৪৫-এর দিনলিপিতে ১৩ জানুয়ারি ১৯৪৫ থেকে ৬ মে ১৯৪৫ পর্যন্ত ডায়েরি এবং ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৫-এর ডায়েরি আছে, যা 'অন্তরঙ্গ দিনলিপি'তে নেই।

অন্যান্য

১. **বিচিত্র জগৎ** (সচিত্র সন্দর্ভ) ভাদ্র ১৩৪৪, পি সি সরকার, পাঁচ টাকা।

উৎসর্গ : 'রেণুকে'।

সূচি : আধুনিক গ্রীস, পারস্য (পার্সিপোলিস), বর্তমান প্যালেস্টাইন, বর্তমান মাঞ্চুরিয়া, বলিভিয়া, বেলজিয়ামের খালপথে, বরফের রাজ্য (ফিনল্যাণ্ড), ইংলণ্ডের পল্লী, উত্তর আমেরিকা হইতে দক্ষিণ আমেরিকা, হাওয়াই হইতে সানফ্রানসিস্‌কো, প্যারিস হইতে স্থলপথে কাশ্মীর, বোম্বেটেদের সহর সেণ্ট ম্যালো, জ্যামেকা, কলোরাডো, বোর্ণিও দ্বীপ, ফিজি দ্বীপ, মাদাগাস্কার দ্বীপ, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ (মাইক্রোনেসিয়া), সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জ ও পলিনেসিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ (লা সিবা), ভারত সমুদ্রের দ্বীপ, হাইতুক দ্বীপ (পক্ষীদ্বীপ), টাঙ্গানিয়াকা ও কঙ্গো (দক্ষিণ আফ্রিকা), যবদ্বীপের আগ্নেয়গিরি, মরুভূমির দেশ আরব, আরিজনার মরুভূমি, তুর্কিস্থানের মরুপথ, মাঞ্চুকুও (মঙ্গোলিয়া), পৃথিবীর বৃহত্তম নদী আমাজন, কলোরাডো নদী, চীনের নদী, পৃথিবীর বিশালতম অরণ্য (আমাজন), পানামা খাল ও অরণ্য, ভোলাপথ (কানাডার উত্তর পশ্চিমাঞ্চল), ভূস্বর্গ সেলিচিস, মাণ্ডয়ের সেলুঙ জাতি, সমুদ্রতলের নূতন জগৎ, জলের তলায় নূতন জগৎ, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের আশ্চর্য বস্তু, তিব্বতী দস্যুদের পবিত্র শিখর কংকা, কেপ্রিদ্বীপের পাখীর আড্ডা, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার কয়েকটি আশ্চর্য বস্তু, ব্যাঙের চাষ, কোমোডো দ্বীপের অতিকায় গিরগিটি, পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান পক্ষী, লিবীয় মরুভূমি, এঞ্জিনবিহীন এরোপ্লেন, আমেরিকার কাঠবেড়ালীর আশ্চর্য ঘুম, ফার্ন, ভূমধ্যসাগর হইতে পিকিং।

সম্প্রতি **বিচিত্র জগৎ** বি র শ ২-তে সংযুক্ত হয়েছে।

২. **আইভ্যান হো** (অনুবাদ) ১৩৪৫

৩. **অভিনব বাংলা ব্যাকরণ** (ছাত্রপাঠ্য ব্যাকবণ বই) শ্রাবণ ১৩৪৭, সেন ব্রাদার্স।

৪. **টমাস বাটার আত্মজীবনী** (জন বাবোস এব হাউ আই বিগ্যান-এর অনুবাদ) জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০, জেনাবেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স, চার টাকা। ভূমিকা: আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

৫. **আমার লেখা** (প্রবন্ধ, অভিভাষণ, পত্র-সংকলন) ভাদ্র ১৩৬৮, বিভূতি প্রকাশন, আড়াই টাকা। ভূমিকা: সজনীকান্ত দাস।

সূচি: আমার লেখা, ববীন্দ্রনাথ, ববি-প্রশস্তি, প্রথম দর্শন, সাহিত্যে বাস্তবতা, সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প, সাহিত্য ও সমাজ, পবিশিষ্ট (পত্রাবলী)।

(ক) **আমার লেখা**-ব প্রতিটি প্রবন্ধ 'বিভূতি-বীথিকা'য় সংযুক্ত। "আমাব লেখা" ছাড়া অন্য প্রবন্ধগুলি (খ) বি ব ১২ এবং (গ) সু ৪-এ আছে। (ঘ) "আমাব লেখা" প্রথম গ্রন্থিত হয় 'নবাগত' সংকলনে, তাবপর 'গল্প-পঞ্চাশৎ', 'কিশোব সঞ্চয়ন', বি ব ১ এবং সু ৫-এব অন্তর্ভুক্ত। "আমার লেখা"র সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে যাব, এমন একটি নিবন্ধ "গল্প লেখার গল্প" নামে বি র শ ১-এ গ্রন্থিত হয়েছে। এটি "কী কবে লেখক হলাম" শীর্ষক কথিকা, যা বেতাবে প্রচারিত হয়েছিল ১৯৪৫ সালের ৯ জুন।

বিভূতিভূষণের লেখা বিভিন্ন পত্র 'বিভূতি-বিচিত্রা', 'কিশোর সঞ্চয়ন', 'বিভূতি-বীথিকা', বি ব ১, বি ব ১০, বি র ১২, সু ৪, 'বিভতি স্মারক গ্রন্থ', বি র শ ১ এবং বি র শ ২-তে আছে।

"কেন কাজল লিখব" শীর্ষক বচনাটি গ্রন্থিত হয়েছিল 'বিভূতি-বিচিত্রা'য়।

৬. **বিপুলা এ পৃথিবী** (প্রবন্ধ-সংকলন) ভাদ্র ১৩৯৪, গ্রন্থপ্রকাশ, পঁচিশ টাকা। সম্পাদক: সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচি: উত্তর ক্যানাডার জলপথ, কিলিমানজারো — আফ্রিকার সর্বোচ্চ পর্বত, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার অনাবিষ্কৃত ভূভাগ, 'যাচ্ছি যাবো'র দেশ আফ্রিকা, আরিজোনা মরুভূমির পর্বতগাত্রে প্রাচীন ছবি, কলোরেডোর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নীল নদীবক্ষে ইজিপ্ট হইতে সুদান, কাপ্তেন কুক, প্রশান্ত মহাসাগরের কলম্বাস, ফিজি দ্বীপের প্রাচীন রাজবংশ, লা সিবা,

ইউরোপের ক্ষুদ্রতম রাজ্য এণ্ডোরা, ইউগাণ্ডা, রাইডার হ্যাগার্ডের দেশে, কুইন মেরী, আনৃড্রোথ, মধ্য আফ্রিকার বন্য জন্তু, উদ্যান রচনায় শিল্পীর হাত, দক্ষিণ আমেরিকার অজ্ঞাত পর্বত, উত্তর কানাডায় রেডিয়াম খনি আবিষ্কার, হলদে ডানা টুনা মাছ শিকার, ইউকাডানের অরণ্যে প্রাচীন যুগের নগরের ধ্বংসাবশেষ, ক্রিস্টোফার রেন, কলোরাডো নদীপথে সাড়ে সাতশত মাইল, পদব্রজে ইংলণ্ডের পল্লী-পথে, মাইক্রোনেসিয়ার অজ্ঞাত অঞ্চলে, এসিয়ার নদীপথে, বাইবেল-প্রসিদ্ধ পেট্রা, অজ্ঞাত তুরা জাতির দেশে, ফরাসী ইন্দোচীনের পথে, নর্থ ক্যারোলিনার ধীবরদল, হোরেস: রোমের পল্লী প্রকৃতির কবি, উড়ো-জাহাজে পৃথিবীভ্রমণ, সুইডেনের পল্লীপ্রান্তে, ম্যাডিরা দ্বীপ, আইল অফ ম্যান, নাগাপর্বত ও সাবামতী আগ্নেয়গিরির দেশ গোয়াতেমালা, নৌকায় ইউরোপের নদীপথে, ওকেফিনোকি বনাঞ্চল, মরুভূমির শহর টিউনিস ও প্রাচীন কার্থেজ, গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ ও তার অদ্ভুত জীবজন্তু।

'বিচিত্রা' পত্রিকায় "বিবিধ সংগ্রহ" অথবা "বিশ্বপ্রকৃতি" শিরোনামে এবং 'বঙ্গশ্রী'তে "বিচিত্র জগৎ" শিরোনামে বিভূতিভূষণ যে লেখাগুলি লিখতেন, 'বিচিত্র জগৎ' গ্রন্থে সেই রচনার সবগুলি গ্রন্থিত হয়নি। সেই অগ্রন্থিত রচনাগুলির বেশ কিছু নিয়ে **বিপুলা এ পৃথিবী**। যে লেখাগুলি এই বইতে আছে, পত্রিকায় তার প্রথম প্রকাশের তারিখ সম্পাদক বইয়ের শেষে তালিকাভুক্ত করেছেন। একটি রচনা ('যাচ্ছি যাবো'র দেশ আফ্রিকা) যে 'অলকা' পত্রিকায় বেরিয়েছিল, তার খোঁজও রচনা-পরিচিতিতে মিলে যায়।

বিপুলা এ পৃথিবী প্রকাশিত হওয়ার পরেও 'বিচিত্রা' পত্রিকায় "বিবিধসংগ্রহ" শিরোনামে প্রকাশিত যেসব লেখা অগ্রন্থিত ছিল তার মধ্যে "প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি মরুদ্বীপ", "তারকার জন্ম", 'উল্কার সমাধি", "ব্রিটানির প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর কীর্তি" এবং "বর্তমান অ্যাবিসিনিয়া" বি র শ ১-এ গ্রন্থিত হয়েছে। সম্প্রতি "সেম্নুসিদের দেশে দুইদিন" শীর্ষক আর একটি অগ্রন্থিত লেখা বি র শ ২-তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

যেসব বই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একার লেখা নয়

১. **কো-এডুকেশন** (বারোয়ারি উপন্যাস) : ১৯৩৭-৩৮, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্‌স। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, রাধারাণী দেবী, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র দেবের লেখা।

২. **মীনকেতুর কৌতুক** (বারোয়ারি উপন্যাস) : বৈশাখ ১৩৪৮, কাত্যায়নী বুক স্টল। সরোজকুমার রায়চৌধুরী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মণীন্দ্রলাল বসুর লেখা।

৩. **পঞ্চদশী** (বারোয়ারি উপন্যাস) : রাসপূর্ণিমা ১৩৪৮ (১৯৪১-৪২) সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, রাধারাণী দেবী, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র দেবের লেখা।

৪. **সুন্দরবনে সাত বৎসর** (কিশোর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী) : কার্তিক ১৩৫৯, তিন টাকা আট আনা। 'সখা ও সাথী'র সম্পাদক ভুবনমোহন রায়ের আরব্ধ কাহিনী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ করেছিলেন।

অগ্রন্থিত রচনা

উপসর্গ (ছোটগল্প)—রঞ্জিতকুমার চট্টোপাধ্যায় স. কথাচয়ন দ্বিতীয় গ্রন্থ ১৩৫৪ব রোমাঞ্চ গ্রন্থালয়।

তারাশঙ্কর (আলোচনা, বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্ট গ দ্রষ্টব্য)—শনিবারের চিঠি শ্রাবণ ১৩৫৪ ব।

দুইটি মূর্তির পরিচয় (আলোচনা)—ভারতবর্ষ ফাল্গুন ১৩৪৯ ব

প্রথক পরিচয় (স্মৃতিকথা)—মৌচাক বৈশাখ ১৩৫১ ব

'প্রবাসী' পত্রিকায় পুস্তক-পরিচয় বিভাগে বিভূতিভূষণ যে আলোচনাগুলি করেছিলেন (বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্ট খ), তার প্রতিটিই এখনও অগ্রন্থিত। প্রসঙ্গত 'বিচিত্রা' পত্রিকাতেও বিভূতিভূষণ কিছু পুস্তকপরিচিতি লিখেছিলেন ; সেগুলিও গ্রন্থিত হয়নি।

বঙ্গসাহিত্যে ব্যক্তিবোধ ও রাষ্ট্রচেতনার উন্মেষ—দেশ (বর্ষ ১৩ সংখ্যা ৯) ৫ জানুয়ারি ১৯৪৬

বসন্তমঞ্জরী (ছোটগল্প) — আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয় ১৩৯৭ ব (১৯৯০)

বহরাগড়া (ভ্রমণকাহিনী) [অসম্পূর্ণ]—নূতন পত্র অগ্রহায়ণ ১৩৫০ ব এবং পৌষ ১৩৫০ ব

বাপুজী (আলোচনা, বর্তমান গ্রন্থেব পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য —শনিবারের চিঠি মাঘ ১৩৫৪ ব

সাহিত্যের গতি — দেশ (বর্ষ ৪ সংখ্যা ৪) ১২ ডিসেম্বর ১৯৩৬

সাহিত্য লক্ষ্য — দেশ (বর্ষ ৫ সংখ্যা ২১) ৯ এপ্রিল ১৯৩৮

হলুদ পাতা (আত্মজীবনী)—আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয় ১৩৮৯ ব (১৯৮২)

পত্রাবলি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়েব একখানি পত্র	কথা-সাহিত্য অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ ব
অরুণকুমার সেনকে লেখা বিভূতিভূষণের পত্রাবলী	রামধনু (বর্ষ ২৯ সংখ্যা ৬)
নগেন্দ্রকুমার গুহরায়কে লেখা একটি চিঠি (নিবন্ধের নাম বিভূতি-বিয়োগ)	শনিবারেব চিঠি অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ ব
মাধব কুণ্ডুকে লেখা তিনটি চিঠি (নিবন্ধ : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনখানি চিঠি / অসীম বসু)	শনিবারেব চিঠি অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ব

তথ্যসূত্র

1. অন্নপূর্ণা গোস্বামী ১৩৫৭ব), "বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়", কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় স. 'প্রবাসী', পৌষ, কলকাতা।
2. অপ্রকাশিত: ইসমাইলপুর কাছারি থেকে লেখা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি, গুটুকে (অজিত রায়), নুটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং সুপ্রভা চৌধুরী (দত্ত)-কে লেখা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি, মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোপালনগর ডাকঘরের পাসবই এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহের উদ্ধৃতি ও টীকার খাতা এবং ছোট নোটবই, শ্রীতারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্তা সুপ্রভা চৌধুরীর সৌজন্যে এগুলি ব্যবহার করা সম্ভব হল।
3. সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় স. 'বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত দিনলিপি' [অ. দি.] (১৯৮৩), কলকাতা: নাথ পাবলিশিং।
4. সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় স. 'বিভূতিভূষণের অপ্রকাশিত রচনা' [অ. র.] (১৯৮৮), কলকাতা: মণ্ডল বুক হাউস।
5. অমরেন্দ্রনাথ দাস (১৩৫৭ব), '১৯২৬-এর স্মৃতি', সজনীকান্ত দাস স. 'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ, কলকাতা।
6. অমিয়া চৌধুরাণী (১৯৯২), 'দিদিমার যুগ ও জীবন', কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ।
7. অসীম বসু (১৩৫৭ব), "বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনখানি চিঠি", সজনীকান্ত দাস স. 'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ, কলকাতা।
8. উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৩৫৭ব), "পথের পাঁচালীর বিভূতিভূষণ", সজনীকান্ত দাস স. 'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ, কলকাতা।
9. উমা বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৯৫), "অন্তরঙ্গ বিভূতিভূষণ", রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও গজেন্দ্রকুমার মিত্র স. 'বিভূতি স্মারক গ্রন্থ', কলকাতা: বিভূতি স্মারক সমিতি, মিত্র ও ঘোষ।
10. কালিদাস রায় (১৩৫৭ব), "মাটির মানুষ বিভূতিভূষণ", সজনীকান্ত দাস স. 'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ, কলকাতা।
11. কিশলয় ঠাকুর (১৯৭৮), 'পথের কবি', কলকাতা: আনন্দ।
12. গজেন্দ্রকুমার মিত্র (১৩৫৭ ব), "মিথ্যারসিক বিভূতিভূষণ", সজনীকান্ত দাস স. 'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ, কলকাতা।

13. গোপাল ভৌমিক (১৩৫৭ ব), "পত্রিকা সম্পাদক বিভূতিভূষণ", সজনীকান্ত দাস স. 'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ, কলকাতা।

14. গোপাল হালদার (১৩৫৭ ব), "পথের পাঁচালী", সজনীকান্ত দাস স. 'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ, কলকাতা।

15. গোপাল হালদার (১৩৫৭ ব ক), "বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ", সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়', অগ্রহায়ণ, কলকাতা।

16. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (১৯৮৯), 'বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর ব্যক্তিরূপ', কলকাতা : মডার্ন কলাম।

17. চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় (১৯৯১), 'অপরাজিত বিভূতিভূষণ', কলকাতা : বিশ্বজ্ঞান।

18. চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৩), 'পথের পাঁচালীর নেপথ্য কাহিনী', কলকাতা : আনন্দ।

19. তারকনাথ ঘোষ (১৩৭৬ ব), 'জীবনের পাঁচালীকার বিভূতিভূষণ' ,কলকাতা : আনন্দধারা প্রকাশন।

20. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯৮৭), "অগ্রন্থিত প্রবন্ধ", 'ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী ২', কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।

21. নগেন্দ্রকুমার গুহরায় (১৩৫৭ ব), "বিভূতি-বিয়োগ", সজনীকান্ত দাস স. 'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ, কলকাতা।

22. নিত্যানন্দ হালদার (১৯৯৪), "চিঠিপত্র বিভূতিভূষণ", সাগরময় ঘোষ স. 'দেশ', ৩ ডিসেম্বর, কলকাতা।

23. নীরদচন্দ্র চৌধুরী (১৯৮৮), 'আত্মঘাতী বাঙালী', কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ।

24. পরিমল গোস্বামী (১৯৬৯), 'আমি যাঁদের দেখেছি', কলকাতা : রূপা।

25. পরিমল গোস্বামী (১৯৭১), 'পত্রস্মৃতি', কলকাতা : রূপা।

26. পরিমল গোস্বামী (১৩৬২ব), "সম্বলপুরের অরণ্যপথে", 'পথে পথে', কলকাতা : বেঙ্গল পাবলিশার্স।

27. পরিমল গোস্বামী (১৪০০ ব), 'স্মৃতিচিত্রণ', কলকাতা : প্রতিক্ষণ।

28. প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত (১৯৯২), "ঘাটশিলা", 'পেরিয়ে এলাম', কলকাতা : শরৎ বুক হাউস।

29-40. গজেন্দ্রকুমার মিত্র, চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় ও তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স. 'বিভূতি রচনাবলী' [বি র] ১, ২ (১৩৯৯ ব, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৭ ব), ৩

(১৩৭৭ ব), ৪, ৫ (১৪০১ ব, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৭ ব), ৬ (১৩৯৮ব, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৮ ব), ৭ (১৩৭৮ ব), ৮, ৯ (১৩৯৯ ব, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৮ ব), ১০ (১৩৯৯ ব, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৯ ব), ১১ (১৩৯৮ ব, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৯ ব), ১২ (১৪০১ ব, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৯ ব), কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ।

41. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও গজেন্দ্রকুমার মিত্র স. 'জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ বিভূতি-রচনাবলী' প্রথম খণ্ড [বি ব শ ১], (১৪০১ ব). কলকাতা : বিভূতি স্মারক সমিতি, মিত্র ও ঘোষ।

42. বিশু মুখোপাধ্যায় (১৩৫৭ ব), "বিভূতিভূষণ ও তাঁর শিশুসাহিত্য", সজনী-কান্ত দাস স. 'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ, কলকাতা।

43. বিশ্বনাথ পাল (১৯৯৩), 'বিভূতিভূষণ : রূপে-অরূপে', কলকাতা : নব-চলন্তিকা।

44. মুকুল চক্রবর্তী (১৩৭৯ ব), 'ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণ', কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ।

45. যমুনা বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৭৬, প্রথম প্রকাশ ১৯৭১). 'উপল-ব্যথিত গতি', কলকাতা : আনন্দ।

46. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৭৭ ব), "বিভূতিভূষণ ও কাজলের পশ্চাৎপট", বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অপু', কলকাতা : গ্রন্থ-প্রকাশ।

47. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও গজেন্দ্রকুমার মিত্র স. (১৯৯৫), 'বিভূতি স্মারক গ্রন্থ', কলকাতা : বিভূতি স্মারক সমিতি, মিত্র ও ঘোষ।

48. রুশতী সেন (১৯৯৩), 'বিভূতিভূষণ : দ্বন্দ্বের বিন্যাস', কলকাতা : প্যাপিরাস।

49. শিবদাস চক্রবর্তী (১৩৫৭ ব), "অপুর দেশে একদিন", সজনীকান্ত দাস স. 'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ, কলকাতা।

50. সজনীকান্ত দাস (১৩৫৭ ব), "সংবাদ সাহিত্য", সজনীকান্ত দাস স. 'শনিবারের চিঠি', ফাল্গুন, কলকাতা।

51. সজনীকান্ত দাস (১৩৮৪ ব), 'আত্মস্মৃতি', কলকাতা : সুবর্ণরেখা।

52. সতীশচন্দ্র ঘোষাল (১৩৭৭ ব, ১৩৭৮ ব), "পথের পাঁচালীর বিভূতিবাবু" [যোগেন্দ্রনাথ সিনহার 'পথের পাঁচালীকে বিভূতিবাবু', রাঁচী,

১৯৬৪, মূল হিন্দী গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ], ক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল স. 'আলেখ্য', কলকাতা।
53. সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৭০), 'বিভূতিভূষণ : জীবন ও সাহিত্য', কলকাতা : জিজ্ঞাসা।
54. সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯৯১), 'বিভূতিভূষণ : দেশে-বিদেশে', কলকাতা : প্যাপিরাস।
55. সুপ্রভা চৌধুরী (১৯৯৫), "স্মৃতির রেখা", রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও গজেন্দ্রকুমার মিত্র স. 'বিভূতি স্মারক গ্রন্থ', কলকাতা : বিভূতি স্মারক সমিতি, মিত্র ও ঘোষ।
56. সুমথনাথ ঘোষ (১৩৫৭ ব), "বাব্‌লু ও বিভূতিভূষণ", সজনীকান্ত দাস স. 'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ, কলকাতা।
57. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৩৫৭ ব), "কবি বিভূতিভূষণ", সজনীকান্ত দাস স. 'শনিবারেব চিঠি', অগ্রহায়ণ, কলকাতা।
58. The Calendar Supplement (Calcutta University Calendar) for 1943 (1943), for 1946 (1946), Calcutta : University of Calcutta.
59. Nirad C. Chaudhuri (1987), *Thy Hand Great Anarch ! India 1921-1952*, London : Chatto & Windus Ltd.

নির্দেশিকা

ফ

য

শ

হ